পুরানো সেই দিনের কথা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮

প্রচ্ছদপট :
অঙ্কন : পূর্ণেন্দু রায়
মুদ্রণ : ন্যাশনাল হাফটোন কোং

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও বাণী মুদ্রণ, ১২ নরেন সেন স্কোয়ার,
কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীবংশীধর সিংহ কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

কল্যাণীয় মিলিন্দ

ও

কল্যাণীয়া শিপ্রাকে

॥ এই লেখকের কয়েকটি উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থ ॥

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ
মাইকেল, মধুসূদন
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প
রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ
রবীন্দ্র সরণী
বঙ্কিম সরণী
গান্ধী জীবনভাষ্য
কাব্য গ্রন্থাবলী

নিবেদন

'বড লেখকের সাহচর্যে বাস করলেই লেখক হওয়া যায় না, শান্তিনিকেতন থেকে বেরিয়েছে কুল্লে একটি সাহিত্যিক—বিশীদা।' একথা বলেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী। তিনি আরও বলেছেন—'প্রমথনাথ জাত সাহিত্যিক।'

শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সম্পর্ক দীর্ঘকালের। শান্তিনিকেতনের গোড়ার দিকে যখন স্বল্পকটি ছাত্র নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আশ্রম পত্তন করেছেন, সেই সময়ে শান্তিনিকেতনে প্রমথবাবুর প্রবেশ। তারপর সেখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরও বেশ কিছুকাল তিনি রবীন্দ্রনাথের আদেশে শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর কাজে জড়িয়ে পড়েন। তখনকার শান্তিনিকেতন যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন—সে কী ছিল। সেখানের আকাশে বাতাসে গান ছিল, কাব্যচর্চা ছিল, জ্ঞানের আলোচনা ছিল আর ছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির সক্রিয় মাদকতা। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে যে জ্ঞানী-গুণী-রসজ্ঞমণ্ডল গড়ে উঠেছিল—সেখানে বিদ্যা বা পাণ্ডিত্যের ভার ছিল না, ছিল জ্ঞান ও আন্তরিকতার নির্মল আবেষ্টন। প্রমথনাথ সেই সব দিনের কথা তাঁর স্মৃতির ঝাঁপি থেকে একে একে বার করে সাজিয়ে দিয়েছেন এই গ্রন্থে। পুরাতন শান্তিনিকেতনের নানা আনন্দ-দুঃখ-কৌতুকভরা দিনের কথা, বিভিন্ন জ্ঞানী গুণী যাঁরা অলংকৃত করেছিলেন শান্তিনিকেতনের রত্নসভা—তাঁদের প্রসঙ্গ, আর সবাইকে একসঙ্গে ধরে রেখেছে যে রবীন্দ্র-স্মৃতি-সূত্র—এর সম্মিলিত রূপটির কথাভাষ্য এই গ্রন্থ। বাংলার সাহিত্য-প্রেমীদের কাছে এই বইটি অবশ্যপাঠ্য হয়ে থাকবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

বিনত

প্রকাশক

সূচীপত্র

ছাতিমতলা	১
হেলির ধূমকেতু	৮
অর্থমনর্থং	১৮
সুধাকান্তদা	৩১
অ্যাডভেঞ্চার	৪২
সর্পাঘাত	৫৫
হাসপাতাল	৬১
কাঁচা-মিঠে আম	৬৯
বিরহী যক্ষ	৮১
শিলিগুড়ির আলো	৯৩
গুরুগৃহের সিলেবাস	১০৩
সাহেব	১১১
শাস্ত্রীমশায়	১২৭
ক্ষিতিমোহনবাবু	১৩৮
সতীশচন্দ্র রায়	১৪৫
উৎসবরাজ দিনেন্দ্রনাথ	১৫১
গোঁসাইজি	১৬২
গুরুশিষ্য	১৭৪
বিদায়-সন্ধ্যা	১৮৮
পরিশিষ্ট	১৯৬

পুরানো সেই দিনের কথা

বিদায়-১৮
পরিশিষ্ট

॥ ১ ॥

ছাতিমতলা

যে উদার ভূখণ্ডে শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানকার আদিবাসী ছিল দুটি ছাতিমবৃক্ষ। এই ঊষর নিরুদ্ভিদ ভূখণ্ডে কেমন করে পাশাপাশি দুটো ছাতিমগাছ জন্মালো সে এক বিস্ময়। ততোধিক বিস্ময় কেমন করে এই গাছ দুটি মহর্ষির দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সত্য কথা বটে যে, তিনি কখনো কখনো তাঁর অনুরাগী ভক্ত রায়পুর নিবাসী শ্রীকণ্ঠ সিংহের বাড়ীতে এসে বাস করতেন। কিন্তু, রায়পুর থেকে এই আদিবাসী ছাতিমগাছ দুটির দূরত্ব অন্ততঃ সাত আট মাইল হবে। শুধু দূরত্ব নয়, এখানে তাঁর আসবার কোন কারণও ছিল না। অবশ্য এই জায়গাটা রায়পুরের সিংহবাবুদের জমিদারির অন্তর্গত। কিন্তু সেটাও এখানে মহর্ষির আগমনের যথেষ্ট কারণ হতে পারে না। এখানে তাঁর আগমনের কারণ আজ পর্যন্ত রহস্যময় হয়ে আছে। পরবর্তীকালে অনেকেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন তবে কোনো সিদ্ধান্তই সর্বজনগ্রাহ্য হয় নি।

যেখানে শান্তিনিকেতন পল্লী গঠিত হয়ে উঠলো, তার নিকটতম গ্রাম সুরুল। কোম্পানীর আমলে সুরুলে রেশমের কুঠি ছিল। তার ভগ্নাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। যেটা চীপ্ সাহাবের কুঠি নামে পরিজ্ঞাত। আর যখন Loop line তৈরি হচ্ছিল, তখন এই সুরুল গ্রামেই একটি বৃহৎ কোঠা বাড়ী তৈরী হয়েছিল লাইন প্রস্তুত-কারী ইঞ্জিনীয়ারদের বাসের জন্য—আবার রেল কোম্পানীর মালপত্তর রাখবার জন্যও বটে। কিন্তু সুরুল গ্রামের আসল আকর্ষণ সুরুল নামে পল্লী, যেখানে এক ঘর বড় জমিদারের বাস ছিল। আর ছিল বোলপুর শহর থেকে সুরুল পল্লীতে আসবার জন্য একটি পাকা রাস্তা। এসবও মহর্ষিকে পূর্বোক্ত আদিবাসী অধ্যুষিত ছাতিমগাছ দুটির দিকে আকর্ষণ করবার যথেষ্ট কারণ নয়। হ্যাঁ, আর একটি কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। বোলপুর শহর থেকে একটা মেঠো পথ ঐ ফাঁকা মাঠের উপর দিয়ে গোয়ালপাড়া নামে একটা গ্রাম হয়ে জেলার সদর সিউড়ী শহরের দিকে চলে গিয়েছে। যেখান দিয়ে "রাঙামাটির রাস্তা

বেয়ে হাটের পথিক চলে ধেয়ে"! এটাও মহর্ষিকে ওখানে নিয়ে যাবার কারণ হতে পারে না। তবে কী? নিয়তির ইঙ্গিত বললেই সব দায় মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু এত সহজে দায়মুক্তি পাঠক স্বীকার করবে না। উদার ফাঁকা মাঠ—উদার ফাঁকা প্রান্তর মহর্ষির বড় প্রিয় ছিল। সেই আকর্ষণেই তিনি কখনো কখনো বোলপুর স্টেশনের নিকটবর্তী গুস্করা গ্রামে এসে তাঁবু ফেলে থাকতেন। অনুমান করছি কখনও সে স্থান ফাঁকা প্রান্তর ছিল। এখন অবশ্য শহর বা শহরের ভাবাপন্ন হয়েছে। যেমন বা ততোধিক হয়েছে বর্তমান শান্তি-নিকেতন। বৃন্দাবন দর্শন করে সত্যেন দত্ত কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে ফিরতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ দেখিয়েছিলেন, "গিয়ে দেখি বৃন্দাবন হয়েছে শহর।" ঐ কারণেই আরো জোরালো ভাবে কবিগুরুর উদ্দেশে বলা যেতে পারে, বর্তমান শান্তিনিকেতনে যেন আর ফিরবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ না করেন। যাক্, পিতার কথা বলতে গিয়ে স্বভাবতই পুত্রের কথায় চলে এসেছি। কিন্তু মহর্ষির এখানে প্রথম আগমনের কথার কোনোই সিদ্ধান্ত হলো না। আর কিছুই নয়, বিষয়টি নিয়ে একটু গবেষণা করা যেতে পারে। গবেষণার বাজার দর এখন চড়া। শ্রীকণ্ঠ সিংহ নিশ্চয়ই মহর্ষির গতিবিধি জানতেন, জানতেন ফাঁকা মাঠের মতো আর কিছুই তাঁর প্রিয় নয়। একদিন কথা প্রসঙ্গে হয়তো মহর্ষি প্রকাশ করে থাকবেন যে, কাছাকাছি কোনো ফাঁকা মাঠ আছে কি-না। সিংহ মহাশয় হয়তো জানিয়ে থাকবেন প্রচুর আছে, কত দেখতে চান! তারপরে একদিন মহর্ষিকে পাল্কিতে তুলে, সঙ্গে পাইক বরকন্দাজ দিয়ে ঐ নিরুদ্দেশের অভিমুখে তাঁকে যাত্রা করিয়ে দিয়েছিলেন, যেখানকার একমাত্র অধিবাসী ঐ দুটি আদিবাসী ছাতিমবৃক্ষ। এর কোনো প্রমাণ নেই; কারণ এ নৈর্ব্যক্তিক গবেষণা। প্রমাণ নেই বটে, তবে এর পক্ষে আছে অনুমান। যদি কারো বিশ্বাস হয়, তবে আমার অনুমানকে গ্রহণ করতে পারেন, না হলে আমি নাচার।

যাক, মহর্ষি তো পাল্কি বাহিত হয়ে, পাইক বরকন্দাজ সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। মহর্ষি নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আবার পাইক বরকন্দাজ কেন,—তদুত্তরে শ্রীকণ্ঠ সিংহ বলে থাকবেন ওগুলো সম্মানিত ব্যক্তির সম্মানের চিহ্ন। আসল কথা ভাঙ্গেননি যে, ফাঁকা

মাঠে "হা রে রে রে রে রে, ঐ যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে"র দলের সাক্ষাৎ পাবার বিস্তর সম্ভাবনা।

মহর্ষির পাল্কি শূন্যতাকে ভেদ করে চলেছে। আর তিনি দুই দিকের খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে শূন্যতার অতল পরিমাপ করবার চেষ্টা করছেন। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, দাঁড়াও তো বাপু, নামাও এখানে পাল্কি। বরকন্দাজদের প্রধান হয়তো বললো, হুজুর, জায়গাটা ভাল নয়। আবার এদিকে সন্ধ্যাও হয়ে এল। তার সতর্কতায় মহর্ষি বিচলিত না হয়ে পাল্কি থেকে বের হয়ে শালপ্রাংশু দেহ খাড়া করে দাঁড়ালেন। দুটি বৃক্ষের স্থানে তৃতীয় একটি বৃক্ষ। "দিবি ইব স্তব্ধ।" মহর্ষির সে সময়ের মনোভাব অনুমানের অতীত। একমাত্র কবি-কল্পনাই তা ব্যাখ্যা করতে পারে। এখন সেই স্থান নানা জাতীয় বৃক্ষ সমাকুল অরণ্যপ্রায়। কানাঘুষায় শোনা যায় শ্বাপদেরও অভাব নেই।

তখন তিনি রায়পুরের সিংহবাবুদের কাছে থেকে ঐ ছাতিমগাছ দুটিকে কেন্দ্র করে ২০ বিঘা জমি বার্ষিক খাজনায় বন্দোবস্ত করে নিলেন। পরে অবশ্য ধীরে ধীরে এই মূল ২০ বিঘা জমি বহু বিস্তৃতি লাভ করেছে। সেকথা এখন নয়। জমিটা দেখতে হলো, একটা কড়াইকে উপুড় করলে যেমন আকার হয়, অনেকটা তেমনি। দক্ষিণে ধানের ক্ষেত, উত্তরে খোয়াই নামে পরিচিত রাঙ্গামাটির ওঠা পড়া, মাঝখান দিয়ে একটা ক্ষীণ জলের ধারা, বর্ষাকালে স্ফীত হয়, অন্য সময়ে শুক্‌নো। অর্থাৎ প্রাচীন শান্তিনিকেতন একটি শুক্‌নো ডাঙ্গা জমি। কলকাতা থেকে আগত অভ্যাগতগণ পরিহাস করে এই ডাঙ্গাকে ব্রজডাঙ্গা বলতো।

এখন জমি তো হলো। বাগান করবার উপায় কি? রুক্ষ রাঢ়ের মাটি গাছপালার অনুকূল নয়। তখন মহর্ষির নির্দেশে অজয় নদীর তীর থেকে ভিজে মাটি নিয়ে এসে বাগান তৈরী শুরু হলো। এখন যাঁরা শান্তিনিকেতন দেখবেন তাদের কাছে একথা অবিশ্বাস্য মনে হবে। শান্তিনিকেতনের পুব-পশ্চিম বরাবর শালগাছের সারি, আবার একটু উত্তরে সারিবদ্ধ দেবদারু গাছ। কাঁচের যে উপাসনা মন্দির তৈরী হলো, তার পশ্চিমদিকে আমলকী গাছের এবং পূর্ব দিকে সেগুন গাছের সারি। মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, এ কাঁচের

উপাসনা মন্দিরটি মহর্ষি স্বচক্ষে দেখেন নি। শান্তিনিকেতনের মূল একতালা অট্টালিকা ক্রমে দোতালা হলো। এই দোতলার উত্তরে এবং দক্ষিণে দুটি বৃহৎ ফটক। অবশ্য ফটকের দরজার বালাই নেই। অট্টালিকাটির দক্ষিণ দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে অনেকগুলি আমের গাছ, পরে যা আম্রকুঞ্জ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই সব বনস্পতি কায়েম হবার পরে আরম্ভ হলো ফুলের বাগান তৈরীর চেষ্টা। এক সময়ে শান্তিনিকেতন পুষ্পবিরল ছিল। ফুলের দরকার হলে যেতে হতো দূরবর্তী সাঁওতাল পল্লীতে। পাওয়া যেত গাঁদা ফুল। এখন বহুকালের ও বহুজনের চেষ্টায় শান্তিনিকেতন পল্লী নানাজাতীয় পুষ্পসমৃদ্ধ Garden Cityতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এখানে এসব কথা কেন। আমি ত ইতিহাস লিখছি না, লিখবার চেষ্টা করছি শান্তিনিকেতন যে ছাপ ফেলেছিল আমার মনের উপরে।

উদ্ভিদ হলেই নানাজাতীয় পাখী এসে আশ্রয় নেবে। ভোররাতে ঘুম ভাঙ্গলে গাছপালার মধ্যে নানাজাতীয় পাখীর মিশ্র কলরব কানে আসে। পাখীর গান সকাল বেলা আরম্ভ হয়ে সারাদিন যে চলে এমন নয়। মাঝখানে দুপুরবেলা একবার হঠাৎ সমস্ত পাখী একযোগে গান থামিয়ে দেয়, তখন "মধ্য দিনে যবে গান বন্ধ করে পাখী, হে রাখাল, বেণু তব বাজাও একাকী।" এবারে রাখালের বেণুর সুর অনুসবণ করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ কোথাও বলেছেন, বাংলা দেশের আকাশে চাঁদ উঠেছে আর বাংলাদেশের গাঁয়ে গান ওঠেনি, এমন তিনি জানেন না। তাঁর মন্তব্য শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে আরো বেশী সত্য। গাছপালায় ভরা শান্তিনিকেতনে ভোর রাত থেকে নানারকম পাখীর গান উঠতে থাকে। প্রথমে দেবদারু গাছগুলোর মধ্যে কিচিরমিচির রবে মিশ্র গান ওঠে যেন সুরের রংমশাল। তারপরে ফিঙে, দোয়েল, শালিক প্রভৃতির রব, অবশেষে একসময় কোকিল গান শুরু করে দেয়,—তবে জ্যোৎস্না রাত হলে সারা রাত ধরে ডাকে, কেন গলা ভেঙ্গে যায় না সে এক বিস্ময়। তারপরে পাখীর গানের ফাঁকে ফাঁকে ছেলেমেয়েদের কচি কণ্ঠের গান আরম্ভ হয়। শান্তিনিকেতনের আকাশ গানের ভারে থম্‌থমে। কেবল মাঝখানে একবার বেলা ১০টা ১১টা নাগাদ গানের রেশ ক্ষণকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। অগত্যা তখন কবিকে আসরে

নামতে হয়। তিনি গান ধরেন, "মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখী, হে রাখাল, বেণু তব বাজাও একাকী।"

অদূরে মাঠের মধ্যে শ্রুত হয় রাখালের বাঁশী। এইভাবে মানুষে পাখীতে কবিতে সারাদিন-সারারাত গানের পালা চলতে থাকে। বীরভূমের মতো এমন শুক্‌নো ডাঙ্গা জমিতে কোথায় ছিল এতো গানের উৎস? পূর্বদিকে নানুরে চণ্ডীদাস, কাঁদড়ায় জ্ঞানদাস, পশ্চিমে কেঁদুলিতে জয়দেব, আর এখানে-ওখানে মাঠান গাঁয়ে বাউল আর সাঁওতালী সুর। আর সকলের মাঝখানে সকলকে পূর্ণ করে ভানুসিংহ ঠাকুরের সহস্রতার বীণা। এমন বিচিত্র অজস্র গান বুঝি আর কোথাও নেই। তাই বলেছিলাম যে, শান্তিনিকেতনের আকাশ গানের ভারে থমথমে; যেমন এখানকার আকাশ তারার ভারে পীড়িত।

সেই শান্তিনিকেতনের আকাশ আজ গীতিস্তব্ধ—যেখানে সদা-সর্বদা গান শুনতে পাওয়া যেতো, তার বিশেষ স্থানকাল পাত্র ছিল না, যখন তখন কানে প্রবেশ করতো নানা সুরের গান, কখনো আম্র-কুঞ্জে, কখনো শাল-তরুর ছায়াতে, কখনো বা মাঠের মধ্যে নিত্য উৎসারিত গানের ছোট-বড় স্রোতস্বিনী।

"গান গেল কোথায়", "গান গেল কোথায়", পরিচিত যাকে পান জিজ্ঞাসা করেন পণ্ডিতজী। তিনি এক সময়ে শান্তিনিকেতনের আদিকালে সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন, তাঁর নিবাস মহারাষ্ট্রে। পুরো নাম ভীমরাও হাসুকর শাস্ত্রী। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে পারদর্শী। শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রসঙ্গীত তাঁর হৃদয়ের বস্তু হয়ে উঠেছিল। তারপর একসময়ে শান্তিনিকেতন পরিত্যাগ করেন, এবং বেশ কয়েকবছর পরে, তখন রবীন্দ্রনাথের তিরোধান ঘটেছে, তিনি এসে দেখলেন যে শান্তিনিকেতন গীতিস্তব্ধ। যেখানে আগে সুরে বেসুরে, তালে বেতালে, অনবরত গান শোনা যেতো, এখন তা খাঁখাঁ করছে। যখন তাঁর প্রশ্নের সদুত্তর না পেয়ে প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছেন, তখন তাঁর পূর্ব-পরিচিত একজন গোপনে জানালো, এখন এখানে গান করবার বিপদ আছে।

'বিপদ'? চম্‌কে উঠলেন পণ্ডিতজী। আমি তো জানতাম, গান না করতে পারলেই এখানে বিপদের আশঙ্কা।

—না পণ্ডিতজী, এ অন্যরকম বিপদ। এখন আনাচে-কানাচে স্বরলিপি বই হাতে করে' বসে' থাকে। বেসুর কানে এলেই বেসুরোকে সনাক্ত করতে চেষ্টা করে। এরকমভাবে কয়েকজন বেসুরো ধরা পড়ে' বিড়ম্বিত হয়েছে। ফলে লোকে গান গাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে।

তার কথা শুনে পণ্ডিতজী বিমূঢ় হয়ে একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসে' পড়লেন, বললেন—হা ভগবান, এর মধ্যে কী পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে! গুরুদেব বলতেন, গানের প্রেরণা প্রাণের উচ্ছ্বাস, তার সঙ্গে বিশুদ্ধ সুর তাল থাকে উত্তম, না থাকে ক্ষতি নাই, তবে প্রাণের উচ্ছ্বাসটা অবশ্যই থাকা চাই।

—এখন সেসব রীতি উল্টে গিয়েছে, আর গুরুদেব যে ওসব কথা বলেছিলেন, তারও প্রমাণ নাই, থাকবার মধ্যে আছে, মুদ্রিত স্বরলিপিগুলো।

এবারে পণ্ডিতজী আর মনের অশান্তি চাপ্‌তে পারলেন না, বল্‌লেন—"তবেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের ইতি।" সমস্ত বাংলাদেশ তাই বা বলি কেন, সমস্ত ভারতে হাজার হাজার কণ্ঠ রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে। তাঁদের শাসন করবার উপায় কিছু আছে তো জানি না। যদি স্বরলিপিগত বিশুদ্ধি রক্ষাই আদর্শ হয়, তবে রবীন্দ্রসঙ্গীতে আর মার্গসঙ্গীতে প্রভেদ কোথায় থাক্‌লো। সুরের মূল কাঠামোটা বজায় রেখে প্রত্যেক গায়কের নিজ ব্যক্তিত্বের ছাপ দেবার অধিকার আছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে। এই অর্থে রবীন্দ্রসঙ্গীত একান্তভাবে গায়কের স্বকীয়। এরকম কণ্ঠশাসন কিছুদিন চল্‌লে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মৌলিকত্ব আর থাক্‌বে না।

পণ্ডিতজীর এই মন্তব্য একান্তভাবেই সত্য। একদিকে এখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের অপ্রত্যাশিত প্রসার ঘট্‌ছে, আর এক দিকে স্বরলিপি-শাসনের তর্জনী উত্থান! এই দুয়ের মধ্যে আপসের পথ নেই।

রবীন্দ্রনাথ বলতেন, আমার গানগুলোকে দেশের লোকে নেবে। সত্যিই তা ঘটেছে, দেশের লোকে নিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে স্বরলিপি-শাসকগণ সে পথে অন্তরায়। রবীন্দ্রসঙ্গীত এখন আর ফ্যাসানের বস্তু নয়। হাজার হাজার ভদ্র নর-নারীর উপার্জনের পন্থা। স্বরলিপি শাসনের বাইরে তাদের অবস্থিতি। কেন মানবে তারা অদৃশ্য স্বরলিপি-কর্তৃপক্ষকে? মানবে না—মানা উচিতও নয়। এক

সময়ে বৈষ্ণব পদাবলী বাঙ্গালী সমাজকে রক্ষা করেছিল, তখন দেশময় মোগলে পাঠানে হুটোপাটি করে অরাজকতার বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল। এই দুর্যোগের দিনে, বৈষ্ণব পদাবলীর হাত ধরে' বাঙ্গালী পথ চলেছিল। এবং শেষ পর্যন্ত বিভীষিকার রাত্রি কাটিয়ে নূতন প্রভাতের আলো দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। এখনও চল্‌ছে—সেইরকম একটা বিভীষিকার যুগ। এবারে আর মোগল পাঠান নয়, বিচিত্র আদর্শের বিচিত্র প্রতিক্রিয়া। এ হেন অবস্থায় রবীন্দ্রসঙ্গীত তার আত্মরক্ষার প্রধান উপায়, তার প্রসারিত অভয়হস্তের সাহায্য যেন অগ্রাহ্য না করে বাঙ্গালী সমাজ। দেখা যাচ্ছে যে, অদৃষ্টবৈগুণ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতে তথাকথিত ও আত্মনিয়োজিত বিশুদ্ধিরক্ষকগণই অবশেষে রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে অবাঞ্ছিত বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে!

পণ্ডিতজীর ব্যগ্র প্রশ্নের সম্যক উত্তর দেবার ক্ষমতা আমার নেই। তবে সে প্রশ্ন সম্বন্ধে যা মনে এলো, তাই ব্যক্ত করলাম। আশা করছি এবং আশা করতেই থাক্‌বো, শান্তিনিকেতনের আকাশ থেকে গানের বিলুপ্তি যেন না ঘটে। এমন কি অতি বিশুদ্ধ স্বরলিপির অনুরোধেও। রবীন্দ্রনাথ কি নিজেই সব সময়ে তাঁর দেওয়া সুরকে লঙ্ঘন করে গান করতেন না! একথা তিনি নিজেও জানতেন, তাই, তাঁর সকল গানের ভাণ্ডারীর প্রতি এমন নির্ভর ছিল।

কি কথা বল্‌তে কি কথায় এসে পড়লাম। আরম্ভ করেছিলাম, শান্তিনিকেতনের নৈসর্গিক পরিবেশ নিয়ে, এসে পড়লাম সাঙ্গীতিক পরিবেশ নিয়ে। এটা অন্যায় হয়নি। কারণ শান্তিনিকেতনের পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্থান অপরিহার্য, এটা অন্যতম নিসর্গের চেয়ে কম প্রধান নয়।

॥ ২ ॥

হেলির ধূমকেতু

সূর্য অনুদয়ে তখনো দু-এক পোঁচ অন্ধকার আছে আকাশের গায়ে, তখন আমরা তিন ভাইবোন উঠে তেতলার উত্তর-পূর্ব কোণে গিয়ে উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়াতাম। এ প্রায় নিত্যকার ঘটনা চলছে, অনেক দিন থেকে, হয়তো চলবে আরও অনেকদিন।

একজন বলে উঠল, ঐ যে, ঐ যে। সকলে আমরা ঝুঁকে পড়লাম।

না, না, ওটা মেঘের টুকরো।

এবারে দেখো, ওটা হতেই হবে।

এবারে অবিশ্বাস না হলেও পুরো বিশ্বাস নয়।

এবারে তিনজনে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম, এবারে হতেই হবে। কারো মুখে প্রতিবাদ নেই, দুটো চোখ এক দৃষ্টিতে এক লক্ষ্যে নিবদ্ধ।

ক্ষীণ স্বচ্ছ একটা কিছু। মেঘ হলে আকার বদলাতো, আকার না বদলালেও যেন একটু একটু করে আয়তনে বাড়ছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর সন্দেহ নেই ধূমকেতুই বটে, বড়দের মুখে শুনেছি, হেলির ধূমকেতু।

এবার আমাদের তিনজনের দৃষ্টি একাগ্র হয়ে ধূমকেতুর প্রতি নিবদ্ধ হল। ইতিমধ্যে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়ে বেশ আলো হয়েছে। উত্তর-পূর্ব কোণে যাকে হাতখানেক লম্বা দেখে মনে হয়, বেলা দশটা নাগাদ সেটা প্রলম্বিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ স্পর্শ করে।

ব্যাপার স্বরূপ নিয়ে আমাদের গাঁয়ের নানা মুনির নানা মত। আগে কেউ জানত না গাঁয়ে এতগুলি মুনি আছেন। কেউ বল্লেন, ওটা আসলে ঘটোৎকচ। এবারে কুরুকুল চেপে পড়বে।

আরে সে তো দ্বাপর যুগের কথা।

আরে বাপু, কলিকালেও কৌরবের অভাব নেই। আর খুলে বলা নিরাপদ নয়, আভাসে বুঝে নাও।

অন্য এক মুনি বললেন, ঘটোৎকচ কবে মরে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা ওসব জানি।

যেন তিনি তার শ্রাদ্ধে খেয়ে এসেছেন।

অন্য এক মুনি বললেন, ওসব কিছু নয়—ওটা আসলে আকাশ-গঙ্গা। দেখছ না কেমন ঢেউ খেলাচ্ছে।

এমন সময়ে একটি ছাত্র এগিয়ে যায়, যার গায়ে কলেজের বাতাস লেগেছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্তই তার নখদর্পণে। গাঁয়ের মুনিদের মত সংক্ষেপে উড়িয়ে দিয়ে সে বলল, এসব বিজ্ঞান না পড়বার ফল। ওটা ঘটোৎকচ, আকাশগঙ্গা কিছুই নয়, ওটাকে বলে হেলির ধূমকেতু।

ঘটোৎকচ ও আকাশগঙ্গা এরকম বুঝেছিলাম কিন্তু হেলির ধূমকেতু একেবারেই দুর্বোধ্য হল। তখন সেই রিপন কলেজে পড়া ছাত্রটি হেলি সাহেব, ধূমকেতু আর পঁচাত্তর বছর পরে তার পুনরায় শুভাগমনের সংবাদ জানিয়ে বিস্মিত করে দিল। ততক্ষণে ধূমকেতুর মইখানা আকাশ জুড়ে প্রলম্বিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমাদের জ্ঞান-পিপাসা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হল না, আমরা ভাবলাম এসব গ্রহ-নক্ষত্রের ব্যাপার কলেজের ছোকরার দল কি জানবে! চল রজনী পণ্ডিতের কাছে যাওয়া যাক্।

রজনী পণ্ডিত গ্রামের পুরোহিত। তাঁর উপর লোকের অবিচলিত আস্থা, কারো কঠিন ব্যাধি হলে লোকে কবিরাজের কাছে যাওয়ার আগে রজনী ঠাকুরের কাছে যেত। তিনি পঞ্জিকা দেখে বলে দিতেন, রোগের ভোগ কতদিন আছে। তাঁর কথা প্রায় মিথ্যা হত না। রুগী বাঁচবে কিনা তাও আভাসে ইঙ্গিতে বলে দিতেন, তারপরে যেত কবিরাজের কাছে, দুজনের কথাই সত্য হত, লাভের মধ্যে রজনী ঠাকুরের ব্যবস্থায় খরচ কম। গাঁয়ের শুভাশুভ ছিল তাঁর করতলগত। কাজেই আমরা তিনজন পরদিন প্রাতঃকালে তাঁর কাছে গিয়ে প্রণত হলাম এবং ধূমকেতুটির প্রকোপ ও ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসু হলাম। সেই সঙ্গে সেই কলেজে পড়া ছাত্রটির মন্তব্য নিবেদন করলাম।

তিনি সমস্ত কথা মন দিয়ে শুনে একটি আধিদৈবিক হাসি হেসে বললেন, তোমরা বুঝি সেই কথা বিশ্বাস করেছ? আমরা বললাম, সেই কথা বিশ্বাস করলে আর আপনার কাছে আসব কেন? তিনি এবার একটি আধ্যাত্মিক হাসি নিক্ষেপ করলেন, বললেন, ওসব সাহেবি বিদ্যা শহরে চলে, সেখানে কে কার খোঁজ রাখছে? আমাদের গাঁয়ে ওসব অচল। আমরা অনেকটা আশ্বস্ত হলাম—তাই আপনার কাছে এসেছি।

আসবেই তো, তোমাদের গায়ে তো এখনো কলেজি হাওয়া লাগে নি। তোমরা জানতে চাও ধূমকেতু ব্যাপারটা কি ?

আপনি ঠিক ধরেছেন! কেউ বলছে ওটা ঘটোৎকচ, কেউ বলছে আকাশগঙ্গা!

তিনি আমাদের আশ্বস্ত করে বললেন, ঘটোৎকচ তো হতেই পারে না, তবে যারা আকাশগঙ্গা বলছে তারা অনেকটা কাছাকাছি গিয়েছে, তবে শোন—এই বলে তিনি মৃদুস্বরে বললেন, ওটা মহাদেবের জটা। মাঝে মাঝে তিনি জটা নাড়া দেন, তখন একটা জটা ছিঁড়ে গিয়ে পৃথিবীর দিকে ছিটকে উড়ে আসে।

এই পর্যন্ত বলে তিনি কিছুক্ষণ মৌন অবলম্বন করলেন। তাঁর এই আধ্যাত্মিক মন্তব্য শুনে আমরাও মৌন অবলম্বন করলাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা জানতে চাও—ওটা শুভ না অশুভ ?

আমরা এক বাক্যে স্বীকার করলাম, সেটা জানতেই তো আপনার কাছে এসেছি।

তিনি একটি অর্থগূঢ় হাস্য হেসে বললেন, ও তো এক কথায় বলা যায় না, তবে জেনে রাখ ওটা শুভাশুভ দু-ই। অর্থাৎ কারো পক্ষে শুভ, কারো পক্ষে অশুভ। দেখি তোমার হাতখানা—এই বলে আমার দক্ষিণ হাতের করতল টেনে নিয়ে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করে একটি প্রমাণ-সাইজ দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল।

কি হল ?

তোমার একটি বৃহৎ ফাঁড়া আছে তবে কেটে গেলেও যেতে পারে।

আমার সঙ্গী দুইজন শুধাল, তাহলে উপায় ?

উপায় অবশ্যই আছে—নইলে আমরা আছি কেন, আর হিন্দু শাস্ত্রই বা আছে কেন ?

তাহলে ওর কি করতে হবে ?

প্রত্যেক মাসের সংক্রান্তিতে এক বাটি খাঁটি সর্ষপ তৈলে নিজের ছায়া নিক্ষেপ করে বাটিসুদ্ধ সেই তৈল দান করতে হবে কোন ব্রাহ্মণ কুমারকে।

আর আমাদের ?

তোমাদের এখন কোন ফাঁড়া নেই।

আর ও যদি ছায়া দান না করে ?

সে কথা আমায় জিজ্ঞাসা কোর না। আর নিতান্ত যদি জানতেই চাও, তবে শুনে রাখ, ঐ জটাতে তোমাদের জড়িয়ে নিয়ে নিক্ষেপ করবে দেশান্তরে।

ওরা জিজ্ঞাসা করল, দেশান্তর বলতে কি বোঝায়?

তা হিমালয়ের পাদদেশেও হতে পারে, আবার রাঢ়বঙ্গে হওয়াও অসম্ভব নয়।

একজন জিজ্ঞাসা করে ফেলল, সর্ষপ তৈল না হয় যোগাড় হল, কিন্তু তেমন ব্রাহ্মণকুমার কোথায় পাওয়া যাবে?

কেন, আমার কনিষ্ঠ পুত্রটি আছে। এবারে উপনয়ন হয়েছে, দুবেলা নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিক করে থাকে। এখন তোমরা এস, অনেক কথা বলে ফেলেছি যা সকলকে বলি না। তোমরা যাও, এখন আমার সন্ধ্যাহ্নিকের সময় হল।

ওদের ফাঁড়া নেই জেনে হাল্কা মনে বিদায় নিল। আর আমি মহাদেবের জটাজালে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় ধীর পদে চললাম--কোথায় ফেলবে কে জানে, হিমালয়ের পাদদেশে না রাঢ়বঙ্গের কোন স্থানে!

আমি বেঁচে গেলাম। হেলির ধূমকেতুর বছরে আর একটি ধূমকেতুর মত শান্তিনিকেতনের ভাগ্যাকাশে আমার উদয়। তবে রজনী ঠাকুরের ভয়াবহ ভবিষ্যদ্‌বাণীর কি হল। হয়তো মহাদেবের জটার প্রক্ষেপ কিছু কমজোরি হয়েছিল বলে হিমালয়ের পাদদেশে প্রক্ষিপ্ত হইনি। তবে সে আশঙ্কা যে একেবারে না ছিল তা নয়। গুরুকুলে ছাত্ররূপে আমাকে পাঠাবার ষড়যন্ত্র চলছিল। কিন্তু শেষ অবধি রজনী ঠাকুরের ভবিষ্যদ্‌বাণীর অপরার্ধ সত্য হয়ে দেখা দিল, আমি নিক্ষিপ্ত হলাম রাঢ়বঙ্গের শান্তিনিকেতনে।

তখন রবীন্দ্রনাথ পরিচিত ছিলেন রবিঠাকুর নামে। রবিঠাকুর যে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন, একথা অল্প লোকে জানতো। আমাকে গুরুকুলে পাঠাবার যখন কথা চলছে, তখন সেই কথাটা ঘটনাক্রমে রাজশাহীর বরেণ্য উকিল অক্ষয়-কুমার মৈত্রের কানে গেল। তাঁর সঙ্গে বাবার পরিচয় ছিল। অক্ষয়বাবু বললেন, "বাঙালীর ছেলেকে হরিদ্বারে পাঠাতে যাবেন কেন?"

তিনি উত্তর পেলেন, "সরকারি কোন স্কুলে আমি ছেলেকে পড়াতে চাই না।"

"সরকারি স্কুলে পড়াতে কে বলছে, রবিঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমে দিন না। তার সঙ্গে সরকারের কোনো যোগাযোগ নেই।"

"সে কোথায়?"

অক্ষয়বাবু বললেন, "কলকাতা থেকে মাত্র ১০০ মাইল দূরে। হাওড়া থেকে ল্যুপ লাইনে গিয়ে বোলপুর স্টেশনে নামতে হয়। তার কাছে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম।"

বাবা বললেন, "একথা তো আমি জানতাম না।"

"আপনার আর দোষ কি। অতি অল্প লোকেই জানে।"

"আমরা তো জানি, রবিঠাকুর ঠাকুরবংশের সন্তান। স্বদেশী গান লেখেন, ভাল গান করতে পারেন, এই পর্যন্ত।"

অক্ষয়বাবু বললেন, "তাঁর প্রতিভার এ অতি সামান্য অংশ। আমি তাঁকে ভাল করে জানি, শিলাইদহতে তাঁর জমিদারি। তিনি যখন আসেন, আমি প্রায়ই যাই। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে বলতে পারেন।"

"তবে সেই কথাই ঠিক। কিন্তু তার নিয়ম-প্রণালী তো কিছুই জানি না।"

"সবই জানতে পারবেন, শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় একটা চিঠি লিখবেন। তবে মনে রাখবেন ছাত্রের বয়স বারো বছরের বেশি হলে চলবে না।"

"সে ভয় নেই। আমার ছেলের বয়স নয় বছর।"

"তবে আর কি। পাঠিয়ে দিন তাকে। বরঞ্চ তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে আশ্রমটা দেখে আসুন। মনে রাখবেন আষাঢ় মাস থেকে আশ্রমের বর্ষ আরম্ভ।"

"তবে সেই কথাই রইল। আমি নিজে গিয়ে সব দেখেশুনে আমার জ্যেষ্ঠপুত্রটিকে ওখানে রেখে আসবো।"

রজনী ঠাকুরের দ্বিতীয় ভবিষ্যৎ-বাণীটা এইরূপে ফলে গেল। আমি হিমালয়ের পাদদেশে নিক্ষিপ্ত না হয়ে রাঢ়বঙ্গে প্রক্ষিপ্ত হলাম। সেই জন্যেই গোড়াতে বলেছি, আমি বেঁচে গেলাম।

সেকালের নিয়মানুসারে শৈশব থেকে আমি ঝি-চাকরের

কোলে মানুষ। তার মধ্যে আবার বছরের অনেক সময় কাটতো দেওঘরে। এই সব কারণে গাঁয়ের সঙ্গে আমার যোগ নামে মাত্র ছিল। আবার গাঁয়ের মধ্যেও বাবুদের বাড়ির ছেলেদের যত্রতত্র যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। ফলে পিছটান না থাকায় শান্তিনিকেতনে গিয়ে আমার নিঃসঙ্গবোধ হয়নি। আমার বয়সী অনেক ছেলেকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে কান্নাকাটি করতে দেখেছি। এমন কি অনেকে অভিভাবকের সঙ্গে ফিরে চলে গিয়েছে। আমি ওখানে গিয়ে এই প্রথম খেলার সঙ্গী পেলাম। সেই সঙ্গে যা খুশি করবার অধিকার। এ যে কত বড় সুবিধে ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না।

অবশ্য মাঝে মাঝে গাঁয়ের কথা বাড়ির কথা মনে যে না পড়তো তা নয়। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যে 'কাগজনৌকা' নামে কবিতাটি পড়বার সময় ছেড়ে আসা গ্রামের কথা ছবির মত মনে জাগতো। আর কখনো কখনো তালবন ও শালবনের উপর মেঘ জমে অন্ধকার হয়ে এলে কেন জানি না মনে পড়তো গ্রামের কথা। তখনকার দিনে হাসপাতালের কাছে যে পাহাড়টা ছিল সেটা ছিল তালগাছ, শালগাছ, জামগাছ মিলিয়ে একটা জংলা-জায়গা। আবার ছাতিম-তলাব কাছেও এইরকম একটা জংলা জায়গা ছিল। তাছাড়া শান্তিনিকেতন ও ভুবনডাঙ্গার মধ্যে যে জলাশয়টিকে বাঁধ বলা হয়, তার পশ্চিমদিকে একসার লম্বা তালগাছ ছিল যেন ভেঙ্গে পড়ে যাওয়া কোন রাজবাড়ির স্তম্ভ। আর ঐ বাঁধের পূর্বদিকে প্রকাণ্ড একটা গাছ ছিল, যেন পাণ্ডবসৈন্যের মত ঘটোৎকচ। আর তাকে জড়িয়ে নানারকম ভয়ানক কিংবদন্তীর আবহাওয়া ছিল। শান্তিনিকেতনের কাছে এই হল বুনো ঝোপসা জায়গা। আর শান্তিনিকেতন থেকে গোয়ালপাড়া যেতে গোয়ালপাড়ার কাছে একটা বেগানা বাঁধানো জমি পড়ে ছিল। লোকে বলতো ওটা কোনো নীলকুঠির ভগ্নাংশ।

এই সময়ে একদিন কিভাবে রটে গেল একটি অল্পবয়স্ক ছাত্রকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার দুর্দান্ত অভিভাবক আসবেন। কথাটায় আমাদের মনে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করল সেইটুকুই নীট লাভ। আমরা সর্বদা ভীত থাকতাম। কখন সেই দুর্দান্ত অভিভাবক এসে উপস্থিত হবেন। ছেলেটিও ভীত হয়ে থাকত। সে বাড়ি ফিরে

যেতে চায় না। তখন শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষ বিপদে পড়লেন। নাবালক ছেলেকে তার অভিভাবক ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসছে। আর ছেলেটি যেতে একেবারেই নারাজ। এরকম সমস্যায় কখনো তাঁরা পড়েন নি। তাঁরা ঘন ঘন শলা-পরামর্শ আরম্ভ করলেন, কী করা যায়। আশ্রমের কোথাও পাঁচিল বা বেড়া বলে কিছু নেই। যে কেউ যখন-তখন এসে ঢুকে যেতে পারে। আর ছেলেদের বাসগৃহগুলিও তথৈবচ। এখানে এসে নিজের ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া একেবারেই আশ্চর্য কিছু নয়। তখন অনেক পরামর্শ করে কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন ছেলেটাকে রাতের বেলায় শান্তিনিকেতনের বাড়ির দোতলায় রাখবার ব্যবস্থা করা হোক। সেই ব্যবস্থাই কায়েম হল। এদিকে ছেলেটি তার বন্ধুদের সঙ্গে কি পরামর্শ করলো কেউ জানতে পারলো না।

আমাদের উপরে হুকুম ছিল, বোলপুর থেকে শান্তিনিকেতনে আসবার পথে কোন বলিষ্ঠ দুর্দান্ত ব্যক্তি চোখে পড়লে আমরা যেন অবিলম্বে কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাপিত করি। আমাদের পড়াশোনা চুলোয় গেল, আমরা সর্বদা পথটার উপরে নজর রাখি, ফলে পথে সুস্থ লোকের চলাফেরা অসম্ভব হয়ে উঠল। কত নিরাহ পথিককে ধরে নিয়ে হাজির করতাম হীরালালবাবুর কাছে। তিনি যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। আবার কখনো বা কালিদাসবাবুর কাছে। তিনি তত লম্বা নন তবে চওড়ায় পুষিয়ে নিয়েছেন। ও রকম দুটি বলিষ্ঠ ব্যক্তি বড় চোখে পড়ে না। আশ্রমে এই দুজনের উপস্থিতি আমাদের আশ্বাসের কারণ ছিল। দুর্দান্ত অভিভাবক এঁদের কাছে জব্দ হবেন, আমাদের ভয় কি! সেই ছাত্রটিকে অভয় দিয়ে বলতাম, এঁরা থাকতে তোমার ভয় নেই। সে যে বড় আশ্বস্ত হত মনে হয় না। মাঝে মাঝে হীরালালবাবু কালিদাসবাবুকে দেখে ভয় পেয়ে কোথাও আত্মগোপন করতো।

এই সময়ে একদিন সেই দুর্দান্ত অভিভাবকের কাছ থেকে এক চিঠি এল কর্তৃপক্ষের কাছে। তাঁর বক্তব্য তাঁর নাবালক পুত্রকে জবরদস্তি করে ধরে নিয়ে 'হাশ্রমে' কয়েদ করে রাখা হয়েছে। প্রত্যেক পত্রে আশ্রম শব্দটির বদলে লিখতেন 'হাশ্রম'। এইসব পত্রের বিষয় কানাঘুষায় ছেলেটির কানে উঠল। সে বলল, "বাবাকে

জব্দ করা হীরালালবাবুর ও কালিদাসবাবুর কর্ম নয়, তিনি একবার একটা বাঘকে আছড়ে মেরে ফেলেছিলেন।" আমরা কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলাম, "বাঘ কোথায় পেলেন?" তার উত্তর বিশ্বাসযোগ্য হল না। শুধু বলল, "তোমরা তো তাঁকে দেখনি, আমাকে দেখতে পেলে বগলদাবা করে ধরে নিয়ে গিয়ে সোজা রেলগাড়িতে চাপবেন।"

"টিকিট তো করতে হবে।"

"তাঁর কাছে টিকিট চাইবে কে? একবার এক টিকিট-চেকারকে ধরে গাড়ির জানলা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন। তারপরে রেল কোম্পানি জানিয়ে দিয়েছে তাঁর কাছে যেন টিকিট চাওয়া না হয়।"

এহেন ব্যাঘ্রঘাতী অভিভাবকের বিবরণ শুনে বলা বাহুল্য আমরাও ভয় পেয়ে গেলাম। তবু বললাম, "তোমাকে শান্তিনিকেতন বাড়ির দোতলায় রাখা হবে, ভয় কিসের?"

"তোমরা তো তাঁকে দেখনি! এক লাথিতে দরজা ভেঙে ঢুকবেন, তারপরে আমাকে নিয়ে ছুটবেন স্টেশনের দিকে। তোমরা পারবে তাঁর সঙ্গে ছুটতে?"

তখন আমাদের একজন বলল, "তুমি তো আগেও ছিলে এখানে, তবে এবার তোমাকে নিয়ে এত হাঙ্গামা হচ্ছে কেন?"

তখন সে কোনো কথা না বলে আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখালো।

আমরা বললাম, "ওটা তো ধূমকেতু।"

"ওতেই তো যত গোল বাধিয়েছে।"

"কি রকম খুলেই বল শুনি।"

"ওই ধূমকেতু দেখে আমাদের পুরুত ঠাকুর এসে মাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ মহা বিপত্তির লক্ষণ। ছেলেকে সর্বদা কাছে রাখবেন। আপনার কোল-ছাড়া হলেই ঐরাবতের শুঁড়ে জড়িয়ে ওকে শূন্যে নিয়ে যাবে।"

আমার মনে পড়লো সব গাঁয়েই রজনী পণ্ডিত আছেন। তবে নূতনত্বের মধ্যে এই এবারে মহাদেবের জটার বদলে ঐরাবতের শুঁড়।

"তখন তোমার মা কি করলেন?"

"তিনি আর কি করবেন? পুরুতঠাকুরকে নগদ দুই টাকা প্রণামী দিয়ে কাঁদতে বসলেন।"

বাবা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কাঁদছ কেন ?"

মা পুরুতঠাকুরের সব কথা তাঁকে নিবেদন করে বললেন, "যাও এখনি রওনা হও। আমার ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে এস।"

আমরা বললাম, "আমরা তো সবাই আছি। কাউকে তো ঐরাবতের শুঁড়ে জড়াচ্ছে না, তবে তোমার এত ভয় কেন ?"

সে বলল, "ভয় তো আমার নয়। ভয় মায়ের। আর ভয় বাবার।"

"তিনি পুরুষ মানুষ, তাঁর অত ভয় পেলে চলবে কেন ?"

"ঐরাবতের শুঁড়ের চেয়ে বেশি ভয় করেন তিনি মাকে। কাজেই তখনই তিনি রওনা হয়ে গেলেন। তার আগে একখানা চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন 'হাশ্রমকে'।"

আমরা বললাম, "শব্দটা তো আশ্রম।"

"আমি ছাপার অক্ষরে আশ্রম শব্দটাই দেখেছি। কিন্তু হলে কি হয়, মা বলেন 'হাশ্রম', কাজেই বাবাকেও বলতে হয় 'হাশ্রম'।"

তখন আমরা বললাম, "চল এসব কথা গিয়ে আশ্রমের কর্তৃপক্ষকে জানাই, তাহলে এত ভয়ের কারণ থাকবে না। তোমার মাকে বাবা ভয় করেন। আবার তোমার বাবাকে আশ্রমের কর্তৃপক্ষ ভয় করেন। এবার সমস্ত কথা শুনলে তাঁদের ভয়টা দূর হয়ে যাবে, আর তোমার বাবাও এসে বলেকয়ে তোমাকে নিয়ে যেতে পারবে।"

আমাদের মধ্যে একজন বলল, "এ কথাটা আগে বলনি কেন ?"

"আগে তো কেউ শুনতে চায়নি। বাবার চিঠি পড়ে সবাই ভয় পেয়ে গিয়েছে।"

"যাক, এখন ভয়ের কারণ তো গেল। এবারে চল, সবাই যাওয়া যাক।"

ছেলেটি যেতে যেতে, আমাদের অনুরোধ করল, "ভাই তোমরা আশ্রম শব্দটির বদলে 'হাশ্রম' শব্দটি বলো।"

আমরা বললাম, "বরঞ্চ তোমার মাকে বুঝিয়ে বোলো শব্দটা 'আশ্রম'।"

"তাহলে কি আমার রক্ষা থাকবে। ঐরাবতের শুঁড়ের কাণ্ড এখানেই হয়ে যাবে।"

অতঃপর ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। যথাসময়ে নরেনের (ছেলেটির

নাম) ব্যাঘ্রঘাতী পিতা এলেন। দেখলাম তিনি নিতান্তই ভদ্রলোক। বাঘ মারা দূরে থাক, কোনোকালে বাঘ দেখেছেন কি-না সন্দেহ। তিনি মাস্টারমশাইদের সমস্ত ঘটনা শুনিয়ে বললেন। তাঁরাও হেসে বললেন, "বেশ তো, দুচারদিনের জন্য ছেলেটিকে নিয়েই যান না। ঐরাবতের শুঁড়ের ভয়টা কেটে গেলেই আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। ছেলেটি বড় ভাল আর নিরীহ।"

এখানেই ধূমকেতুর লীলা সমাপ্ত।

॥ ৩ ॥

অর্থমনর্থং

সুখের দিনে দুঃখের কথার স্মৃতি আর তেমন দুঃখজনক মনে হয় না। শান্তিনিকেতনের এখন সুখের দিন। আর যারই অভাব থাকুক, টাকার অভাব নেই। টাকা যার আছে তার সবই আছে বলে সাধারণের ধারণা। টাকার মালিক কী ভাবেন তা জানি না। কারণ আমি এখনো টাকার মালিক হতে পারিনি। তবে শান্তিনিকেতনের সুখের দিন যাঁরা দেখেছেন, আবার দুঃখের দিন যাঁরা দেখেছেন আমি তাঁদের মধ্যে একজন। কাজেই দুই অবস্থাকে মিলিয়ে কিছু বলবার অধিকার আমার আছে।

রবীন্দ্রনাথ ধনীর সন্তান। তাঁর পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু সে ধনের সামান্য কিছুমাত্র তাঁর পৌত্ররা পেয়েছেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ একটা ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তারপরে হঠাৎ কি করে সেই সাম্রাজ্যের পতন হলো, সে রহস্যের সমাধান এখনো হয়নি, আর কখনো হবে বলে মনে হয় না। কারণ শুনেছি তাঁর ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। পৌত্রদের মধ্যে অনেকেই পিতামহের অনুসরণে ব্যবসা করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু কেউ সুফল পাননি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জাহাজের ব্যবসা ফেল পড়লো। রবীন্দ্রনাথের কুষ্ঠিয়ার ব্যবসাও তাই। যাক, এ বিষয়ে বিস্তারিত বলতে আমি অনধিকারী। আর অনাবশ্যকও বটে। কিন্তু যেজন্যে এ প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম, তা নিতান্ত অকারণে নয়। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন বিশ্বভারতীর জন্য ভিক্ষা করে বেড়িয়েছেন। আশানুরূপ ফল পাননি। প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র ভিক্ষার্থী, তাঁর অভাবকে কেউ গুরুতর মনে করেনি। তবু কিছু দিতে হয়েছে। তবে ব্যাপারটা মহতের লীলা বলেই তাদের ধারণা হয়েছে।

এসব কথায় পরে আবার আসতে হবে। প্রথমেই একটা জিজ্ঞাসা মনে জাগে, রবীন্দ্রনাথ কী ভরসা (আর্থিক) নিয়ে শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠায় নেমেছিলেন? তাঁর ধারণা হয়েছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রম নাম

শুনলেই দেশের ধনীদের টাকার থলি আলগা হবে। তার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। বরঞ্চ থলিগুলোর মুখ আরো চেপে বাঁধা হলো। সংস্কৃত কাব্য বিশেষ কালিদাসের কাব্য পড়ে তাঁর মনের মধ্যে প্রাচীন কালের গুরুগৃহ সম্বন্ধে একটি মনোরম ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। একথা তিনি অনেকবার অনেক স্থানে লিখিত আকারে বলেছেন। কাজে নেমে তার দুরূহতা দেখবার পরে বুঝতে পারলেন, কালিদাস যেসব গুরুগৃহের বর্ণনা লিখেছেন, তাতে কোনো বাজেটের বিবরণ দেননি। সেকালে রাজার রাজস্বের ষষ্ঠাংশ এইসব গুরুগৃহের জন্য বরাদ্দ ছিল। কাজেই বাজেট বিহীন কল্পনার প্রেরণায় কালিদাস শকুন্তলা কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ প্রভৃতি কাব্য লিখে গিয়েছেন।

এই সত্যটি আগে মনে হলে হয়ত রবীন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ সন্তর্পণে কাজে অগ্রসর হতেন। কিন্তু সেকথা মনে না পড়ায় তিনি শান্তিনিকেতনের আদিম অবস্থায় ছাত্রদের সঙ্গে কোন আর্থিক সম্বন্ধ রাখবেন না স্থির করেই নেমেছিলেন। সেখানে ছাত্রদের সমস্তই ফ্রি। অত্যল্পকালের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন কালিদাসের কাব্যে বর্ণিত গুরুগৃহে বাজেটের ভাবনা ভেবেছেন তাঁর প্রভু বিক্রমাদিত্য। রবীন্দ্রনাথ কল্পনায় যাদের চিত্র দেখেছিলেন, তারা কেউ তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে এলো না। কাজেই তাঁকে স্বকৃত ভ্রমের সংশোধন করতে হলো। ছাত্রদের সঙ্গে আর্থিক সম্বন্ধ স্থাপিত করতে বাধ্য হলেন। তবে সেই আর্থিক সম্বন্ধটা বস্তুত স্থাপিত হলো ছাত্রদের অভিভাবকদের সঙ্গে। টাকাপয়সা সরাসরি আপিসে এসে পৌঁছতো। অন্য বিদ্যালয়ে যেমন ছাত্ররা বেতন এনে আপিসে জমা দেয়, এখানে সেরকম ব্যবস্থা ছিল না। এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনা 'সাহেব' নামে পরিচ্ছেদে করেছি।

কালিদাস আর যাই করুন, তিনি গুরুগৃহের বর্ণনাই করেছেন। গুরুগৃহের প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেননি। ফলে তাঁর সমস্যা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে সহজ ছিল। তবে রবীন্দ্রনাথ কোন্ ভরসায় এমন কাজে হাত দিলেন? তখন মহর্ষি জীবিত। কাজেই তিনি সম্পত্তির অধিকারী নন। পিতার দত্ত মাসিক সাহায্য বরাদ্দ ছিল দুই শত টাকা। পরে আর একশো টাকা বেড়েছিল জমিদারী তত্ত্বাবধানের পারিশ্রমিক হিসাবে। নগদ ভরসা এই তিনশো টাকা।

তবে ধনীর সন্তানের স্থাবর অস্থাবর অনেক প্রকার সম্পত্তি থাকে। রবীন্দ্রনাথেরও ছিল। পুরীতে তাঁর একখণ্ড জমি ছিল। আর ছিল সহধর্মিণীর অলঙ্কারগুলি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে ছিল বাজারে ক্রেডিট বা অঢেল হ্যাণ্ডনোট কাটবার অধিকার। প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র বলে যেমন অসুবিধা ছিল, সুবিধার মধ্যে এইটি। আরো একটি সুবিধা ছিল, তাঁকে ঋণ দেবার মতো ধনী বন্ধুর অভাব ছিল না। স্যার তারকনাথ পালিতের কাছ থেকে তিনি ৩০ হাজার টাকা ঋণ করেছিলেন। তারকনাথ পালিত তাঁর সম্পত্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করবার ফলে এই ঋণটা গিয়ে পড়লো নূতন উত্তমর্ণের হাতে। দীর্ঘকাল তাঁকে ছয় টাকা হারে সুদ টানতে হয়েছে। অবশেষে সেটা শোধ হয়েছিল ১৯১৬ সালে আমেরিকায় গিয়ে বক্তৃতা করবার royalty বা পারিশ্রমিকলব্ধ টাকাতে। রবীন্দ্রনাথের চিঠি-পত্রগুলি পড়লে এইসব কথা জানতে পারা যাবে। প্রিয়নাথ সেন, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি যেসব ব্যক্তি এই আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে জড়িত, তাঁদের চিঠিগুলিতে এইসব বিবরণ পাওয়া যায়। আর এসব ছাড়া পেলেন শান্তিনিকেতনের ভূখণ্ড, বাগান, বৃহৎ অট্টালিকা। মহর্ষি শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট নামে একটি ট্রাস্ট স্থাপন করে বার্ষিক ১৮০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিলেন। তবে এই টাকার উপরে রবীন্দ্রনাথের বা ব্রহ্মচর্য আশ্রমের নিঃস্বত্ব অধিকার ছিল না। ওটা ছিল শান্তিনিকেতনে যাঁরা ধ্যান-ধারণা বা সাধনজীবন অতিবাহিত করতে আসবেন তাঁদের খরচ বাবদ।

১৯০৫ সালে মহর্ষির মৃত্যুর পরে পুত্রেরা সম্পত্তির অধিকারী হলেন। কিন্তু মহর্ষির ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের পুত্রেরা নাবালক থাকা বিধায় সব সম্পত্তি এজমালিতে শাসিত হতো। মফঃস্বলে হেড কাছারি শিলাইদহ। সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কল্যাণে শিলাইদহ বিখ্যাত হয়েছে। আর দুটি পরগণা ছিল সাজাদপুর ও কালিগ্রাম। এ দুটি যথাক্রমে পাবনা ও রাজশাহীতে অবস্থিত। শান্তিনিকেতনের জীবন-চরিত লিখতে বসে এসব কথা কিছু বিস্তারিত-ভাবে বলতে হচ্ছে এইজন্যে যে, শান্তিনিকেতনের সঙ্গে এসবের যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ। আর একটা পরগণা ছিল উড়িষ্যার পাণ্ডুয়া নামক স্থানে। সেটাও রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণাধীন। তবে তার

সঙ্গে শান্তিনিকেতনের যোগ ঘনিষ্ঠ নয়। এবারে বুঝতে পারা যাবে, এইসব জায়গার সঙ্গে যোগাযোগের স্বরূপ। এই সম্পত্তির সদর কাছারি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। এখন শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে মফঃস্বলের চাকরির একটা বদলি স্থান হলো শান্তিনিকেতন। শিলাইদহ থেকে এলেন জগদানন্দ রায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। কালিগ্রাম পরগণার সদর পতিসর থেকে এলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আলোচনার মধ্যে যথাস্থানে এঁদের সকলেরই নাম পাওয়া যাবে। প্রথমেই পাওয়া যাবে রাজেনবাবুর নাম। কারণ তিনি হলেন শান্তি-নিকেতনের হিসাবরক্ষক। এবারে প্রত্যক্ষভাবে এই পরিচ্ছেদের প্রসঙ্গে নামা যেতে পারে।

এই সময় রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে বাস করতে হতো। আশ্রম প্রতিষ্ঠার বছরখানেকের মধ্যেই তাঁর স্ত্রী গত হয়েছিলেন। কাজেই তাঁর সমস্ত ভার উমাচরণ নামে এক সেবকের উপরে এসে পড়লো। রবীন্দ্রনাথের তিনজন সেবক রবীন্দ্রসাহিত্যে স্থান পেয়েছে। প্রথমজন উমাচরণ, দ্বিতীয়জন সাধুচরণ, আর তৃতীয়জন বনমালী বা নীলমণি (তিনি ডাকতেন লীলমণি বলে) সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এ ছাড়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বা শিলাইদহের কুঠীবাড়িতে যদি আর কোনও সেবক থেকে থাকে, তবে তাদের আমি দেখিনি। উমাচরণকে দেখেছি বটে, তবে তার স্মৃতি আমার চোখে খুব ঝাপসা রকমের। কারণ তখন আমি নিতান্ত বালক ছিলাম। রবীন্দ্রনাথের কাছে যাতায়াত খুব বেশী ছিল না আমার। সাধুচরণ ও নীলমণিকে বেশ মনে আছে। এদের কথা আবার পরে আসবে।

এই সময়ে উমাচরণের উপরেই তাঁর সমস্ত ভার ছিল, রবীন্দ্রনাথের জন্য রান্না করা, তাঁর কাপড়চোপড় কেচে ইস্ত্রী করা, বিছানা তৈরী করা, রবীন্দ্রনাথের কোনো ব্যক্তিগত অতিথি এলে তার পরিচর্যা করা —সমস্তই করতে হতো উমাচরণকে। রবীন্দ্রনাথের পোশাকপরিচ্ছদও তখন অত্যন্ত সাধারণ রকমের ছিল। সাদা ধুতি ও ঢিলে-হাতা লংক্লথের পাঞ্জাবি ছাড়া আর কোনও পরিচ্ছদ তাঁর গায়ে দেখিনি। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের এমন একটি বিভূতি ছিল যে এইসব সামান্য কাপড়ও অসামান্য বলে প্রতিভাত হতো। তখন তাঁর দারুণ

অর্থাভাবের মধ্যে কাটছে। পিতার মৃত্যুর পরে যে সম্পত্তি তিনি পেলেন তা নানা রকম দায়দফা সম্বলিত। তাছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত ঋণও ছিল। এই অর্থাভাবের আর একটি কারণ, তাঁর পুত্র ও জামাতা বিদেশে পড়তে গিয়েছিলেন, তাঁদের খরচ নিয়মিত পাঠাতে হতো। এই সময়ে তিনি থাকতেন শান্তিনিকেতন বাড়ির দোতলায়। এইসব নিয়মিত খরচ ছাড়াও আশ্রমের প্রায় সমস্ত খরচই তাঁকে যোগাতে হতো। কতক ঋণ করে, কতক চেয়েচিন্তে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের কল্পনায় এ রবীন্দ্রনাথ নেই। এই আর্থিক অনটনের মধ্যেও শান্তিনিকেতনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কখনো তিনি হতাশ হননি। সত্য কথা বলতে কি, তাঁর সাহিত্য রচনার মতই এই শান্তিনিকেতনও তাঁর সাধনার অঙ্গ ছিল। এই সময়ে শিলাইদহ কাছারী থেকে রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শান্তিনিকেতনে নিয়ে এসে তাঁর উপরে দিলেন হিসাবরক্ষার ভার।

রাজেনবাবু হিসাবরক্ষক হয়ে বসলেন বটে কিন্তু তাঁর দায়িত্ব খুব গুরুভার হলো না। কারণ হিসাবের থলিটা ছিল অত্যন্ত লঘুভার। রাজেনবাবু আপনার অফিসঘরে বসে অবসর সময় অর্থাৎ প্রায় সব সময় দুর্গানাম লিখতেন। এমন সময় হয়তো চিরকুট এলো। প্রেরক অসিত হালদার। "বাড়ীতে চাল কিনবার টাকা নেই। অন্তত পাঁচসিকে পয়সা না পেলে দুপুরে খাওয়া হবে না। শুনলে আনন্দিত হবেন যে আমি এখন সাঁওতালদের ছবি আঁকছি। খুব মজবুত ওদের চেহারা।" তদুত্তরে রাজেনবাবু লিখে পাঠালেন, "তহবিলে অর্থাভাব। কাজেই আশ্রমের ভাঁড়ার থেকে ১।০ সের চাল আপনার লোকের হাতে পাঠিয়ে দিলাম। একদিন গিয়ে আপনার সাঁওতালদের ছবি দেখে আসবো। আপনি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ছবি আঁকুন।" পরবর্তী প্রসঙ্গে হিসেবের খাতায় লিখিত নগদ টাকার পরিবর্তে নেপালবাবুর জন্য প্রেরণ একজোড়া সাদা থানধুতি। সে আমলের হিসেবের খাতা যদি কখনো আবিষ্কৃত হয়, তবে আজকের দিনে শান্তিনিকেতনিকদের কিছু তত্ত্বজ্ঞান হতে পারে। এ তো গেল দুটো হিসেব। যার যথাসাধ্য সদুত্তর লিখিত আকারে পাওয়া যাবে। কিন্তু যেসব নিষ্ফল প্রার্থনার চিরকুট সকাল থেকে আসতে থাকে ও সযত্নে টেবিলের দেরাজের মধ্যে জমতে থাকে তাদের বিবরণ তো দিতে পারা গেল না।

অধ্যাপকদের দাবি, গৃহস্থদের দাবি, জনমজুরদের দাবি—এই হরেক রকমের দাবির অন্ত নেই। সকাল থেকেই চিরকুট আসতে শুরু হয়েছে আর চলবে সারাদিন। এইসব দাবি অভিশাপের মতো রাজেনবাবুর পিছনে লেগেই আছে। অথচ আজ হয়তো মাসের ১০ই তারিখ। ১লা তারিখে বেতন পাওয়া যায়, এমন একটা অন্ধ সংস্কার কোনো কোনো নবাগত অধ্যাপকদের ছিল। অন্তত সেইরকম একটা সংস্কার নিয়েই তাঁরা এসে কাজে যোগ দেন। কিন্তু তাঁরা এ নিয়ে খোঁজখবর শুরু করলেই পুরাতনেরা বলে, এখানে বাইরের নিয়ম চলে না। সারা মাস ধরেই বেতন দেওয়া হতে থাকে। সংসারটা সর্বত্র যদি এই নিয়মের অধীন হতো, তবে গোলযোগ ছিল না। কিন্তু বাইরের বিক্রেতাদের সংস্কার ঠিক এর পরিপোষক নয়। তাই মাঝে মাঝে গোল বাধতো।

রবীন্দ্রনাথ পিতামহের ধন পাননি। কিন্তু তাঁর মেজাজ পেয়েছিলেন। কোথাও থেকে টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা পাওয়া মাত্র সেই ক্ষীণ সম্ভাবনাকে অবলম্বন করে খরচ করতে শুরু করতেন।

হয়তো ছাত্রাবাসের জন্য নূতন একটা ঘর তৈরী হলো, কিংবা হাসপাতালের জন্য নূতন একটা যন্ত্র কেনা হলো, কিংবা হয়তো দুজন অধ্যাপকই নিযুক্ত হয়ে গেলেন। অবশ্য টাকা এলো না। তখন আর কী হবে, খরচের মাত্রা বেড়ে গেলো। প্রধানতঃ এই কারণেই শান্তিনিকেতনের আয়ব্যয়ের কখনো সমতা ঘটতো না। সেই অতিরিক্ত ব্যয়টাকে ঋণ বলে ধরা হতো। তারপরে ঋণ যখন খুব দুর্বহ হয়ে উঠতো, উত্তমর্ণগণ তাগিদ শুরু করতেন (ওটা তাঁদের একটা অন্যায় অভ্যাস)—তখন কবিকে বিশ্বভারতীর জন্য ভিক্ষায় বেরোতে হতো। এই ভিক্ষা ব্যাপারের খরচ হয়তো শেষ পর্যন্ত উঠতো না। তবু কবি দুঃখিত নন, বলতেন যে বিশ্বভারতীর আদর্শটা তো শোনানো হলো। কিন্তু উত্তমর্ণদের আদর্শে পেট ভরে না। তারা টাকার জোর তাগিদ করতো। তখন আর কি হবে? সংকটত্রাতারূপে গান্ধী বা অ্যাণ্ড্রুজ দেখা দিতেন। সত্য কথা বলতে কি, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠান কোনো কেজো লোকের সৃষ্টি নয়, ওটা সৃষ্টি হয়েছে অ্যামেচার রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির প্রেরণায়। এর মূলে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। ছিল অনির্দিষ্ট সৃষ্টির আবেগ। এই প্রতিষ্ঠানকে যাঁরা বিচার করতে

বসেন তাঁরা সব সময় এই কথাটা মনে রাখেন না। এ তো গেল বৃহৎ ব্যাপারের আলোচনা। কিন্তু যেখানে রাজেনবাবুকে নগদ টাকার পরিবর্তে চাল ও ধুতি সরবরাহ করতে হয়, আর হয়তো যাঁর কথা মনে করে রবীন্দ্রনাথকে লিখতে হয়েছিলো—

"শূন্য ঝুলি দেখায়ে গাই
তাইরে নাইরে নাইরে না
না, না, না।"

সেই অন্নবস্ত্রের সংসারে অবস্থা কি রকম একবার ফিরে তাকিয়ে দেখা যাক।

শান্তিনিকেতনে একটি ডাকঘর ছিল। এই ডাকঘরটা ছিল মন্দিরের সোজাসুজি ঠিক পশ্চিমদিকে। যতীন বিশ্বাস ছিলেন পোস্টমাস্টার। আর শশী পিওন ছিল তার একমাত্র বাহন। লোকটির কাজের বিবরণ দেবার আগে তার চেহারা বর্ণনা করলে অন্যায় হবে না। তাকে দেখলে মনে হতো ইণ্ডিয়ান আর্টের ছবির গ্যালারি থেকে সদ্য নেমে এসেছে। কৃশ, কালো, গলায় তুলসীর মালা, হাত-পাগুলো সরু সরু। মুখে সকল সংশয়-ছেদী একটি হাসি। এইমাত্র বললাম যে ইণ্ডিয়ান আর্ট ছবির গ্যালারি থেকে নেমে এসেছে কিংবা ঐ লোকটাই Indian Artএর মূর্তিগুলির আদর্শ—এমন হওয়াও বিচিত্র নয়। যাই হোক, সে যখন বেলা ১০টা নাগাদ কাঁধে সরকারী চামড়ায় ব্যাগটা ঝুলিয়ে অফিসের দিকে রওনা হতো, অফিসে পৌছবার অনেক আগেই কোনো একজন অধ্যাপক এসে তাকে পাকড়াও করতো। বলতো, "ওহে শশী, অফিসে কত টাকা মণিঅর্ডার আছে?" সরল বিশ্বাসে শশী বলতো, "তা বাবু, আজকে ভালই আছে।"

"বেশ, বের কর তো একটা কুড়ি টাকার মণিঅর্ডারের ফর্ম।"

কোনো সন্দেহ না করে শশী একখানা ফর্ম বাবুর হাতে দিল। তিনি পেয়েই প্রাপকের স্থলে for দিয়ে নিজের নাম সই করে বলতেন, "দাও টাকাটা।"

শশীর দোমনা ভাব দেখে তিনি অভয় দিতেন, "এই তো আমার সই দেখতে পাচ্ছো। তোমার কোনো দায় বর্তাবে না। কেবল আমার অনেকগুলো দায় উদ্ধার হয়ে যাবে। এতে আপত্তি করতে নেই।"

শশী আর কি করে, ফর্মে যথারীতি সই হয়েছে—ওদিকে স্বাক্ষরকারীও একজন মাস্টারবাবু, কাজেই শশী দশ টাকার দু'খানি নোট হাতে দিয়ে অফিসের দিকে রওনা হয়ে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে বলতো, "দেখবেন বাবু, আমি যেন কোনো ফ্যাসাদে না পড়ি।"

"আরে রামো, তোমাকে কেউ ছুঁবে না, গুরুদেব কি লিখেছেন মনে নেই ?—

যিনি সকল কাজের কাজী
মোরা তারি কাজের সঙ্গী।"

শশী পিওন যতক্ষণ এই দুই কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য সন্ধান করছে, ততক্ষণ মাস্টারবাবু অন্তর্হিত প্রায়। শশী আর কি করে, গানের ঐ ছত্রটি মনে মনে আবৃত্তি করতে করতে অফিসের দিকে চললো।

এদিকে এই সদ্য আবিষ্কৃত অর্থাগমের পন্থাটি গোপন রইলো না। পরদিন দু'জন মাস্টারবাবু দুদিক থেকে এসে শশী পিওনকে ধরলো। একজন আবার শশীকে অতিরিক্ত খুশি করবার জন্য একটি বিড়ি বের করে তার হাতে দিল। বললো, "নাও রেখে দাও, সময়মতো খেয়ো।"

শশী জিভ কেটে বললো, "বাবু, আপনাদের সামনে কি খেতে পারি ?"

"আরে সেই জন্যই তো বললাম সময়মতো খেয়ো, নাও এখন কি আছে বের করো।"

সেদিন ওখানেই দুটি মনিঅর্ডারের ফর্ম স্বাক্ষরিত ও বিলি হয়ে গেলো।

মাস্টারবাবুরা ভারী খুশী। একজন জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, রাজেনবাবু এ ফর্ম পেয়ে কী বললেন সেদিন ?"

"তিনি আর কী বলবেন বাবু, বললেন, আমার কাজ হালকা হয়ে গেল।"

"তবে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ফর্মে স্বাক্ষর না করিয়ে টাকা দিও না।"

"আমি বললাম, আমি কি জানি না বাবু, এ যে সরকারী চাকরি।"

"হ্যাঁ, মনে থাকে যেন।"

এইভাবে সরকারী টাকা বেসরকারী ভাবে বিলি হতে শুরু হলো। অধ্যাপকদের বাড়িতে আবির্ভাব হলো সত্যযুগের। কিন্তু সংসারের অমোঘ নিয়ম এই যে, এক জায়গায় সত্যযুগ হলে অন্য জায়গায় কলিযুগ হতে বাধা নেই। আপিসে টাকা আমদানি একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। কাজেই আশ্রমের অন্য সব খরচ বন্ধ হলো। অবশেষে অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে শশী পিওনের আর মণিঅর্ডার বিলি করবার জন্য এদিক-ওদিক ঘুরতো হতো না, পোস্টাপিসের নিকটবর্তী একটি চালতাগাছের তলায় সাবপোস্টাপিস বসে গেল। একজন মাস্টারবাবু বললেন, "ওহে শশী, সঙ্গে কিছু খাম পোস্টকার্ড রেখো। তাহলে আর আমাদের কষ্ট করে যতীনবাবুর কাছে যেতে হবে না।"

শেষে অবস্থা এমনি দাঁড়ালো যে, রাজেনবাবুকে জানাতে হলো আশ্রমের কর্তৃপক্ষকে যে টাকাপয়সা আমদানি একদম বন্ধ এবং সঙ্গে সঙ্গে তার কারণটাও। কর্তৃপক্ষ চিন্তিত হলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি ফর্মের হিসাবগুলো রাখছেন তো?"

তিনি অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে সেসব না রাখলে হিসাব মেলাবো কি করে?"

"হ্যাঁ, মনে রাখবেন এ সরকারী টাকা। জমিদারী সেরেস্তার টাকা নয়।"

তখন কর্তৃপক্ষ পোস্টমাস্টার যতীন বিশ্বাসকে সমস্ত অবস্থা অবগত করালেন। তবে শশী পিওনের যে কোনো দোষ নেই, সঙ্গে সঙ্গে তাও বললেন। যতীনবাবু সমস্ত অবস্থা অবগত হয়ে বললেন, "কি সর্বনাশ, এ যে রীতিমতো রাহাজানি।"

"যাই হোক, ব্যাপারটা চাপা দিয়ে ফেলুন।"

এতক্ষণ শশী পিওন একান্তে দাঁড়িয়ে মাস্টারবাবু কথিত সেই ছত্রটি মনে আনবার চেষ্টা করছিল। এতক্ষণ পরে হঠাৎ সে বলে উঠলো, "হ্যাঁ বাবু, চাপা তো দিতে হবে। গুরুদেববাবু যে লিখেছেন 'আমরা তাঁরই কাজের সঙ্গী'। সকলেই আমরা একসঙ্গে কাজ করি কিনা।"

তখন ডাকবাবু শশী পিয়নকে বললেন, "দেখো, এ হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার নয়। উপরে রিপোর্ট হ'লে তুমি বিপদে পড়বে। আপাতত চাপা দিয়ে রাখলাম কিন্তু আর বেশিদিন এভাবে টাকা বিলি হলে

চাপা দিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। মনে থাকে যেন।

শশী পিওন "যে আজ্ঞে মাস্টারবাবু" বলে বিদায় নিয়ে গেল।"

ওদিকে শিক্ষক-অধ্যাপকদের কানেও কথাটা উঠেছে। তারা কয়েকজন সমবেত হয়ে স্থির করলো, টাকাটা শশী পিওনের কাছে থেকেই নিতে হবে, রাজেনবাবুর হাতে গিয়ে পড়লে আর আদায় করা যাবে না। তবে এখন থেকে শশীর কাছ থেকে টাকা নেওয়ার টেকনিক কিছু বদল করতে হবে।

"সেটা আবার কি রকম?"

"শাস্ত্রে প্রকৃতি-পুরুষের লীলা পড়েছো তো? অনেকটা সেই রকম। নেপোলিয়নের রণনীতি দিয়েও বোঝাতে পারতাম। কিন্তু সেটা তোমাদের পক্ষে দুর্বোধ্য হবে।"

"শাস্ত্রও থাক রণনীতিও থাক, মোদ্দা কথা টাকা যাতে পাওয়া যায় তা হলেই হল।"

"ধর আমরা কজন আছি! শশী পিওনের কাছে থেকে সরাসরি নিই জন দশ-বারো। এবারে মন দিয়ে শোন, কিন্তু দেখো যেন সংখ্যা আর না বাড়ে সরলভাবে বলতে গেলে চারিদিক থেকে শশী পিওনকে ঘিরে ফেলতে হবে, যাতে রাজেনবাবুর দপ্তর পর্যন্ত না পৌঁছতে পারে। দেখো, ডাকঘর আর রাজেনবাবুর দপ্তরখানা, এর মধ্যে আমাদের টেক্‌নিক্ ফলাবার ক্ষেত্র। একসঙ্গে সকলে আক্রমণ করলে শশী ভড়্‌কে যাবে। কাজেই বিচ্ছিন্ন ভাবে আমাদের এদিক ওদিক লুকিয়ে থাকতে হবে। ধরো ঐ গাছটার আড়ালে, কিংবা ঐ ইদারার পাশে। তারপর যখন শশী দেখতে পাবে চারদিক থেকে তার পথ বন্ধ হয়ে গেছে, তখন বেচারীর surrender করা ছাড়া উপায় থাকবে না। এমনি ঘটেছিল নেপোলিয়নের। থাক, ও তোমরা বুঝবে না। তখন বাছাধনকে সুড়সুড় করে মণিঅর্ডার ফরম্ বের করে দিতে হবে।"

"কিন্তু আপনি যে প্রত্যেক দিন বেশি টাকার মনিঅর্ডার সই করে নেবেন এটা কিন্তু উচিত নয়।"

"দেখো, হাজার হোক আমি তোমাদের থেকে বয়সে বড়, আর আছিও তোমাদের চেয়ে বেশী দিন। কাজেই আমার দাবী—"

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আর একজন বলে উঠলো,

"আর টেক্‌নিক্‌টাও ওঁর উদ্ভাবিত।"

তখন পাছে রসভঙ্গ হয়, এ নিয়ে আর চাপাচাপি হল না।

একজন বলে উঠলো, "আজ যে রবিবার। খামোকা রবিবার আসে কেন?"

তখন আগামী কল্য যে সোমবার তার যে অন্যথা হবে না, সেই ভরসায় সকলে প্রস্থান করলো।

পরদিন সোমবার সুপ্রভাতে শশী পিওন ডাকঘর থেকে বের হয়ে দেখলো, মাস্টারবাবুরা কেউ কোথাও নাই। সে নিশ্চিন্ত মনে লম্বা লম্বা পা ফেলে চললো অফিসঘরের দিকে। এমন সময় একটি গোড়া-মোটা আমগাছের আড়াল থেকে অঙ্কের মাস্টারবাবু হাসিমুখে বেরিয়ে বললেন, "এই যে শশী, ভাল আছ?"

তাঁর হাসি দেখে শশীর হাসি অন্তর্হিত হল। সে বললো, "আর ভাল থাকি কি করে বাবু? যে জিনিসপত্রের দাম! এমন কি বিড়িটার পর্যন্ত দাম বেড়ে গিয়েছে।"

এই কথোপকথনের মধ্যে ইঁদারার আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়লেন ভূগোলের মাস্টারবাবু। বললেন, "এটা সত্যি অন্যায়। তোমরা সারাদিন রোদে রোদে ঘুরে ডাক বিলি করো। সরকারের উচিত অন্ততঃ বিড়িটা তোমাদের সরকারী খরচে সাপ্লাই করা।"

"আরে সেই কথা ভেবেই তো আমি অতিরিক্ত একটি বিড়ি নিয়ে এসেছি তোমার জন্যে—এই নাও ধরো।"

শশী দেখলো ইংরাজীর মাস্টারবাবু একটি বিড়ি তার দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন। শশী লজ্জায় জিভ কেটে বললো, "বাবু—"

তিনি ততোধিক সলজ্জ ভাবে বললেন, "হাঁ হাঁ, ওটা এখন থাক। ওটা অবসর সময়—এখন ব্যাগের ভিতর কি আছে বের কর তো।"

শশী অনেকগুলো ফরম বের করতে করতে বললো, "বাবু, ডাকবাবু আমাকে শাসিয়ে দিয়েছেন যে এমন করলে চাকরি চলে যাবে।"

এই কথা শুনে সকল মাস্টারবাবুরা আশ্বাসজনক হাসি হেসে বললো, "ওঃ, এই কথা। সরকারী চাকরি একবার হলে আর যায় না।" তখন সকলে ভাগাভাগি করে ফর্মগুলো নিয়ে যথাস্থানে স্বাক্ষর করে বললো, "নাও এবারে টাকা বের করো। দেখ তো এ

কতজনের উপকার হল। অফিসে রাজেনবাবুরও কাজ কমে গেল। পোস্টবাবুরও হিসাবের ঝামেলা থাকলো না—আমরাও যার যার মত পেয়ে গেলাম।"

প্রত্যেক দিনই এই রকম ব্যাপার ঘটতে লাগলো। তখন শশী বুঝলো পালা বদল হয়েছে, লীলা বদল হয়নি। যখন শশীকে নানা দিক থেকে ঘিরে ধরতো, মনে হতো যেন পলায়মানপর কৃষ্ণকে বন্দী করবার জন্য ডজনখানেক রাধা চক্রান্ত করছে। এইভাবে কত দিন চলতো, কি তার পরিণতি হতো তা কেউ বলতে পারে না। এমন সময় একটা প্রাকৃতিক ঘটনায় সমস্ত ব্যাপারটা আকস্মিক পরিণতিতে এসে পৌঁছল।

শান্তিনিকেতনের উদার প্রান্তর কালবৈশাখীর অবাধ আসর। সন্ধ্যার পরে প্রায়ই ঝড় ওঠে, ঝড়ের পরেই নামে বৃষ্টি। এখন যেহেতু শান্তিনিকেতনের অধিকাংশ ঘরই খড়ের এবং ঝড়ের দাপটে চালেব খড় আলগা হয়ে যায়, আর তারপর বৃষ্টি নামলে ঘরের ভিতরে জল পড়ে। তখন বাধ্য হয়ে তক্তপোষগুলো এদিক-ওদিক টানাটানি করতে হয়। দু-একদিন এমন হলে বা সহ্য করা সম্ভব, কিন্তু কালবৈশাখীর ঝড়ের এমনই রোখ যে প্রায় প্রতিদিনই আসে। আর বৃষ্টির জলে নিয়মিত ভেজে। তখন শুরু হয় আবার তক্তপোষ টানাটানি। শান্তি-নিকেতনের দক্ষিণদিকে গুরুপল্লী। নামেই বোঝা যাচ্ছে অধ্যাপকদের বাসস্থান। তখন তরুণ অধ্যাপকরা শশী পিওনের সঙ্গে লুকোচুরি করে টাকা আদায় করতেন। প্রবীণরা সে খেলা উপভোগ করলেও সরেজমিনে নামতেন না।

তাঁদের অটুট বিশ্বাস ছিল রাজেনবাবুর তহবিলের উপর। কিন্তু তহবিলের অবস্থা আগেই বলেছি। রাজেনবাবু বলতেন, "এখানে আমার কাজ খুব হালকা। শিলাইদহতে বড় খাটুনি ছিল।" প্রবীণ অধ্যাপকরা চাল মেরামত করবার জন্য তাঁকে লিখে পাঠাতেন। সে-সব চিরকুট নিয়মিত জমা হতো তাঁর টেবিলে। অবশেষে প্রবীণদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো।

"মশায়, এমনভাবে তো স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সারারাত জেগে থাকা যায় না।"

"উপায় বা কী?"

একজন বললেন, "আছে। তবে সেটা শেষ উপায়। একদিন একটা ছুটির দিনে উত্তরায়ণে গিয়ে দরবার করতে হবে।"

তৎকালীন উত্তরায়ণ দুখানি খোড়ো ঘর মাত্র। রবীন্দ্রনাথের বড় সাধ ছিল যে তিনি ছোট একটি খোড়ো ঘরে বাস করবেন। কিন্তু তাঁর এমনই দুর্ভাগ্য যে ঘরটাতে প্রবেশ করতেন কিছুদিনের মধ্যে সেটা ইমারত হয়ে যেতো। সেদিনকার খোড়ো উত্তরায়ণের পরিণতি বর্তমান প্রাসাদ উত্তরায়ণ।

কয়েকজন প্রবীণ অধ্যাপককে অতো সকালে আসতে দেখে তিনি বুঝলেন, ব্যাপার কিছু গুরুতর। তবে তিনি কথা বলবার আগেই উপবিষ্ট হয়ে একজন অধ্যাপক বললেন, "আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে দেখছি।"

"ক্লান্তির আর অপরাধ কী মশায়, বৃষ্টির জল থেকে আত্মরক্ষার আশায় যদি সারারাত তক্তপোষ টানাটানি করতে হয়, তবে ভোরবেলা মুখ প্রফুল্ল দেখাবে এমন প্রত্যাশা করা উচিত নয়।"

তাঁর উত্তরে স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে প্রবীণরা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে থাকলেন। তারপরে একজন বলে উঠলেন, "আচ্ছা, আপনি এতো কষ্ট করতে যান কেন? পাকা একটা বাড়িতে থাকলেই তো পারেন।"

এই কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ যে উত্তর দিলেন, তা শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকার যোগ্য।

"দেখুন আমার ছাত্রদের ও অধ্যাপকদের খোড়ো ঘরে রেখে আমার পক্ষে পাকা বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়।" তারপরে একটু থেমে থেকে বললেন, "এতো ভোরে আপনাদের আসবার কারণ বুঝতে পারছি। আমার মনে থাকবে।"

মনে সত্যিই ছিল। কোথা থেকে টাকার যোগাড় হলো জানি না। অধ্যাপকদের অনেকগুলি বাড়ি পাকা হয়ে গেল। কিছুদিন পরে ছাত্রদেরও পাকা বাড়ির ব্যবস্থা হলো। সবশেষে উত্তরায়ণ হলো প্রাসাদ।

এই ছিল তখনকার শান্তিনিকেতন। অর্থাৎ শান্তিনিকেতনের অলিখিত ইতিহাস। দুঃখের স্মৃতি আর তেমন দুঃখদায়ক কি?

॥ ৪ ॥

সুধাকান্তদা

আমি প্রথম গিয়ে শান্তিনিকেতনে যে ঘরটিতে আশ্রয় পেলাম, তার নাম বীথিকা গৃহ। এখানে বলে রাখি, এ ঘরেই আমার শান্তিনিকেতন জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে। আরও বলে রাখি, এখানে শুধু প্রথম রাত্রি কাটেনি, শান্তিনিকেতনে শেষ রাত্রিও কেটেছিল।

এই ঘরে এসে গৃহশিক্ষকরূপে (তখন প্রত্যেক ঘরেই ছাত্রদের সঙ্গে একজন শিক্ষক বাস করতো) পেলাম সুধাকান্তদাকে, তাঁর পুরো নাম ছিল সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। কিন্তু আমরা তাঁকে সুধাকান্তদা বা সুধাদা ছাড়া, আর কোনও নামেই জানতাম না। সুধাকান্তদার কেতাবী শিক্ষা খুব বেশী ছিল না, তবে জীবন থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তা ছিল তাঁর প্রচুর। আনন্দমঠে যেমন সবাই আনন্দ, এখানেও তেমনি সবাই দাদা। বয়সের ব্যবধানে দাদা বলে ডাকতে কোনও বাধা হতো না।

এবারে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য সেরে নিই। শান্তিনিকেতনে কখনো কোনো দিন ষোল আনা প্রকৃতিস্থ লোক আসেনি, এলেও বেশী দিন থাকতে পারেনি। প্রতিষ্ঠাতা আচার্যকে দিয়েই আরম্ভ করা যেতে পারে। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কোনও ব্যক্তি এসে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভাইদের কথাবার্তা শুনে মন্তব্য করেছিলেন, মশায়, আপনাদের সকলেরই মাথায় একটু করে ছিট আছে দেখছি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—একটু করে নয় মশায়, এক থান করে ছিট আছে। সেই ছিটগ্রস্ত লোকেরাই এখানে ছিটকে এসে পড়তেন। সুধাকান্তদা তাঁদেরই একজন। তা নাহলে তাঁকে নিয়ে একটা পরিচ্ছেদ লিখতে বসতাম না। কোথা থেকে আরম্ভ করবো তাই ভাবছি। তিনি আমাদের পড়াতেন বটে বাংলা, কিন্তু বইয়ের পাতার চেয়ে শালগাছের পাতার উপর তাঁর বেশি দৃষ্টি ছিল। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, ওখানেই তো আসল মজা। পরে বুঝেছিলাম, মজা হচ্ছে, গুটিপোকা। এই গুটিপোকা সম্বন্ধে তিনি বাতিকগ্রস্ত ছিলেন। তাঁর এই বাতিক সমর্থন করবার লোকেরও অভাব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ

বলতেন, ওটা প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ। সুধাকান্তদার প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণে আমাদেরও সমর্থন ছিল। কারণ আমরা জানতাম তাঁর মনোযোগ যে পরিমাণে গুটিপোকাগুলোর দিকে পড়বে, সেই পারমাণে আমাদের দিকে তাঁর মনোযোগ আল্‌গা হয়ে যাবে। এটাই আমাদের সমর্থনের আসল কারণ।

বীথিকা ঘরের সামনে একটা লম্বা শালগাছ ছিল। তার তলায় আমি ক্লাস নিতাম। এ অনেকদিন পরেকার কথা বলছি, তখন আমার বয়েস হয়েছে। দু-একটা ক্লাসও নিতে শুরু করেছি। একদিন ক্লাস নিচ্ছি, তখন হঠাৎ ছেলেরা চঞ্চল হয়ে গাছের উপরদিকে তাকালো। সকলে একযোগে 'সাপ' বলে চিৎকার করে উঠলো। আমি উপর-দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সাপটা নীচের দিকে নামছে। তখন ছেলেরা ঢিল মারতে শুরু করলো। আহত হয়ে সাপটা মাটিতে পড়ে গেল। দেখলাম একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ, সেটাও বোধ করি প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে গাছের উপরে উঠেছিল। ছাত্রদের মনোযোগের অভাবে সেটা যদি সরাসরি নামতো, তবে ঠিক পড়তো আমার মাথার উপরে, তাহলে আর এই পুরানো দিনের কথা লেখা হতো না বলে মনে হয়। যাক, সেদিনের মতো ক্লাস তো ভেঙে গেল। ইতিমধ্যে গোলমাল শুনে সুধাকান্তদা এসে উপস্থিত। বললেন, "বেটাকে আচ্ছা করে মেরে পুড়িয়ে ফেলো। বেটা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী।"

একবার রবীন্দ্রনাথের মনে হলো যে, শিশুবিভাগে ছাত্ররা যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য পাচ্ছে না। তখন তিনি শিশুবিভাগের কর্তা সুধাকান্তদাকে ডেকে বললেন, "দেখ্, তোদের শিশুবিভাগ থেকে চারজন ছাত্রকে বিকেলবেলা জল খাওয়ার সময় আমার কাছে পাঠিয়ে দিবি। ওদের নিয়মিত খাদ্যের উপরে আর কিছু খেতে দেবো। যাদের রুগ্ন বলে মনে হয়, তাদেরই পাঠাবি।" বলা বাহুল্য, এই চারজনের মধ্যে আমি একজন নির্বাচিত হলাম। বিকেলবেলা তাঁর চা-পানের সময় শান্তিনিকেতন বাড়ির দোতলার ছাদে গিয়ে দেখি তাঁর চায়ের টেবিল পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া প্রতিমা দেবীও উপস্থিত আছেন। আমাদের দেখে তিনি বললেন, "বৌমা, এই যে ওরা এসেছে। ওদের জন্য কি করেছো দাও।" তখন উমাচরণ চার প্লেট পুডিং এনে আমাদের হাতে দিলে। আমরা চামচ সহকারে সেই পুডিং-এর সদ্ব্যবহার

করলাম। আমরা যেতে উদ্যত হলে প্রতিমা দেবী বললেন, "আবার কালকে এসো।"

এই সময়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা খবর এসে পৌঁছলো যে, রবীন্দ্রনাথ 'নোবল' পুরস্কার পেয়েছেন। সেই খবরের অভিঘাতে আশ্রমের নিয়মশৃঙ্খলা শিথিল হয়ে গেল। কে যে কি ভাবে আনন্দ প্রকাশ করবে ভেবে পাচ্ছিল না। তখন পিয়ার্সন সাহেব দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কাফ্রীদের যে সব ঢাল, তরোয়াল, মুখোশ প্রভৃতি এনেছিলেন, সেগুলি ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করলেন। দেখতে দেখতে সবাই ঐ সব মুখোশ ও ঢাল-তলোয়ারে সজ্জিত হয়ে বর্তমানের গৌর প্রাঙ্গণের মধ্যে এসে উপস্থিত হলো। তখন চাঁদ উঠেছে। আর এই সব অপরূপ সাজে সজ্জিত ছেলেরা নাচতে শুরু করলো। মিস্টার পিয়ার্সনও তাদের মধ্যে ভিড়ে গেলেন। কিন্তু সকলেরই মনে হচ্ছিল আসর ঠিক জমছে না। কি যেন একটা অভাব রয়েছে। এমন সময়ে সুধাকান্তদার আবির্ভাবে অভাব দূরীভূত হয়ে আসর জমে উঠলো। কিন্তু এ কি তাঁর সাজ! মুখে এমন কালি-ঝুলি মেখেছেন যে চেনাই যায় না। আর প্রকাণ্ড একটা লেজ। ইদারায় জল তুলবার একটি লম্বা দড়িকে কোমরেব সঙ্গে পেঁচিয়ে নিয়েছেন। বাকী আট-দশ হাত লেজের মতো ঝুলছে। কিন্তু তাঁর কাছে যাবে এমন সাধ্য কার। সেই লেজটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যাকে পারছেন মারছেন। সকলেই ছুটে পালায়। কেউ আর কাছে ঘেঁষতে চায় না। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কি লম্ফঝম্প। এবারে আসর সত্যি জমে উঠলো।

এই সময়ে গ্রীষ্মের ছুটিতে সুধাকান্তদা আমাদের দুই ভাইকে বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্যে সঙ্গে চললেন। নাটোর স্টেশনে নেমে দশ-বারো মাইল পথ মোষের গাড়িতে যেতে হয়। মোষের গাড়ি যথাস্থানে উপস্থিত ছিল। সঙ্গে জনদুই পাইকও এসেছিল। যথাসময়ে এসে আমরা পৌঁছলাম।

আমি আগেই চিঠি লিখে সুধাকান্তদার পাণ্ডিত্য ও অন্যান্য গুণের কথা জানিয়েছিলাম। সুধাকান্তদার আদর-অভ্যর্থনার অভাব হলো না। পরদিন সন্ধ্যাবেলায় চাঁদের আলোয় প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা আসর বসলো। গাঁয়ের অনেক ভদ্রলোক এসেছিলেন। এমন সময় একজন সুধাকান্তদাকে গান করতে অনুরোধ করলেন। আমি

মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। ভাবলাম এবার বুঝি তাঁর স্বরূপ প্রকাশ হয়। কারণ তাঁকে কখনো গান করতে শুনিনি। কিন্তু তিনি অকুতোভয়। বললেন, একটা হারমোনিয়াম পেলে ভালো হতো। মনে হয়তো আশা ছিল যে হারমোনিয়াম জুটবে না, তাঁকেও হয়তো গান করতে হবে না। কিন্তু হারমোনিয়াম এসে গেল। আমরা মনে মনে পলকে প্রলয় গুণছি। ওদিকে সুধাকান্তদা হারমোনিয়ামটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে বাজাতে শুরু করে গান ধরলেন—

"আজি দখিন দুয়ার খোলা
এসো হে এসো বসন্ত এসো।
দিব হৃদয় হৃদয় দোলায় দোলায়
এসো মাখিয়া ফুলের রেণু
বাজায়ে ব্যাকুল বেণু
চরায়ে ধবলী ধেনু।"

আমি তখন হাসি চাপবার উদ্দেশ্যে আসর ছেড়ে প্রস্থান করলাম। কারণ গানের সুর ও পদ দুই-ই নূতন। আর অনুপ্রাসের মাধুর্য সত্ত্বেও ধবলী ধেনু কবির কল্পনাতেও ছিল না। শ্রোতারা হয়তো ভদ্রতার খাতিরেই হাসলেন না। কিংবা তাঁদের কাছে সুর ও পদের অসঙ্গতি আদৌ ধরা পড়েনি।

গানের পালা তো কাটিয়ে উঠলেন সুধাদা। কিন্তু এদিকে দিবারাত্রিতে যে ভূরিভোজন চলছিল তার পালা এত সহজে কাটলো না। তিনি উদরাময়ে আক্রান্ত হলেন। তখন আমি তাঁর একান্ত সচিবের মতো গোপনে গোপনে ওষুধপত্র সরবরাহ করতাম। তিনি ভাল করে সুস্থ হয়ে উঠতে না উঠতেই যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে আমাকে ব্যবস্থা করতে বললেন। আমি বললাম, "আর দুটো দিন থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুন। তারপর না হয় যাওয়ার কথা ভাববেন।"

তিনি বললেন, "বিশী, ঐ যে দুটো খাসি বাঁধা রয়েছে, দুদিন থাকলে ওর লোভ সম্বরণ করতে পারবো না।"

বললাম, "মাংস খাবেন না।"

"ঐটি আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। পাতের কাছে বাটি-ভরা মাংস, আর বলবো খাবো না, এ আমার কুষ্ঠিতে লেখে না। তার

চেয়ে তুমি গাড়ির ব্যবস্থা করে দাও।"

তিনি রওনা হয়ে গেলেন। ছুটির পর শান্তিনিকেতনে এসে দেখি সুধাকান্তদা কাজে যোগ দেননি। শুনলাম সিউড়িতে কী এক কাজ জুটিয়ে নিয়েছেন।

অল্পদিনের মধ্যেই নানা সূত্রে তাঁর কাজের বিবরণ জানতে পারা গেল। নবাগত এক পাদ্রীসাহেবের সঙ্গে জুটে গিয়েছেন, কিংবা পাদ্রীসাহেবকেই জুটিয়ে নিয়েছেন— কোন্‌টা ঠিক জানি না।

পাদ্রীসাহেব তাঁর খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান ও খ্রীষ্টের প্রতি ভক্তি দেখে বললেন, "বাবু, তুমি খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করবার ব্রত নাও।"

সুধাকান্তদা বললেন, "উত্তম, আমি এখনই রাজী। এই রকম একটা কাজের জন্যই আমি মনে মনে অপেক্ষা করছিলাম।"

"তাহলে যে বাবু তোমাকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে হবে।"

"দেখ সাহেব, খ্রীষ্টান হয়ে যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করবো, তাতে আর নূতনত্ব কী? খ্রীষ্টান নই, তবু খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করছি, এর শুভ প্রতিক্রিয়াটা একবার কল্পনা করে দেখো। চারদিকের মেষপাল তোমার গীর্জায় এসে উঠবে।"

এরকম প্রস্তাব সাহেবের কল্পনাতেও ছিল না। তিনি কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন। বললেন, "আচ্ছা, ভেবে দেখি।"

"এতে আর ভাববার কি আছে সাহেব? তুমি খ্রীষ্টান পাদরী। তুমি যদি এখন গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে হিন্দুধর্ম প্রচার করতো থাকো, তবে এই বীরভূম জেলায় যে কটা খ্রীষ্টান আছে, তারা মাথা মুড়িয়ে হিন্দুর মন্দিরে গিয়ে ঢুকবে।"

সাহেব বললেন, "এ রকম কথা তো আগে আমার মনে হয়নি।"

সুধাকান্তদা অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে বললেন, "তার কারণ এর আগে আমার মতো লোকের সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি।"

সাহেব বললেন, "আচ্ছা বাবু, পরীক্ষাধীন ভাবে তোমাকে এক বছরের জন্য নিয়োগ করলাম।"

সুধাকান্তদা ভাবলেন, চোরের রাত্রিবাসটাই লাভ। বললেন, "দেখো এক বছরের মধ্যে খ্রীষ্টের খোঁয়াড়ে স্থানাভাব ঘটিয়ে দেবো।"

সাহেব বললেন, "এ পরীক্ষায় আমি যদি উত্তীর্ণ হই, তবে গাঁয়ে

গাঁয়ে আমি হিন্দু পাদ্রী প্রেরণ করে সমস্ত দেশটাকে খ্রীষ্টানে পরিণত করবো।"

অতঃপর সুধাকান্তদা হিন্দু পাদ্রী হয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টানের টাকা বিলি করতে শুরু করলেন। এর পরে আরো আছে। তা ক্রমশ প্রকাশ্য।

দু-দশদিন গাঁয়ের মধ্যে ঘোরাফেরা করে সাহেবকে এসে নিবেদন করলেন, "সাহেব, লোকেরা বড় গরীব। যথাসাধ্য তুমি অবশ্যই দিচ্ছ, কিন্তু ওদের অভাব এতে মেটে না।"

তখন সাহেব বললেন, "আরে সেইজন্যেই তো আমরা এখানে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে এসেছি। অভাব আছে বলেই ওরা আমাদের কাছে আসে।"

"সেটা আমি দেখেছি। ওরা বলে, সাহেব বড় দয়ালু।"

সাহেব বললেন, "তা আমি জানি। যখন রাঁচীতে ছিলাম, লোকেরা আমার নামে গান বেঁধে ছিল।

প্রভু বড় দয়ালু।
যাহার দয়ায় দাড়ি গজায়
শীতকালে খায় শাঁকালু।"

সুধাকান্তদা শুনে বললেন, "এরাও অনেক গান বেঁধেছে। তবে কি জানো, ধর্মই বলো, ভক্তিই বলো, সকলেরই মূল কথা হচ্ছে অর্থ।"

সাহেব সুধাকান্তর মতো এত বড় নামটা উচ্চারণ করতে পারতেন না। বললেন, "বাবু, তুমি ধর্মের মূল কথাটা বুঝেছ। আচ্ছা কাল থেকে আমি টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দেব।" সুধাকান্তদা প্রফুল্ল মনে বিদায় হয়ে গেলেন।

বেশ কয়েকদিন পরে ফিরে এসে বললেন, "সাহেব, তুমি যে টাকার বরাদ্দ করেছো, তাতে বেশ কাজ হচ্ছে। খ্রীষ্টের খোঁয়াড়ে প্রবেশেচ্ছু মেষের সংখ্যা বেশ বেড়ে উঠেছে। কিছু গান-টান বেঁধেছ কি?"

"বেঁধেছি বৈকি। আমি একখানা খাতায় সব লিখে রেখেছি। খাতাখানা এর পরদিন তোমাকে দেব।"

পরদিন যখন খাতা হাতে করে সুধাকান্তদা উপস্থিত হলেন, সাহেব বললেন, "বাবু, বড় বিপদ।"

সুধাকান্তদা বিস্ময়োচিত গাম্ভীর্য অবলম্বন করে বললেন, "কী হয়েছে?"

"আমাদের সোসাইটি থেকে টেলিগ্রাম এসেছে এখানে কাজকর্ম কী রকম হচ্ছে, দেশে গিয়ে অবিলম্বে সেই রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।"

"এর জন্যে ভাবনা কী? তুমি এই খাতাখানা হতে করে চলে যাও। এতে লিখিত গানগুলি দেখালেই সোসাইটি পরম সন্তুষ্ট হবে।"

সাহেব তখন খাতাটা উল্টেপাল্টে দেখতেই প্রথমে নজরে পড়লো একটি ছোট গান।

"আমরা প্রভুর মেষ
খাচ্ছি দাচ্ছি বেশ
এখানে আর মন টেঁকে না
বিলেত মোদের দেশ।"

গানটি পড়ে সাহেব বলে উঠলেন, "বাহবা, বাহবা! এতো অল্প দিনে এমন সুফল পাওয়া যাবে ভাবিনি।"

"কবে রওনা হচ্ছো সাহেব?"

"আমি তো ভাবছি আজকে রাতের গাড়িতেই কলকাতা চলে যাবো।"

"হ্যাঁ, যত শীঘ্র যাও ততই ভালো। কিন্তু যাওয়ার আগে যথেষ্ট টাকার ব্যবস্থা করে যেও। তা নাহলে ফিরে এসে দেখবে যারা গীর্জের দিকে এগোচ্ছিল, তারা মন্দিরে গিয়ে ঢুকেছে।"

সাহেব ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, "কী সর্বনাশ, এমন হলে সোসাইটির কাছে মুখ দেখাতে পারবো না।" এই বলে সুধাকান্তদার হাতে মেষের দল বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট টাকা দিয়ে সাহেব নিশ্চিন্তমনে দেশে রওনা হয়ে গেলেন।

মাসতিনেক পরে সাহেব ফিরে এলেন সিউড়ি শহরে। সুধাকান্তদাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভুর মেষপালের খবর কি?"

সুধাকান্তদা বললেন, "মেষপাল তো ম্যা-ম্যা শব্দ করছিল। তবে তোমার আসতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে ওরা আবার ম্যা-ম্যা শব্দের বদলে মা-মা শব্দ শুরু করে দিয়েছিল।"

"কী সর্বনাশ, তাদের বলো আমি এখন এসেছি। এখন তারা

উচ্চস্বরে আবার ম্যা-ম্যা শব্দ আরম্ভ করুক।"

"সেজন্য তুমি ভেবো না, আমি দেখবো"—এই বলে সুধাকান্তদা যেতে উদ্যত হলেন।

সাহেব বললেন, "যে টাকা তোমায় দিয়ে গিয়েছিলাম, সে টাকার হিসেব এনে দিও। সোসাইটিকে পাঠাতে হবে।"

এই কথা শুনে সুধাকান্তদা ধপ্ করে একখানা চেয়ারে বসে পড়লেন, এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন।

সাহেব তাঁকে বললেন, "কী হলো বাবু, শরীর খারাপ হলো নাকি?"

"শরীর নয় সাহেব, মনটা খারাপ হয়ে গেল।"

সাহেব বললেন, "কেন, কেন, কী হয়েছে?"

"হবে আবার কী? এদেশে খয়রাতি টাকার হিসাব কেউ রাখে না, কেউ চায় না। এই যে জগন্নাথের মন্দির আছে—"

সাহেব বললেন, "শুনেছি, জগর্‌নাট।"

"সে মন্দিরে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। না রাখে কেউ হিসাব, না চায় কেউ হিসাব। তোমার মেষপাল যদি এই কথা শুনতে পায়, তবে তারা এখনই 'মা'-'মা' শব্দ করতে করতে মন্দিরের দিকে ছুটবে।"

"তবে তো দেখছি মুশকিল।"

"মুশকিল বলে মুশকিল। আমি দেখছি এদেশে খ্রীষ্টধর্মের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই।"

"কেন, যে গানগুলো লিখে এনেছিলে, সেগুলো তো খুব ভালো হয়েছিল। সোসাইটি দেখে ভারী খুশি। টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে। কাজেই এখন তোমাকে আরো বেশী টাকা দিতে পারবো।"

"তা তো পারবে। কিন্তু ঐ যে হিসেবের কথা বলছো, কাজেই বুঝতে পারছি আমার এর মধ্যে আর থাকা চলবে না।"

সাহেব অনেক অনুনয়-বিনয়, অনুরোধ-উপরোধ করলেন। কিন্তু সুধাকান্তদা সাহেবের সঙ্গ পরিত্যাগ করে বিদায় নিলেন। তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন, খ্রীষ্টধর্মের ভবিষ্যৎ না হোক, তাঁর ভবিষ্যৎ এখানে অচল। তিনি বিদায় নিয়ে চলে এলেন। তারপরে আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন।

এবার শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে সুধাকান্তদা আর পড়ানোর কাজ নিলেন না। কিছুদিন শ্রীনিকেতনে যাতায়াত করলেন, সেখানে বোধ করি সুবিধা হচ্ছিল না। একেবারে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে বললেন, "অনেক দিন তো এখানে হলো, এবার ভাবছি বাইরে কোথাও যাবো।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "তোর বাইরে গিয়ে কাজ নেই। এবার আমার দপ্তরে চলে আয়।"

"আপনার দপ্তরে তো লেখাপড়ার কাজ। ও পাঠ তো আমার নেই।"

"কে বললে শুধু লেখাপড়ার কাজ, এই তো নূতন প্রেস বসেছে। তার ম্যানেজার হয়ে যা না। অবশ্য তাতেও অক্ষরজ্ঞান আবশ্যক। সেটুকু জ্ঞান নিশ্চয় তোর আছে।"

অতঃপর সুধাদা প্রেসের ম্যানেজার রূপে দেখা দিলেন। প্রেসের অন্যান্য কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজস্ব একখানা মাসিকপত্র বের করে ফেললেন। নামটা বোধ হয় 'অগ্রণী' বা ওইরকম কিছু, আমার মনে নেই। তাতে একটা বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলেন। তাতে বলা হলো যে, "নূতন লেখকদের রচনা বিশেষ আগ্রহ সহকারে আমরা ছাপিয়ে থাকি। নূতন লেখকগণ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।" ইতি সম্পাদক।

বাংলাদেশে আর যারই অভাব থাকুক, নূতন লেখকের অভাব নেই। অবশ্য এ পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা বলছি। এখন নূতন লেখকের সংখ্যা আরো বেড়েছে। তারা অপরের পত্রিকার মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে নিজেরাই Little magazine বের করে।

এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নূতন লেখকদের পত্র আসতে লাগলো সম্পাদকের হাতে। সম্পাদক প্রত্যেককে ব্যক্তিগত পত্রে জানালেন যে, পত্রিকা নূতন লেখকদের জন্যই প্রকাশিত হচ্ছে। কাজেই তাদের দায়িত্ব আছে। অবশ্য সম্পাদকেরও দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিলে তবে কাগজ চালানো সম্ভব হবে। আমরা নূতন লেখকদের কাছে থেকে অর্থসাহায্য আশা করি। এখন লেখা ছাপবার রেট এই রকম। প্রবন্ধ ২০.০০ টাকা, গল্প ২৫.০০ টাকা, কবিতা ১০.০০ টাকা। টাকা ও লেখা একসঙ্গে পাঠাতে হবে।

এইসব চিঠি ডাকে দেবার ৮।১০ দিনের মধ্যে ১০টি কবিতা এবং ১০০টি টাকা এসে পৌঁছালো। গল্প-প্রবন্ধ আদৌ আসতো না। তবে প্রত্যেক মাসে অন্ততঃ ৮।১০টি কবিতা আসতে লাগলো। সুধাকান্তদা নিশ্চিন্ত মনে মাছের তেলে মাছ ভাজতে লাগলেন। নূতন লেখকদের টাকায় নূতন পত্রিকা গড়গড়িয়ে চললো। কিছু মুনাফাও বোধ হয় থাকতো। পত্রিকাখানা বোধ হয় ৩।৫ বছর চলেছিল। পাদ্রীসাহেবের কাছে চাকরিও ৩।৪ বছরের মতো।

প্রেসটা বড় হয়ে উঠলে ভাল কাজ জানা ম্যানেজারের প্রয়োজন অনুভূত হলো। তখন কান্তিক প্রেসের ম্যানেজার কালীপদ দালালকে আনিয়ে নেওয়া হলো। সুধাকান্তদার এ চাকরি আর রইলো না বটে, তবে শাপে বর হয়ে উঠলো। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে তাঁর ব্যক্তিগত staff-এ ভর্তি করে নিলেন। সুধাদাকে বুঝালেন, "দেখ্, আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি ; এখন এমন একজন লোকের আমার প্রয়োজন যার উপরে নির্ভর করতে পারি। রেলগাড়িতে যাতায়াত এখন আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। লোকে বুঝতে চায় না যে, আমার আর আগের শক্তি নেই। নানা জায়গা থেকে নানা উপলক্ষে ডাক আসে। অনেক-গুলোতেই অসামর্থ্য জানিয়ে দিই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কতগুলোকে আর বাদ দেওয়া যায় না। যেতেই হয়। তুই সঙ্গে থাকলে আমি ভরসা পাই। তুই জানিস যে আমার খাওয়াদাওয়ার রকমটা কী। বাইরের লোকে তা জানবেই বা কা করে। তারা নানারকম রাজভোগ জোটায়। কিন্তু এখন কী আমার আর রাজভোগ খাওয়ার বয়স আছে ? অনেকদিন থেকে একজন নির্ভরযোগ্য পরিচরের সন্ধান করছিলাম। হাতের কাছে যে তুই ছিলি তা চোখে পড়েনি। তুই চলে আয়। আর ভাবিস না।"

সুধাকান্তদা শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ সেই ২২শে শ্রাবণ পর্যন্ত রবীন্দ্র-নাথের সহায়-সম্বল ছিলেন। অবশ্য তাঁর সঙ্গে নীলমণিও (তিনি ডাকতেন লীলমণি বলে) ছিল। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, নীলমণির একটি গুণ, কথা শুনে কোথায় হাসতে হবে সেটা জানে। সুধাদার সে গুণ তো ছিলই, তার উপরেও কিছু ছিল। তিনি সরস কথা বলে হাসাতে পারতেন। শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথের কাছে বহু লোক আসতো (তাদের অধিকাংশই অঙ্কস্তাবক বা সুযোগসন্ধানী), তারা

হাসতেও জানে না বা হাসাতেও ভরসা পায় না। তিনি এমন একটি ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন, যাঁর সঙ্গে থেকে কাজ করা পরম দুর্ঘট ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এতক্ষণ সুধাকান্তদার চরিত্রের লঘু দিকের বিবরণ দিয়েছি। কিন্তু এইখানেই যদি শেষ করি তবে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। নাচবার সময় পা দুটো চঞ্চল হয় বটে, তবে পায়ের নীচের মাটিটা থাকে স্থাণু ও স্থির। পা দুটোও চঞ্চল হলো, আবার মাটিটাও চঞ্চল হলো, তখন নাচ সম্ভব হতে পারে, তবে সে নাচকে বলে তুর্কী নাচ। সেটা অবশ্যই কাম্য নয়। এতক্ষণ দেখেছি সুধাকান্তদার চরিত্রের চঞ্চল চপল ও লঘু দিকগুলো। কিন্তু যে মাটিতে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, সেটা ছিল স্থাবর ও স্থির। সেইজন্যেই নাচটা জমেছিল ভালো। রবীন্দ্রনাথের প্রতি অচলা ভক্তি আর শান্তিনিকেতনের প্রতি অচলা আসক্তি এই দুটোকেই তাঁর পায়ের নীচেকার স্থির ও স্থাবর জমি বলছি।

এ যদি না হতো, তবে সুদীর্ঘকাল (তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত) শান্তিনিকেতনে থাকা তাঁব পক্ষে সম্ভব হতো না। আর রবীন্দ্রনাথের প্রতি অচলা ভক্তি ছিল বলেই তাঁর মতো—কী বলবো, খেয়ালী বলা যাক্—মানুষ দীর্ঘকাল তাঁকে সেবা করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই সব লোককেই ভালবাসতেন যারা সময়মতো হাসতে পারে ও সময় হলে হাসাতে পারে। শান্তিনিকেতনের দীর্ঘকালের ইতিহাস আলোচনা করে দেখেছি, যাঁরা তাঁর প্রীতিরসের স্থান পেয়েছিলেন, তাঁদের সকলেরই এ দুটো গুণ ছিল। এমন কি লীলমণিরও (নীলমণি) এ গুণ ছিল, তিনি নিজেই বলেছেন। তাঁর পূর্ববর্তী সেবক সাধুচরণের বোধ করি এই গুণের কিছু ন্যূনতা ছিল, বলতেন—ওর যা কিছু সাধুত্ব তা ওর নামের মধ্যেই সীমায়িত। অবশ্য সুধাকান্তদাকে নীলমণির পর্যায়ে ফেলছি না। তিনি এ বিষয়ে ক্ষিতিমোহনবাবুর পর্যায়ভুক্ত ছিলেন। আপাতত এখানেই তাঁর কথা শেষ করা যাক। আপাতত বললাম এই জন্যে যে, তাঁকে বাদ দিয়ে শান্তিনিকেতনের বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়।

॥ ৫ ॥

অ্যাডভেঞ্চার

ক্রমে আমাদের Matriculation পরীক্ষার সময় আসন্ন হলো। তখনকার দিনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই মেঠো বিদ্যালয়কে নিতান্তই অবহেলার চোখে দেখতো। এখানে ছেলেরা যে বিশেষ পড়াশোনা করে তাঁরা স্বীকার করতেন না। তবে পরীক্ষা দিতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরূপেই আমাদের আসরে নামতে হতো। তাতেও আবার কত ঝামেলা। প্রথমে দরখাস্ত করতে হতো প্রেসিডেন্সী বিভাগের Inspector of Schools-কে। তাঁর অনুমতি মিললে প্রথম দফা পরীক্ষায় বসতে পারা যেত। তাঁর অফিস ছিল চুঁচড়ো শহরে। এই গেল প্রাথমিক পর্ব। তারপরে এক-সময়ে চূড়ান্ত পরীক্ষার যোগ্য বলে আমাদের নামে সরকারী চিঠি আসতো। প্রাথমিক ও চূড়ান্ত পরীক্ষার মধ্যে মাস দুই-তিনের ব্যবধান ছিল। সেটা আবার হতো সিউড়ি শহরে কোনো একটা সরকারী বিদ্যালয়ে।

এ তো গেল সাধারণ অভিজ্ঞতা। কিন্তু তার মধ্যে কিছু বিশেষ ছিল। প্রাথমিক পরীক্ষায় পাস হয়েছি জানবার পরে Andrews সাহেব আমাদের পরামর্শ দিলেন যে, এখন আর বেশী পড়াশোনা করবার দরকার নেই, মাথাটা বেশ হাল্কা রাখবে। এরকম পরামর্শ আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক ছিল। পড়াশোনা কখনই বড়ো করতাম না। মাথা হাল্কা রাখার দিকে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টার অভাব ছিল না।

এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়লো। আমাদের ভজু নামে এক সহপাঠী ছিল। সে পরামর্শ দিল, এখন বইগুলোর আর কি প্রয়োজন, হঠাৎ মনের ভুলে যদি কখনো বই খুলে বসি, তবে গুরুর উপদেশ অমান্য করা হবে। তখন আবার কয়েকজন সহপাঠী মিলে পাঠ্য বইগুলোকে একটা বাক্সের ভিতরে পুরে চাবি দিয়ে বন্ধ করলাম। তবু ঐ বাক্সটা চক্ষুশূল হয়ে ঘরের মধ্যে বিরাজ করতে লাগলো। ওটাকে নিয়ে কি করা যায়—পরামর্শ-সভা বসলো আমাদের মধ্যে।

এরকম কাজে সহযোগীর অভাব প্রায়ই হয় না। একজন প্রস্তাব করলো, পাস করবার পথে বিঘ্নস্বরূপ ঐ বাক্সটা ইঁদারার মধ্যে ফেলে দেওয়া যাক্। সে নিজের প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি দেখালো এই ক'মাসে বইগুলো বেশ ঠাণ্ডা হয়ে থাকবে। কাজেই আমাদের মাথা গরম হবার কোনো আশঙ্কা নেই।

দু-একজন আপত্তি তুললো, কিন্তু ভজু সৎকর্মে অত্যন্ত তৎপর। সে বাক্সটা তুলে নিয়ে গিয়ে সবলে নিক্ষেপ করলো গভীর ইদারাটার মধ্যে। ইদারার মধ্যে বইগুলো এবং আমাদের মাথার মধ্যে মগজগুলো ক্রমে শীতল থেকে শীতলতর হতে লাগলো। কিন্তু সবাই এই প্রস্তাবের পক্ষে ছিল না। কয়েকজন বেশ গুরুতর আপত্তি তুলেছিল। কিন্তু সত্যের খাতিরে বলতে বাধ্য হচ্ছি, ফেল করতে তারাই করল ফেল। সাহেব রেজাল্ট দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, ওদের দোষ নেই। ওরা বড় বেশী পড়াশোনা করেছিল। এই গেল প্রাথমিক পর্বের ইতিহাস।

প্রাথমিক পরীক্ষা আমাদের দিতে হবে চুঁচড়ো শহরে, চুঁচড়ো হুগলি পাশাপাশি শহর। হুগলিতে আমাদের জন্য একটি বাসা স্থির হল। বাড়িটির মালিক আশ্রমেরই একজন ছাত্র। সে জানালো যে চাবি তার কাছে নেই, তাদের গ্রামের বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে হবে। তাদের নিবাস মাকালপুর নামে একটি গ্রামে। অতএব সেখানে যেতে হয়। প্রশ্ন উঠলো, যাবে কে? স্থির হল, বিজয় বাসু ও আমি যাবো।

এই বিজয় বাসু ছেলেটি আমারই বয়স্ক ও পরীক্ষার্থী। তার সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে গেলে আলাদা একটি পরিচ্ছেদ লিখতে হয়। এখানে অল্প একটু বললেই চলবে। বিজয় বাসু কেরলের লোক। মাছমাংস ছোঁয় না। একদিন আশ্রমিক সম্মেলনীর এক অধিবেশনে সে অভিযোগ করতে উঠলো, যে আশ্রমে একটি মুরগী-শাবক—। বাক্য আর সম্পূর্ণ হল না, সে কেঁদেই ফেললো। তারপর অনেক প্রশ্নাদি করে জানা গেল যে, একটি মুরগী-শাবক হত্যা করা হয়েছিল। এখানেই তার জীবে দয়ার পরিণাম নয়, সূত্রপাত মাত্র। স্থানমাহাত্ম্যে এমন হল যে, মুরগী-শাবক তো দূরের কথা—এখানে সেখানে গাঁয়ে এবং গাছের উপরে যত রকম পক্ষী এতদিন নির্বিঘ্নে বাস করছিল, তারা বিজয় বাসুর তীরধনুকের লক্ষ্য হয়ে উঠলো। শুধু তাই নয়, তার কিছু বৈজ্ঞানিক আগ্রহ ছিল। আশ্রমের ছোট একটা ল্যাবরেটরি

ছিল, শেয়াল মারবার জন্য সে বিষ প্রস্তুত করতে শুরু করলো। তার সহায়ক বা অ্যাসিস্টেন্ট করে নিল আমাকে। একদিন যথাবিহিত উপায়ে শিবাঘ্ন বিষ প্রস্তুত হলে আমার দিকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে বললো—দেখ তো, শেয়াল মরবে কিনা? তার ধ্রুব বিশ্বাস, শেয়াল মারা বিষে মানুষের মরাটা আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্য রকম। ফলে তারপর থেকে তার সঙ্গ এড়িয়ে চলতাম।

এই বিজয় বাসু মাকালপুর যাত্রায় আমার সঙ্গী হল। এত বিশাল ভূখণ্ডে কোথায় মাকালপুরের অবস্থিতি আর কোন্ পথেই বা সেদিকে যেতে হয় কিছুই জানি না। কিন্তু না গেলেও নয়, কারণ অন্য পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল যে চাবি সংগ্রহ করতে পারলে আমরা যাতায়াতের ভাড়া পাবো। অতএব দুই আশ্রমমৃগ খালিপায়ে আর প্রায় খালিগায়ে রেলগাড়িতে চাপলাম। বাড়ির মালিক ছাত্রটি বলে দিয়েছিল যে মগরা স্টেশনে নেমে অন্য রেলপথের গাড়ি ধরতে হবে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে যথাসময়ে আমরা দুজনে নামলাম। দেখলাম মিটারগেজের ছোট গাড়ি অপেক্ষা করছে। আমরা দুজনে মাকালপুরের টিকিট চাইলাম। স্টেশনমাস্টার বললো, এ লাইনে মাকালপুর বলে কোনও স্টেশন নেই। তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আর আমাদের খালি-পা ও প্রায় খালি-গা লক্ষ্য করে স্টেশনমাস্টার কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, আপনারা আসছেন কোত্থেকে? শান্তিনিকেতন থেকে আসছি শুনে মনে হল বিস্ময় খানিকটা দূর হয়েছে, কারণ ইতিপূর্বে তারা শুনেছিল, শান্তিনিকেতনে সবই সম্ভব। সেইটি একটি আশ্রম। কাজেই এরা দুটি আশ্রম-মৃগ। দয়াপরবশ হয়ে তখন একটি বেঞ্চিতে আমাদের বসতে বললো। তারপর পথের যে বিবরণ দিল, তাতে আশ্রম-মৃগ ছাড়া সকলেই ভীত হয়। স্টেশনমাস্টার বললো, এই তো শীতের সন্ধ্যা, আপনাদের খালি-পা, আর দেখছি গায়েও কিছু গরম কাপড় নেই—যাবেন কি করে?

আমরা সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিলাম, আমরা তো আশ্রমে এইভাবেই চলাফেরা করি।

—আরে মশাই, এ আপনাদের আশ্রম নয়, এ হুগলি জেলার গ্রামাঞ্চল, তায় শীতের সন্ধ্যা। আর পথঘাটের বিবরণ তো কিছুই

জানেন না। জানলে এ কাজে কখনো প্রবৃত্ত হতেন না।

—কিন্তু চাবি যে আমাদের নিয়ে যেতেই হবে।

—তা তো বুঝলাম, মাকালপুর পর্যন্ত পৌঁছলে তবে তো চাবি পাবেন।

—কেন, সেখানে কি রেলস্টেশন নেই?

—আছে বটে, তার নাম মাকালপুর নয়,—"রুদ্রাণী"। স্টেশন থেকে অনেকটা দূর সেই গ্রাম।

—কোন পথ নেই নাকি?

—মশায়, পথ নেই, আছে পাটের ক্ষেত, তারই মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। দেখুন যদি ভাগ্য ভাল হয়, তবে রাত ১০টা/১১টা নাগাদ পৌঁছতেও পারেন। এই বলে তিনি দু'খানি রুদ্রাণী স্টেশনের টিকিট দিলেন।

আমরা তো গাড়িতে উঠলাম। কিন্তু এ কি গাড়ি, এ কি তার চাল? চাল সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে।—পথের মাঝে এক জায়গায় হাট বসেছিল, গার্ডসাহেব চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে দুটি ইলিশ মাছ কিনে আবার ছুটে এসে গাড়িতে উঠলেন। আশ্রম-মৃগরা এরকম ব্যাপার কখনো দেখেনি। ভাবলো আশ্রমের বাইরেও মস্ত একটা জগৎ আছে, যার চালচলন আলাদা। রুদ্রাণী স্টেশনে নামলো যে গার্ডসাহেব, তখনো ইলিশ মাছ দুটি তার হাতে দোদুল্যমান, জিজ্ঞাসা করলো, যাবেন কোথায়?

বললাম—মাকালপুর।

—এই শীতের রাতে ঘোর অন্ধকার পাটক্ষেতের মধ্য দিয়ে মাকালপুর যেতে গিয়ে অনেক যাত্রী মাকালপুর ছাড়িয়ে আরো অনেক দূর চলে গিয়েছে, যার টিকিট কোথাও বিক্রী হয় না।

আমরা কথাটার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে তাঁকে আমাদের চুক্তির ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম। তিনি তখন প্রমাণ-সাইজের নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, নিতান্তই যদি যাবেন তবে—, একগোছা পাটকাঠি লণ্ঠন থেকে জ্বালিয়ে দিয়ে আমাদের হাতে দিয়ে বললেন, এই আলোয় সোজা ঐদিকে চলে যান—, বলে স্তূপীভূত অন্ধকারের মধ্যে একটা অনির্দিষ্ট দিক দেখিয়ে দিলেন।

আমরা সেই দাহ্যমান পাটকাঠির ভরসায় রওনা হলাম।

পাটকাঠিগুলো স্বভাবের নিয়মে অল্পক্ষণের মধ্যেই জ্বলে নিভে গেল। তখন সেই চতুর্দিকব্যাপী নিরেট অন্ধকারের মধ্যে দুজনে চলতে শুরু করলাম। চারদিকে পাটগাছ এবং নীরন্ধ্র অন্ধকার। থেকে থেকে শেয়ালের ডাক।

বিজয় জিজ্ঞেস করল, ওগুলো কি ডাকছে!

বললাম, শেয়াল।

—আমাদের দেশে শেয়াল তো ঐভাবে ডাকে না।

সেই সুদূর প্রদেশে শেয়ালের ডাক আলোচনা করার মত অবস্থা ছিল না। কারণ ইতিমধ্যে আমার কানে দু'একবার ফেউ-এর ডাক প্রবেশ করেছিল।

—ওটা কি ডাকে?

বললাম, ফেউ।

—তাই বলো, আমাদের দেশে ওকে ফেরু বলে।

বুঝলাম কেরল রাজ্যে সংস্কৃত ভাষা এখনও সজীব। এমন সময় বিজয় জিজ্ঞাসা করলো, ওরা ডাকে কেন?

—কেন ডাকে একমাত্র ওরাই বলতে পারে। তবে লোকে বলে, ওরা বাঘের গন্ধ পায়।

বিজয় শুধু বললো, ব্যাঘ্র!

আমি বললাম, তাড়াতাড়ি চলো।

চলতে চলতে পাটের ক্ষেতের মধ্যে খানিকটা খালি জায়গা পাওয়া গেল। বিজয় সানন্দে বলে উঠলো, এই তো পথের ঠিকানা—।

আমি বললাম, পথই বটে, তবে অনেক দূরের পথ। জায়গাটা শ্মশান। ভাঙা হাঁড়িকলসী দেখে সংশয়ের অবকাশ ছিল না। তখন চলছি তো চলছি। এমন সময় দূরে একটা স্টেশনের আলো যেন চোখে পড়লো। আরো খানিকটা চলে এসে স্টেশনের কাছে গিয়ে বড় বড় কালো অক্ষরে লিখিত দেখলাম—"বেলমুড়ি"। স্টেশন ঘরের মধ্যে জন-দুই বাবু লণ্ঠনের আলোয় বিড়ি ধরাবার চেষ্টা করছে। জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি বেলমুড়ি স্টেশন? এমন সময় বাবুটির বিড়িটা নিভে গেল।

সে বলে উঠলো, দিলেন তো বিড়িটা নিভিয়ে!

—আমরা নেভালাম কই?

—ঐ তো স্টেশনের নামটা উচ্চারণ করলেন। ঐ তো দিব্যি লেখা আছে বেলমুড়ি।

এবারে দ্বিতীয় ভদ্রলোকের বিড়িও নিভে গেল।—হলো তো? বলি আসছেন কোত্থেকে?

বললাম, আমরা এখানকার লোক নই।

—সে তো বুঝতেই পারছি। এখানকার লোক হলে ও নামটা উচ্চারণ করতো না।

—তবে টিকিট চায় কি বলে?

—বলে 'শ্রীফল চালভাজা'।

তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করলো, আজ রাতটা না জানি কি রকম ভাবে যাবে!

তখন জিজ্ঞাসা করলো, আপনারা যাবেন কোথায়?

—বললাম মাকালপুর।

—বসুন, বসুন। মাকালপুরের বাবুদের বাড়িতে? ওরে রামদীন, একটা লণ্ঠন নিয়ে বাবু-দুটিকে মাকালপুরের বাবুদের বাড়িতে পৌঁছে দে। আমরা ধন্যবাদ-জ্ঞাপক দৃষ্টিতে বিদায় নিতে উদ্যত হলে তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, আসছেন কোত্থেকে? ও, রুদ্রাণী থেকে?

আমরা টিকিট বের করে দিলামও রুদ্রাণীর।

—আপনাদের গুরুবল আছে, নইলে এখানে পৌঁছতে পারতেন না।

বিজয় বাসু আবার একটি সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করলো, গুরুবল নয়, গুরুদেবের বল।

যাক্, এ ঘটনার জের টানা নিষ্প্রয়োজন। নির্বিঘ্নে আমরা চাবি সংগ্রহ করে, হুগলির বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। তার পরদিনে শান্তিনিকেতন থেকে অন্য পরীক্ষার্থীগণ এসে পৌঁছলো। আমরাও দায়মুক্ত হয়ে চুক্তি অনুযায়ী রেলভাড়া পেলাম।

সে বছর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজের জয় হয়েছে। পরে রাজার হুকুমে ভারত-ব্যাপী উৎসব চলছে। এবং তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সারা ভারতে ৬০ লক্ষ লোক ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যাধিতে মারা পড়েছে। তখন ইনফ্লুয়েঞ্জা নামটা চলেনি—বলতো ওয়ার-ফিভার। সৌভাগ্য-

বশতঃ ওয়ার-ফিভারে শান্তিনিকেতনে কারো মৃত্যু ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথের ধ্রুব বিশ্বাস ছিলো, পঞ্চতিক্ত পাঁচন খাওয়ানোর জন্য এ বিপদ থেকে বেঁচে গেছে। আমাদের অভিভাবক হিসাবে সঙ্গে এসেছিলেন অক্ষয়বাবু। তাঁর উপরে কড়া নির্দেশ ছিল, সকলকে নিয়মিত ঐ পাঁচনটা খাওয়াতে হবে। আর একটা নির্দেশ ছিল, ছাত্রদের নিয়ে বিকেলবেলা নৌকোয় বেড়াতে হবে। কারণ খোলা হাওয়াতে ঐ রোগটার বীজাণু তেমন সুবিধা করতে পারে না। এই বাধ্যতামূলক নৌভ্রমণ নিয়ে বিপদ ঘটেছিল। যখন আমরা সেদিনের মত নৌভ্রমণ সেরে বাড়ির দিকে ফিরছি, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে, আবার তার সঙ্গে শীতের হাওয়া বইতে শুরু করেছে, এমন সময় অক্ষয়বাবু বলে উঠলেন, এই সময় গঙ্গার মধ্যে কে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারে? প্রথমেই তাঁর চোখটা পড়লো বিজয় বাসুর দিকে। চোখের ভাষার অর্থ বুঝে সে বলে উঠলো, "না হম্"।

সংস্কৃত ভাষার তাগদ যতই হোক্ কারো বুঝতে বাকি রইলো না—আর যেই হোক, বিজয় বাসু জলে নামতে রাজী নয়। এমন সময় ঝুপ্ করে একটা শব্দ হল। সবাই জিজ্ঞাসা করলো, কে—কে পড়লো? অন্ধকারের মধ্যে থেকে শীতে কম্পমান কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "অহম্"। কারো বুঝতে বাকী রইল না, কণ্ঠের কম্পমানতা সত্ত্বেও, এ ভজুর কণ্ঠস্বর। তখন সকলে ব্যাকুল হয়ে, সব চেয়ে বেশী ব্যাকুল অক্ষয়বাবু, অনুরোধ-উপরোধের স্বরে বলতে লাগলেন, ভজু, ওঠো ওঠো। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে কোথায় বা ভজু! অবশেষে ভজুর সন্ধান মিললো, অর্থাৎ সে নিজেই সন্ধান দিল "এই যে আমি"। তখন অক্ষয়বাবু হাত বাড়িয়ে ভজুকে টেনে তুললেন। আর ঘরে নিয়ে এসে আদার রস দিয়ে চা-পান করালেন। এটিও রবীন্দ্রনাথের অব্যর্থ মুষ্টিযোগ, অন্ততঃ তাঁর এই বিশ্বাস। এই ভজুর সম্বন্ধে আরো অনেক কাহিনী আছে, যা শান্তিনিকেতনের অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত।

ভজুর বাঘ শিকারের গল্প অন্যত্র বলেছি, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এবারে একটি অহিংস প্রতিরোধের কাহিনী বলবো। দীনুবাবুর সযত্ন-লালিত, দুধে-ভাতে মানুষ একটি কুকুর ছিল। গা-ভরা কোমল লোম। সকাল-সন্ধ্যায় তা সযত্নে চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে দেওয়া হয়।

সবসুদ্ধ মিলে একটি কোমল মোলায়েম বস্তু। দিনুবাবু তখন থাকতেন দেহলী বাড়িটাতে। আমরা, এই আমরার মধ্যে ভজুও ছিল, থাকতাম বীথিকা গৃহে। এই দুই বাড়ির ব্যবধান বড় জোর এক রশি হবে। আমাদের ঘরে এসে জুটেছিল একটা বেগানা কুকুর। যত্রতত্র পড়ে থাকতো, যা জুটতো খেতো, কোনও হাঙ্গামা করতো না, কিন্তু একদিন কি করে "মিলন হল দোঁহে কি ছিল বিধাতার মনে"। হঠাৎ একদিন দিনুবাবুর সযত্ন-লালিত কুকুরে আর আমাদের অযত্ন-পোষিত কুকুরে দেখা হয়ে গেল। ব্যাস্, অমনি দুজনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ। কুকুর-জাতি মনুষ্য জাতির সাহচর্যের ফলে মানুষের স্বভাব পেয়েছে। কেউ কাউকে বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারে না। অনিবার্য পরিণাম অবিলম্বে ঘটলো। দিনুবাবুর কুকুর তারস্বরে প্রভুর মনোযোগ আকর্ষণ করতে করতে বাড়ির দিকে ছুটলো। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল, দিনুবাবু বন্দুক হাতে করে আমাদের ঘরের দিকে আসছেন। তাঁর যে বন্দুক আছে কে জানতো?

এ পর্যন্ত ভজুর আমাদের কুকুরের প্রতি মায়ামমতার চিহ্ন দেখা যায়নি। কিন্তু এখন আর্ত আক্রান্ত অসহায় জীবটিকে রক্ষা করবার জন্য ভজু উদ্যত হয়ে উঠলো। আমার দিকে তাকিয়ে বললো, এসো, আমাদের কুকুরটাব প্রতি অত্যাচার হচ্ছে, হয়তো বা মারা-ই পড়বে।

আমি কুকুর বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত জীব সম্বন্ধে চিরকাল উদাসীন। কিন্তু এখন ভজুর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারলাম না। ভজু আমার দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি নিশ্চয় কুকুর ভালবাস?

বললাম, ভালবাসি কিন্তু কিঞ্চিৎ দূর থেকে। আর তাছাড়া ঐ রোডেসিয়ান কুকুরটার জন্য আমি অসম-যুদ্ধে নামতে রাজী নই, বলে স-বন্দুক দিনবাবুকে দেখিয়ে দিলাম।

তখন ভজু কুকুরটার গলায় দড়ি বেঁধে জানালার শিকের সঙ্গে বাঁধলো এবং নিজে একদিকে দাঁড়ালো। বলল, তুমি ঐদিকটায় দাঁড়াও। তার বিশ্বাস আমরা দুপাশে দুজনে দাঁড়ালে দিনুবাবু বন্দুক চালাতে পারবেন না।

তিনি সগর্জনে বললেন, ভজু সরে দাঁড়াও। আর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোর তো এসব বাতিক কোনোদিন ছিল না। তুই

পালা। পাছে পালাই, ভজু আমার হাত সজোরে চেপে ধরলো।

ইতিমধ্যে মূল বাদী অন্তর্হিত হয়েছে। আর আসামী ভজুর গা ঘেঁষে দণ্ডায়মান। হঠাৎ দিনবাবুর চট্‌কা ভেঙে গেল। সমস্ত ব্যাপারটার হাস্যকরতা উপলব্ধি করে তিনি হেসে উঠলেন, বললেন, এখন থেকে কুকুটাকে ভাল করে খাওয়াস্, ওর গায়ে তো কিছু নেই।

এই বলে বন্দুক বগলদাবা করে ফিরে চলে গেলেন। তখন কুকুরটাকে নিরাপদ দেখে ভজু তার গলার দড়ি খুলে দিল। এবং তারপরেই যে কাণ্ডটি ঘটলো তা সম্পূর্ণ মনুষ্যোচিত। সে ভজুর পায়ে ঋণ শোধাত্মক এক কামড় দিয়ে ছুটে পালালো। ভজু আমার দিকে তাকিয়ে বললো, দেখলে কাণ্ডখানা?

বললাম, ঐ জন্যই ভাই আমি কুকুরগুলো থেকে দূরে থাকি। ওদের একেবারেই কৃতজ্ঞতা-বোধ নেই।

এখানেই ভজুর প্রসঙ্গ শেষ নয়। লিখতে গেলে একখানা আস্ত পুরাণ লিখতে হয়।

ইতিমধ্যে আমরা প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সিউড়ি শহরে এসে বাসা নিয়েছি। এবারে সঙ্গে আর অক্ষয়বাবু নেই। যেহেতু গঙ্গানদীর অভাব, ভজুর ঝাঁপ দেবার কোনও আশঙ্কা নেই।

তখনকার কালে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে বীরভূমের গ্রামাঞ্চলের যোগাযোগ ছিল না। তারা সবাই আমাদের অদ্ভুত কিছু ভাবতো। কাজেই কাছে কেউ বড় ঘেঁষতো না। আমরা যে বাসাটায় ছিলাম, সেটা ছিল জেলখানার কাছেই। নৈকট্যের যুক্তিতে জেলার মশায় মাঝে মাঝে এসে আমাদের সঙ্গে গল্প জমাতেন। লোকটির বয়স অল্প। বোধ হয় সদ্য নিযুক্ত হয়েছেন। ছাত্রদের মধ্যে যখন রেষারেষি হ'তো, কার দেশের কি বৈশিষ্ট্য, তিনি মন দিয়ে শুনতেন। একবার একজন বলে ফেললো, তাদের দেশের জেলখানা সব থেকে বড়। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, জেল বড় হওয়া দেশের পক্ষে গৌরবের নয়। আমার মন্তব্য শুনে জেলার হো-হো শব্দে হেসে উঠে বললেন, ঠিকই বলেছেন। আমার কথাটা তাঁর মনে এমনি বসে গিয়েছিল যে, দীর্ঘকাল পরে যখন নৈহাটি স্টেশনে আচমকা তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তিনি বলে উঠলেন, দেশে জেলখানা বড় হওয়া

গৌরবের বিষয় নয়। আমি সবিনয়ে বলে উঠলাম, আপনার মনে আছে দেখছি। তিনি উত্তর দিলেন, না থেকে পারে? আমি এখন আলিপুর জেলের জেলার। বললাম, আপনার দেখছি খুব উন্নতি হয়েছে। তিনি একটু দম ধরে থেকে বললেন, উন্নতি? হয়তো তাই। কিন্তু অনেক লোকে ঠিক অন্যরূপ মনে করে।

যথাসময়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বেরুলো। আমরা সকলেই পাস করেছি। আপাতত আমাদের adventure-এর এখানেই শেষ হতে পারতো। কিন্তু অদৃষ্টের মুঠোতে তখনো কিছু বাকি ছিল। শান্তিনিকেতনের কাছেই কোপাই নদী। নদীটি ছোট। কিন্তু বর্ষাকালে হঠাৎ বৃষ্টি নামলে স্ফীতকায় ও স্ফীতবেগ হয়ে প্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করে। এইরকম এক বর্ষার সময় গোয়ালাপাড়ার কাছে কোপাই নদীর তারে আমরা বনভোজন করতে গিয়েছিলাম। এই বনভোজন আমার পক্ষে শেষ ভোজন হতে পারতো। কিন্তু বাঙালী পাঠকের আরো দুর্ভোগ থাকায় সংকটটি কানের কাছ দিয়ে ফস্‌কে গেল। নইলে এ কাহিনী আর লেখা হতো না।

আমরা যে কয়েকজন শান্তিনিকেতনিক বনভোজনে গিয়েছিলাম তাদের সকলেরই বয়স একটা সীমারেখার কিছু এদিক-ওদিকে। বয়সে বড় হলে দাদা বলাই ওখানে রীতি ছিল। কিন্তু কত বড় হলে দাদা বলা উচিত তার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। যেমন গোসাঁইজী আমার চেয়ে দশ বছরের বড় ছিলেন, তবু আমাকে দাদা বলতেন। এই গোসাঁইজীর কথা পরে বিস্তারিত বলতে হবে। আনন্দমঠে যেমন সকলেই আনন্দ, শান্তিনিকেতনে তেমনি একটি অলিখিত নিয়ম ছিল। সকলেই পরস্পরের দাদা। এমন কি অনেকে দিনুবাবুকে 'দিনদা' বলতো, 'রথী'বাবুকে বলতো রথীদা। তবে এসব ব্যক্তি নিতান্ত ব্যতিক্রম, সাধারণে অত বাছবিচার না করে 'দাদা' নামে অভিহিত হতো।

একদল রান্নার যোগাড় করতে আরম্ভ করলো, বাকিরা এদিক-ওদিক করে ঘুরতে শুরু করলো, কেউ কেউ বা নদীতে নামলো স্নানের জন্য; আমিও নামলাম; কিন্তু আগে কখনো নদীর এ মূর্তি দেখিনি—কী প্রবল বেগ আর প্রচণ্ড গর্জন, আমি অবশ্যই সাঁতার জানতাম। কিন্তু এহেন নদীতে যে স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার দেওয়া চলে না, জানতাম

না সে কথাটি। প্রতিকূলে সাঁতার দিতে গিয়ে ক্রমেই কূল থেকে দূরে গিয়ে পড়তে লাগলাম। প্রথমটা কেউ আমার অবস্থা লক্ষ্য করেনি। কিন্তু যখন স্রোতের গর্জন ছাপিয়ে উঠলো আমার কণ্ঠস্বর, তখন সকলে তটস্থ হয়ে উঠলো। এবং নানাজনে পরস্পরবিরোধী উপদেশ দিতে শুরু করলো। আমি কেন জানি না, হিন্দী ভাষা ব্যবহার করলাম। বললাম, "ডোঙ্গা লাও"। ওই হিন্দী ব্যবহারটাই আমার কাল হলো বেশ কানে এলো ওরা বলছে, না না, এমন কিছু বিপদ ঘটেনি। বিপদকালে লোকে মাতৃভাষা বলে, ও তো বলছে হিন্দীভাষা। আমি ক্রমেই স্রোতের মুখে ভেসে চললাম সেইদিকে যেখানে নদীটা বিস্তৃততর হয়েছে, আর কানে প্রবেশ করলো সেই মারাত্মক গর্জন যা কখনো কখনো শুনেছি নিরাপদে তীরে দাঁড়িয়ে।

তখনো আমার মনে এ কথা প্রবেশ করেনি যে ডুবে মরতে পারি বা যে রকম অসহায়ভাবে ভেসে চলেছি তার পরিণাম মৃত্যু। বরঞ্চ নির্মল আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হল যেন চলন্ত একটা গাড়ির উপরে শুয়ে রয়েছি। আকাশের ঐ উঁচুতে গোটাকতক বক। দুপাশে শণ ক্ষেতে স্রোতের বেগে গাছগুলোর তালে তালে কাঁপা মাছিগুলোর কম্পমান ফুলের উপরে বসবার ব্যর্থ চেষ্টা। এ সমস্ত দেখছি এবং মন্দ লাগছে না, এমন সময়ে সব কিছু ছাপিয়ে একটা মহাগর্জন কানে এসে ঢুকলো। চমকে ভাবলাম এ আবার কি, তখনি মনে হলো, তাও তো বটে।—নদীর উপরে যে রেলের পুল আছে সেটা অনেকবার দেখেছি, তার উপর দিয়ে পারাপার করেছি, নীচে তাকিয়ে দেখেছি পুলের থামগুলো সুরক্ষার জন্য পাহাড়-প্রমাণ পাথর ঢালা। উপর দিয়ে চলবার সময় মনে হয় স্রোতের বেগে পুলটা যেন কাঁপছে। আর সে কি জলের তোড়! তরঙ্গগুলো হাতুড়ির মতো এসে আঘাত করছে থামের গায়ে। উপর দিয়ে চলবার সময় মনে হয়, এই জলের অরাজকতার মধ্যে পড়লে কারো কি বাঁচবার সম্ভাবনা আছে! কখনো মনে হয়নি যে অবস্থা-গতিকে এর মধ্যে আমাকেও পড়তে হতে পারে। আজ বুঝি সেই অবস্থাগতিক। তবে তো আর বাঁচবার সম্ভাবনা নেই। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ পাথরগুলোর উপর গিয়ে পড়বো আর ঢেউয়ের প্রকাণ্ড হাতুড়িগুলো একটার পর একটা এসে মাথায় আঘাত করবে। এর মধ্যে বাঁচবার আশা করাই অন্যায়।

এতক্ষণ যে ভীষণ অবস্থার মধ্যে দিয়ে ভেসে আসছিলাম, এবারে তা তুচ্ছ মনে হলো। মহাসংকট,—হয়তো বা মৃত্যুই ঐ অদূরে। আমার অবস্থা অনেকটা হরবল্লভের মতো হলো। 'ডুবিয়াই গিয়াছি, আর দুর্গানাম করিয়া কী হইবে?' খণ্ড ছিন্ন নানা চিন্তার টুকরো, মনের মধ্যে দিয়ে ভেসে যেতে লাগলো। তবে একটা কথা বুঝলাম, এরকম সংকটের সময় ঠাকুর-দেবতার কথা কারো মনে পড়তে পারে না। বরঞ্চ হিসাবের খাতা বা ঐ রকম কিছু মনে পড়লেও পড়তে পারে। বুঝলাম আর বাঁচবার সম্ভাবনা নেই। নদী এখানে বিস্তৃততর, সঙ্গী বন্ধুরা কোথায় পিছিয়ে পড়েছে। আর সম্মুখেই মৃত্যুর পরোয়ানাবাহী ঐ ভয়াবহ জলতরঙ্গ। ইচ্ছে করে নয়, আপনিই চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এলো। ভাবলাম মৃত্যুকে মুখোমুখি দেখবার চেয়ে এই না দেখে গ্রহণ করলে হয়তো সঙ্কট কিছু কম হতে পারে। কিন্তু সঙ্কটের কম আর বেশী কি! যদি তার পরিণাম নিশ্চিত মৃত্যু হয়!

কিন্তু এ কী, এতক্ষণ তো ঐ রাশীকৃত পাথরগুলোর উপরে গিয়ে পড়বার কথা, এতক্ষণ তো জলের হাতুড়ির আঘাতে মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবার কথা! কিন্তু এ কোথা থেকে কী হলো! বেশ অনুভব করলাম, আমি আর ততো দ্রুতবেগে ভেসে চলছি না। চলার বেগ অনেক মন্দ হয়ে এসেছে। জলের আওয়াজ তেমনি প্রবল। কিন্তু স্রোতের টানে সে প্রখরতা নেই। এ কা হলো?

তখন হঠাৎ মনে হলো, হয়তো এবারের মতো বেঁচেই গেলাম। তখন মনে পড়লো, আগে পুল পার হবার সময় দু-একবার লক্ষ্য করেছি, পুলের গোড়াতে একটা উল্টোমুখী আওড় আছে। তবে কি ভাগ্যগুণে তেমনি একটি আওড়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছি? তখনো বিশ্বাস হচ্ছিল না এতখানি সৌভাগ্য শেষ মুহূর্তে ঘটবে। কিন্তু না, মাঝে মাঝে সৌভাগ্য এমন অযাচিতভাবে হাত বাড়িয়ে রক্ষা করে। বুঝলাম যে আমি এখন উল্টোমুখে ধীরবেগে ভেসে চলেছি। তখনি মনে হলো, আবার না ঐ তীব্র স্রোতের মধ্যে গিয়ে পড়ি। না, বেঁচেই গেলাম। ঐ তো সঙ্গীরা তীর-বরাবর ছুটে আসছে। খান-দুই ডোঙ্গা নৌকো নিয়ে আসছে। একজন বুদ্ধি করে লম্বা একখানা লগি আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। বার-দুই চেষ্টা করবার পরে সেটা ধরতে সক্ষম হলাম।

সঙ্গীরা চেঁচিয়ে বললো, শক্ত করে চেপে ধরে থাকো। আমরা টেনে ডোঙ্গার উপরে তুলছি।

বাঁশের লগিখানা চেপে ধরলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই। একেবারে তীরে নিয়ে এসে যখন আমাকে ঘাসের উপরে শুইয়ে দিয়েছে তখন চৈতন্যলাভ করলাম। বন্ধুদের একজন বললো, আর একটু হলে মরতে যে! আর একজন বললো, মরতে হিন্দী বলতে গিয়েছিলে কেন? তাতেই তো বুঝলাম তোমার সংকট গুরুতর নয়। তখন তৃতীয় আর একজন বললো, এখন ওসব কথা থাক্, ওকে এক গেলাস চা এনে দাও।

বিপদ না কেটে গেলে তার গুরুত্ব বুঝতে পারা যায় না। ঐ প্রবল জল-স্রোতের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম যে, কা সঙ্কটের মধ্যে গিয়েই না পড়েছিলাম।

তখন চা-পান শেষ করে একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়লাম। পিক্‌নিক্ মাথায় উঠলো। আমি একখানা গরুরগাড়িতে শায়িত অবস্থায় ফিরলাম আশ্রমে।

॥ ৬ ॥

সর্পাঘাত

পুরানো সেই দিনের কথা নামে যা লিখছি তাকে শান্তিনিকেতনের ইতিহাস বলা উচিত হবে না। কারণ ইতিহাস লিখবার ধাত আমার নয়। আর শান্তিনিকেতনের ইতিহাস লিখবার সময় এখনো আসেনি। সে কাজ করতে পারতেন রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায়। তাঁর ধাত ও হাত দু-ই ইতিহাসের। অন্য নামের অভাবে এই রচনাকে অবশ্য পুরাণ বলা যেতে পারে। পুরাণ আর কিছুই নয়, তুচ্ছ কথার পত্রপুটে অমৃত পরিবেষণের প্রয়াস। অনেক অভিলষিত চলতি ব্যক্তির সাক্ষাৎ এতে পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে না অনেক অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা। এর মধ্যস্থলে আছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁকে মন্থন দণ্ড রূপে ব্যবহার করে সুধা তুলবার প্রচেষ্টা। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে আছে তুচ্ছ কথার পসরা। আমি তুচ্ছ কথার কারবারী। এই স্বীকারোক্তির সঙ্গে মনে করিয়ে দিতে চাই তুচ্ছ কথা মানে মিথ্যা কথা নয়।

আজ একটি তুচ্ছ কথা বলতে উদ্যত হয়েছি। সেদিন রাতে আমি হাসপাতালের পূবদিকের ঘরে শুয়ে প্রহর গুনছি। বেশ মনে পড়ে জ্যোৎস্নারাত ছিল। নতুবা প্রহর গণনার সমস্ত গুণে মাঠের গাছপালাগুলো গুনছিলাম কি ভাবে। পাঠক ভাবতে পারেন, বাপু হে, হাসপাতালে যখন তুমি গিয়েছ নিশ্চয় কোন অসুখ হয়েছিল! অসুখটা কি?

সত্য কথা বলতে হলে, তুচ্ছ কথা মিথ্যা না হতে পারে তবে সত্য হতে বাধা নেই, আমার অসুখটার নাম গণিত-ভীতি। দু'দিন বাদে গণিতের পরীক্ষা। তাই যথাসময়ে হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছিলাম। এমন সময়ে দক্ষিণ দিকের বারান্দায় কয়েকজনের পদধ্বনি শোনা গেল। ভাবলাম, এ আর কিছুই নয় নিশ্চয় আরো কয়েকজন ভীতিগ্রস্ত লোক এসেছে। এখনি তক্তপোশগুলো দখল করে শুয়ে পড়বে। আড়চোখে চেয়ে দেখলাম তিনখানা তক্তপোশ খালি আছে। বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখলাম রুগীর সংখ্যাও তিন। আরও একটু ভাল করে চেয়ে দেখি, এ কারা? এরা তো রোগী নয়, তবে ভোগী হতে পারেন। এত

রাতে দিনুবাবু, সুরেন কর আর গৌরদা কেন ?

দিনুবাবুর পরিচয় আগেই দিয়েছি। সঙ্গীদের পরিচয় এখন দেওয়া আবশ্যক। পরিচয় না জানলে গল্পটার রস জমবে না। সুরেন কর ও গৌরদা প্রায় সমবয়স্ক। গৌরদা আশ্রমের প্রথম আমলের ছাত্র, তাঁর পুরো নাম গৌরগোপাল ঘোষ, তিনি চন্দননগরের অধিবাসী। সে কথাটা বুঝেছিলাম তাঁর উচ্চারণের গুণে, তিনি বলতেন চন্দনগর। উচ্চারণ শুনে বোঝা যায় কে যথার্থ চন্দননগরের লোক। শান্তিনিকেতন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে (সেবারেই প্রথম ঐ নামের পরীক্ষা হল। কাজেই ১৯০০ সাল) ভর্তি হলেন স্কটিশ চার্চ কলেজে, থাকতেন ঐ কলেজেরই কোন একটা হোস্টেলে। তবে তাঁর আসল পরিচয় হচ্ছে তিনি ফুটবলে দুর্দান্ত খেলোয়াড় ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেরা ফুটবল টিম মোহনবাগানে যোগ দিয়েছিলেন। তার পরে বি. এস-সি. পাস করে শিক্ষকরূপে ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনে।

সুরেন কর আঁতুলের অধিবাসী, নন্দলাল বসুর আত্মীয় এবং অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র। তখনই শিল্পী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছেন। তিনিও এসেছেন আশ্রমের ছেলেদের ছবি আঁকা শেখাবার উদ্দেশ্যে। তিনি থাকতেন বাগানবাড়ি নামে পরিচিত দোচালা লম্বা ঘরখানায়। আমরাও কয়েকজন ছাত্র সেই ঘরেই থাকতাম।

তখন শীতকাল। রাত্রিটা ঘুমোবার জন্য বলে লোকপ্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু আমরা জানতাম অন্য কাজ। গাছের থেকে খেজুর রস নামিয়ে নিয়ে এসে সকলে মিলে খেতাম। কেবল লক্ষ্য রাখতে হতো গৃহশিক্ষক (এক্ষেত্রে সুরেন কর) ঘুমিয়েছেন কিনা। একজন ছাত্র আঙুল দেখিয়ে সঙ্কেত করলো সুরেনবাবু ঘুমিয়েছেন, The Coast is clear, আর ভয় নেই। তখন আমরা সকলে গোয়ালাপাড়ার দিকে চললাম। হাতে খানকয়েক লাঠি, রসের ভাঁড়গুলো ঝুলিয়ে আনতে হবে। ঘণ্টা দুই তিন পরে কয়েক ভাঁড় রস এনে বারান্দায় বসে আনন্দে পান করলাম। একজন পা টিপে টিপে দেখে এলো সুরেনবাবুর গভীর সুষুপ্তি। শীতের রাতের শৈত্য দ্বিগুণিত হল শীতল রসের গুণে। তখন ভাঁড়গুলো সরিয়ে ফেলে দোষের প্রমাণ লোপ করবো ভাবছি এমন সময়ে ধীর শান্ত কণ্ঠে সুরেনবাবুর আওয়াজ পাওয়া গেল, তোমাদের হয়ে বাঁচলে আমাকে এক গেলাস দিয়ো।

কি সর্বনাশ! আমরা ফিস ফিস কণ্ঠে পরামর্শ করছি কি করা যায়। আমি বললাম, যাও এখনি গিয়ে দু' গেলাস দিয়ে এসো, তাহলে তিনিও সমদোষে দোষী হবেন, মামলা গোড়াতেই ফেঁসে যাবে। তাই করা হল। পরদিনে রস চুরির খবব আর কেউ জানতে পারলো না।

এইরকম দস্যিপনা মাঝে মাঝেই হতো। কিন্তু রস চুরি তো প্রত্যহ চলতে পারে না। নূতন কিছু চাই। এবার নূতনত্বের ধাক্কায় আমি জড়িয়ে পড়লাম, আমাকে জড়িয়ে ফেলা হল।

দিনুবাবু বললেন, ওঠ্, একটু মজা করা যাক।

বললাম, মজা করতে তো ইচ্ছা করে, কিন্তু কালকে যে অঙ্কর পরীক্ষা।

অঙ্ক আবার একটা বিষয়! যার মূলধন মাত্র দশটি শব্দ, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, আর শূন্য। হতো বাংলা পরীক্ষা যার মূলধন অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত।

গৌরদা বললেন, তোর তো ক্লাসের পরীক্ষা, সুধাকান্ত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে গিয়ে প্রশ্নপত্র দেখে কি লিখেছিল জানিস! লিখেছিল "অঙ্ক দেখে শঙ্কা লাগে, টঙ্কা বুঝি বৃথা যায়।"

এমন জলজ্যান্ত দৃষ্টান্তের পরে আর আপত্তি করা উচিত নয় ভেবে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু মজাটা কি শুনি।

তোকে সাপে কামড়েছে।

আমি বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললাম, সাপে কামড়াতে যাবে কেন!

সাপ কি তোর অনুমতি নিয়ে কামড়াবে! মনে কর্ তোকে সাপে কামড়েছে।

তার পরে?

তার পরে আর কি। খবরটা চালু করে দিলে কার কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখা যাবে সেটাই তো মজা।

নে আর দেরি করিস নে, ওঠ্— বলে দিনুবাবু আমার হাত ধরে টেনে তুললেন।

সাপটা কোথায়?

দিনুবাবু বললেন, এমন বোকা ছেলেও তো দেখিনি। তুই ঐ

বারান্দায় গিয়ে একটু কিছু বিছিয়ে শুয়ে পড় আর ছটফট করতে থাক্, আমার মাস্টার মশায়দের খবরটা পাঠিয়ে দি।

হাসপাতালের পশ্চিম দিকে একটা খোলা বারান্দা ছিল। আমি সেখানে গিয়ে একখানা গায়ের কাপড় বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম।

একটু উঃ আঃ কর্, ঘুমিয়ে পড়িস নে যেন।

দিনুবাবু বললেন, কাকে আগে খবর দেওয়া যায়?

সুরেনবাবু বললেন, নতুনদাকে দিয়ে আরম্ভ করা যাক।

দিনুবাবু বললেন, তিনি একে নার্ভাস মানুষ, তিনি এসে না মূর্ছা যান।

আমি বললাম, তা হলে তো মজার চূড়ান্ত হবে।

ও কি, তোকে না সাপে কামড়েছে, সাপে কামড়ালে কি রসিকতা করে!

নন্দলালবাবুকে খবর পাঠানো হল, বিশীকে সাপে কামড়েছে।

তিনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে এমনি নার্ভাস হয়ে পড়লেন যে তাঁকে আশ্বস্ত করবার জন্যে সুরেনবাবু আস্তে আস্তে বললেন, ভয় নেই। তিনি ভয়ের কানে শুনলেন আর ভরসা নেই। জিজ্ঞাসা করলেন, ডাক্তারবাবুকে খবর দেওয়া হয়েছে?

ডাক্তার এসে আর কি করবে।

তখন তিনি আমার গায়ে হাত দিয়ে বললেন, বেশ ঠাণ্ডা দেখছি।

দিনুবাবু হাসি চাপতে চাপতে বললেন, ওটাই তো খারাপ লক্ষণ, এ তো ম্যালেরিয়া জ্বর নয়।

ইতিমধ্যে ক্ষিতিমোহনবাবু এসে পড়েছেন—কি সাপ?

তা কি আমি দেখতে গিয়েছি!

দিনুবাবু বললেন, গোখরো হওয়া অসম্ভব নয়, পাহাড়টায় গোখরো সাপ অনেক।

পাহাড়ে উঠতে গিয়েছিলি কেন?

কে একজন বললেন, কবিত্ব করা আর কি।

নে, এখন ঠেলা সামলা। কিন্তু দিনুবাবু, তেমন যন্ত্রণার লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছে না।

লক্ষণের অভাব শুধরাবার জন্যে আমি বলে উঠলাম, "কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

হঃ, আবার কবিতাও আওড়ায়।

এমন সময়ে এক কাণ্ড ঘটলো। পাহাড়ের গায়ে ২।৩ ঘর মেথর বাস করতো, এতক্ষণে তাদের সম্বিৎ হয়েছে যে কেউ সর্পদষ্ট হয়েছে। সে কারো ছেলে হবে ভেবে তারা সবাই ডুকরে কেঁদে উঠল। ক্ষিতিমোহনবাবু তাদের একজনকে শুধালেন, আরে তোরা কাদস ক্যান্!

উত্তর পেলেন, বাবু, আজ সন্ধ্যেবেলায় একটা গোখরো সাপকে মেরেছিল। তারই জুড়িটার এই কাজ।

এমন সময়ে নেপালবাবু খড়ম খটখটিয়ে উপস্থিত হলেন, আর উপস্থিত হয়েই আমাকে গাল পাড়তে লাগলেন, হতভাগা ছেলে কবিত্ব করবার আর জায়গা পাওনি! পড়াশোনায় মন নেই, এখন পর্যন্ত Tense-এ গোলমাল করে ফেলে। Present tense আর Future tense যারা মিশিয়ে ফেলে তাদের এমনি দশা হয়।

এমন সময় অদূরে জগদানন্দবাবুর কণ্ঠস্বর শ্রুত হল, ওরে কে আছিস, শক্ত দেখে একখানা কাঁঠাল গাছের ডাল ভেঙে আন্ তো।

আমি আর্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, কাঁঠাল গাছের ডালে কি হবে?

বিষ ঝাড়বো, অব্যর্থ মুষ্টিযোগ, আগে একবার হাতে হাতে ফল পেয়েছি।

এই বলে তিনি শক্ত কাঁঠাল গাছের ডালে শপ্ শপ্ শব্দ করতে করতে এগিয়ে এলেন। তখন আমার পলায়ন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আর যাঁরা মজা দেখবার জন্যে এসেছিলেন তাঁরা আগেই সরে পড়েছেন।

তখন যেসব অধ্যাপক সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে দেখবার জন্যে এসেছিলেন তাঁরা বুঝলেন কি অপ্রস্তুত হয়েছেন। নন্দলালবাবুর তখনো ঘোর কাটেনি, বললেন, তাহলে ব্যাপারটা কিছু নয়, যাক বাঁচা গেল।

ক্ষিতিমোহনবাবু মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, সত্যি যখন গোরুর পালে বাঘ পড়বে তখন কেউ আর আসবে না।

মেথরপাড়ার কান্না তখনো গুমরে গুমরে উঠছে, ভাবটা এই রকম যে এবারে সাপে কামড়ায় নি বটে তবে কামড়াতে পারতো তো। তারা জানালো এমন জঙ্গলে জায়গায় তারা আর থাকবে না। তাদের লাভটাই সবচেয়ে বেশি হল। এখন যেখানে ডাকঘর তাদের জন্যে সেখানে ঘর তৈরি হল।

পরদিন যথাসময়ে যথারীতি গণিতের পরীক্ষা হল। আমার 'না' করবার উপায় ছিল না। পাঠকে শুনলে বিস্মিত হবেন যে আমি বেশ ভালোভাবে পাস করলাম। তাঁকে সেকথা মনে করিয়ে দিলে নেপোলিয়ন সম্বন্ধে কথিত সেই উক্তিটা বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন, সদর্পে বলতেন, Any fool may be a mathematician।

॥ ৭ ॥

হাসপাতাল

হাসপাতাল শব্দটি শুনবামাত্র মনে একপ্রকার আতঙ্ক উপস্থিত হয়। ভাবটা এই রকমই যেন ওর পরে আর দুটি মাত্র ধাপ, নিমতলা আর কেওড়াতলা। কাজেই আতঙ্কটা নিতান্ত অকারণ নয়। কিন্তু সেকালের শান্তিনিকেতনের হাসপাতালের মত আরামদায়ক স্বস্তিকর ও নিরাপদ স্থান অল্পই ছিল। একালে যে সকল স্থানকে অভয়ারণ্য বলা হয়, অনেকটা সেই রকম। তোমার ক্লাসের টাস্ক হয়নি, কোনও রকমে বিছানাটা গুটিয়ে নিয়ে হাসপাতালের একখানা তক্তপোশের উপর বিছিয়ে দাও আর শুয়ে পড়ো। হরিচরণ ডাক্তার বোলপুর থেকে আসবে এগারোটার পরে, ততক্ষণে সকালবেলাকার ক্লাস শেষ হয়ে যাবে। আর ডাক্তার এলেই বা ভয় কি? বিচক্ষণ ডাক্তার শায়িত ব্যক্তিকে রুগী বলেই ধরে নেবে। নইলে আর তার বিচক্ষণতার মূল্য কি? তারপরে ওষুধ ও পথ্য স্বেচ্ছামত চালাতে বাধা ছিল না। কিংবা তোমার বাড়িতে যাবার জন্য জরুরী তাগিদ এসেছে, ঐ অভয়ারণ্যে ঢুকে পড়ে 'একখানা চিঠি' লিখে জানাও যে, তুমি গুরুতর পীড়িত। তবে পীড়ার গুরুত্ব এত নয় যে অভিভাবকের আসা অত্যাবশ্যক। এই ভাবে অভয়ারণ্যে আশ্রয় গ্রহণে নানা উপায় ছিল। বিচক্ষণ ডাক্তার অবশ্য ধরে নিত, রোগ না হলে স্বেচ্ছায় কেউ হাসপাতালে আসে না। কাজেই ডাক্তারের সার্টিফিকেট পেতে কোন অসুবিধা ছিল না।

একালের শান্তিনিকেতনে অধিবাসীরা সেকালের এমন আরামপ্রদ হাসপাতালের কথা কতদূর বিশ্বাস করবেন জানি না। কিন্তু সত্যই সেরকম একটি স্থান ছিল। ছিল বললাম এইজন্য, সে হাসপাতাল আর নেই। নগদ টাকার রোলার চালিয়ে তা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। তবে জায়গাটা নির্দেশ করা যেতে পারে। শান্তিনিকেতনের পূর্বদিকে পাহাড় নামে একটা উঁচু জায়গা ছিল, সেটা আর কিছুই নয়। কোনও সময়ে একটা পুকুর খুঁড়বার ব্যর্থতার স্তূপীকৃত চিহ্ন। সেই তথাকথিত পাহাড়টার পূর্বদিকের গায়ে ছিল হাসপাতালটা। যার

দেয়ালগুলো ইঁট দিয়ে তৈরি, আর ছাউনিটা কতক টালিতে কতক খড়ে। পাশে ছোট একটা ঘর ছিল। পথ্যাদি তৈরি করবার জন্য।

হাসপাতালে একজন ডাক্তার ছিলেন হরিচরণ মুখোপাধ্যায় তবে তিনি সব সময় থাকতেন না। ১০টার সময়ে এসে হাসপাতালের রোগী ও অধ্যাপকদের বাড়িতে রোগী থাকলে, দেখে, ১টার সময় ফিরে আসতেন। তাঁর বাড়ি ও ডাক্তারখানা বোলপুর শহরে ছিল। প্রথম আমলে কম্পাউণ্ডার ছিলেন অন্নদাবাবু। তারপরে যথাক্রমে যোগীনবাবু ও যতীনবাবু। আর একজন ছিলেন, তাঁকে কম্পাউণ্ডার বা ডাক্তার বলা যায় না ; তাঁকে সেবক বললেই যথেষ্ট হয়। মাঝে মাঝে জলবসন্ত, হাম ইত্যাদি হয়ে ছেলেদের আলাদা থাকবার ব্যবস্থা হতো, তখন তাদের সেবার ভার নিতেন অক্ষয়বাবু। এই অক্ষয়বাবু খুব পালোয়ানী চেহারার লোক। আর একজন চাকর ছিল, তার নাম গর্ভু। দুমকা জেলার। কি আশ্চর্য, এইসব ষাট-সত্তর বছর আগেকার লোকদের নাম এখনও স্পষ্ট মনে আছে। হাসপাতালের দুটি ঘরে দশ-পনেরো জন রোগী থাকবার ব্যবস্থা ছিল। তবে এইসব রোগী যে সবাই বিশেষ রোগগ্রস্ত এমন নয়, অনেকেই ছিল ক্লাস পলাতক।

আমি একবার ক্লাস পালিয়ে, হাসপাতালে ঢুকে অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম। তখন রোগী দেখলেই ডাক্তারে সিদ্ধান্ত করতেন ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়ার তখন বিদ্যাসাগরী ভাষায় দোর্দণ্ড প্রতাপ। থার্মোমিটারের প্রয়োজন হতো না। রোগীর মুখ-চোখ দেখেই ডাক্তার বলতেন ম্যালেরিয়া, দুধ-খই খাবে। ওটাই ছিল তখন আমাদের standard পথ্য। আমি বিকেলের দিকে বিছানায় শুয়ে শরৎবাবুর কোনো একটা বই পড়ছিলাম। ডাক্তারকে আসতে দেখেই বইখানা বালিশের তলে ঢুকিয়ে রাখলাম। কিন্তু চোখের জল রাখবো কী করে? শরৎবাবুর বই পড়ে যার চোখ ছলছল না করে, সে আদৌ বাঙালী নয়। আমার চোখ দেখেই ডাক্তারে বলে উঠলেন, দুধ-খই। ভুবনডাঙ্গা গ্রাম থেকে মেয়েরা টিন-বোঝাই খই দিয়ে যেত। যাক আমার ফাঁড়াটা অল্পের উপর দিয়েই গেল। ডাক্তারবাবু একবার আমার কপালে হাত দিলেই বুঝতে পারতেন রোগটা ক্লাস-পলায়ন।

তবে সবাই যে ক্লাস-পলাতক ছিল এমন নয়। একবার যাদব নামে আট-দশ বছরের একটি ছেলে গুরুতর রোগে আক্রান্ত হলো।

প্রথম কিছুদিন ম্যালেরিয়া বলে চালাবার চেষ্টা হলো। কিন্তু অবশেষে হরিচরণ ডাক্তারকেও স্বীকার করতে হলো, রোগটা বাঁকা পথ ধরেছে। তখন দেখা দিলেন পিয়ার্সন সাহেব। নামটি শুনেই হঠাৎ তাঁকে সাহেব ডাক্তার বলে মনে হতে পারে। আসলে তিনি ইংরাজীর শিক্ষক। যাদব তাঁর প্রিয় ছাত্র। তিনি এসে রায় দিলেন, এ রোগীকে এখানে রাখা চলবে না। তার সুচিকিৎসার জন্য তাকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন শান্তিনিকেতনের আদিম ও একমাত্র দোতলা বাড়ির পশ্চিমদিকের ঘরটাতে। পিয়ার্সনের আগ্রহ দেখে অনেকেই আগ্রহান্বিত হলেন। রোগটারও আগ্রহ বাড়তে লাগলো। শেষে সকলে সিদ্ধান্ত করলেন টাইফয়েড। তখনকার দিনে টাইফয়েডের কোনো চিকিৎসা ছিল না। পিয়ার্সন বললেন, কোলকাতা থেকে ডাক্তার আনাতে হবে।

তখনকার দিনে প্রধান ও বিচক্ষণ ডাক্তার ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ আচার্য। যতদূর মনে হচ্ছে ডাক্তারের ওষুধপত্রের যাবতীয় খরচ পিয়ার্সন সাহেব বহন করেছিলেন। দিবারাত্রি পালা করে সেই ছেলেটির শুশ্রূষা সবাই করলো। রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। আশ্রমসুদ্ধ কেমন একটা থম্‌থমে ভাব। সকলের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে যাদব মারা গেল। আগেই যাদবের পিতাকে খবর দিয়ে আনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বালকটির সৎকার শেষ হয়ে গেলে তাঁকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কর্তৃপক্ষ তাঁকে একলা ছাড়লেন না। তেজেশবাবু নামে একজন শিক্ষককে সঙ্গে দিলেন। ছেলেটির বাড়ি ছিল ধুবড়ী। কি আশ্চর্য, এতকাল পরে এইসব সামান্য কথা মনে আছে দেখছি!

প্রাণকৃষ্ণবাবু সম্বন্ধে একটি ঘটনা মনে আছে। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্যস্থানীয় ছিলেন। একদিন বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতা যে এমন ছাপার অক্ষরের ভাষায় দেওয়া যায় তা এই প্রথম শুনলাম। শুনেছি সমাজে তাঁর নাকি নাম ছিল 'ছাপার অক্ষর'।

হাসপাতালে এই একটি মৃত্যুর কথাই আমার মনে আছে। অধিক যে হয়নি তার কারণ রোগীরা কেউ রুগ্ন ছিল না। সবাই ক্লাসের ভয়ে পালাত। এমন সব রোগীর মৃত্যু না হওয়াই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ তখন কোন্ বাড়িটাতে থাকতেন এখন মনে নেই। তবে সর্বদা তিনি

হাসপাতালে রোগীদের খোঁজখবর রাখতেন। একবার শুনলেন যে, খেলতে গিয়ে আমার পা মচ্‌কে গিয়েছে। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা হচ্ছে শুনে তিনি বললেন, ওদের কিছু ওষুধ নেই। আমাদের প্রাচীন মুষ্টিযোগ এসব ক্ষেত্রে অব্যর্থ। কি একটা ওষুধের ব্যবস্থাও করলেন। তাতে পায়ের ব্যথা যে সেরেছিল আমার মনে হয় না। আমার মনে হয় ঐ ওষুধটা না দিলে আরো আগে সারতো। এই ঘটনার বিশদ বিবরণ আমার আগের বইটাতে লিখেছি।

হাসপাতালের কাছে একঘর মেথর থাকতো। তার মধ্যে একজনের নাম ছিল মতি মেথর। সে মাঝে মাঝে মদ খেয়ে মাতলামি করতো। কালীমোহনবাবু এই অবস্থায় তাকে দেখে বললেন, ব্যাটা, আবার মদ খেয়েছিস? আর এমন হলে তোকে তাড়িয়ে দেবো।

সে তখন গদ্‌গদ ভাবে বলল, বাবুমশাই, কার কথা শুনবো। আপনি বলছো মদ খেলে তাড়িয়ে দেবে। আর ওদিকে যে গুরুদেব-বাবু গান বেঁধেছেন, "মোদের শান্তিনিকেতন"। আমি এখন কার কথা শুনবো?—বলে সে কালীমোহনবাবুর পা জড়িয়ে ধরতে উদ্যত হলে, পশ্চাদপসরণ ছাড়া কালীমোহনবাবুর আর কোনো উপায় রইলো না।

আর একবার এই মতি মেথরকে নিয়েই এক কাণ্ড ঘটবার উপক্রম হয়েছিল। পূজোর ছুটিতে সবাই বাড়ি চলে যেত। হাসপাতালটা জনশূন্য। কেবল Emergency'র জন্য হরি ডাক্তার তিনটি বড় বোতলে ফিভার মিক্‌স্‌চার, কফ্‌ মিক্‌স্‌চার আর ক্যাস্টর অয়েল রেখে দিতেন। এমন সময় খবর পাওয়া গেল, মেথর-পল্লীতে মতি মেথরের কলেরা হয়েছে। খবর শুনেই বিনোদ চক্রবর্তী নামে বয়স্ক ছাত্র ছুটে এলেন। প্রয়োজনকালে তার উপরে ঐ ওষুধগুলো বিতরণের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন ঐ হরি ডাক্তার। বিনোদদা এসেই ক্যাস্টর অয়েলের বোতলটি তুলে নিলেন। আমরা বললাম, ওটা আবার কেন, হরি ডাক্তারকে খবর পাঠান। তিনি বললেন, তোমরা যদি ওষুধের রহস্য বুঝতে, তাহলে তোমাদের উপরেই ভার দিতেন হরিবাবু। আমি এখনই গিয়ে ওকে heavy dose-এ ক্যাস্টর অয়েল খাইয়ে দেব।

"তাহলে যে লোকটা মারা যাবে!"

"মোটেই নয়। পেট সাফ হয়ে গেলেই আবার সুস্থ হয়ে উঠবে।"

আমরা দেখলাম এ পাগল কিছুতেই নিরস্ত হবে না।

আমি একজনকে বললাম, "বোতলটা কেড়ে নাও।"

বিনোদদা আরো জোরে বোতলটা আঁকড়ে ধরে দ্রুত চললেন।

দ্রুত যেতে যেতে শুনিয়ে দিলেন, "যার পরে রয়েছে যে ভার, বল তার আছে সে কাজের ."

গতিক মন্দ দেখে আগেই হরি ডাক্তারকে জরুরী খবর পাঠানো হয়েছিল। হরি ডাক্তার ঘোড়ার গাড়ি ছুটিয়ে এসে, লাফ দিয়ে নেমে বললেন, "লোকটাকে পাকড়াও। আমি নিয়ে গিয়ে পুলিসে handover করব।"

বিনোদদাও অবিচলিত। বললেন, "কেন—আপনি তো রোগীদের ক্যাস্টর অয়েল খাইয়ে পেট পরিষ্কার করিয়ে থাকেন। আমার এই treatment-এ রোগী অবশ্যই সেরে উঠবে।"

হরি ডাক্তার আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এখনো কেড়ে নাওনি বোতলটা? রোগী দু'ঘণ্টার মধ্যে মারা যাবে।" অবশেষে লোকবলের কাছে পরাস্ত হয়ে বিনোদদা বোতলটা ছেড়ে দিলেন।

হরি ডাক্তার বললেন, "এখনি যদি ভাল চাও, শীগগির সরে পড়ো। নইলে আমি এখনই গিয়ে থানায় রিপোর্ট করব।" পাছে আবার এই ঔষধ প্রয়োগ করে সেই ভয়ে ক্যাস্টর অয়েলের বোতলটি নিয়ে গেলেন।

তখন বিনোদদা বসে পড়ে একটি প্রমাণসাইজ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন আর বললেন, "নাঃ, এদেশে আর কিছু হবে না। একটা নূতন experiment করতে গেলে সবাই মিলে সাহায্য করবে, না তার বদলে সবাই মিলে বাধা দেয়।" খুব সম্ভব, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অভাবের কথা ভাবতে ভাবতে বিনোদদা স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

হাসপাতাল-বাড়িটার পূবদিকের ঘরটার উপর আমার লোভ ছিল, বেশ খোলামেলা, মানুষ-প্রমাণ তিনটি জানালার কাছে তিনখানি তক্তাপোশ ফেলা। শুয়ে পড়লে পূবদিকের দিগন্ত অবধি দেখা যেত। এখন অবশ্য সমস্ত মাঠ ছোট-বড় ঘরবাড়ি হয়ে ভরে গিয়েছে। তখন সে-সব ছিল কবি-কল্পনার মধ্যে। আমার লোভ ছিল দক্ষিণ-পূব দিকের জানালা-বরাবর তক্তাপোশটার উপর। স্থির করেছিলাম মুস্কিলের দিনে ওটাই হবে মুস্কিল-আসান। সেই মুস্কিলের দিন গণিত পরীক্ষা। কিন্তু তখনও ভার দেরি ছিল। স্থির করে রেখেছিলাম, আগের দিন

সন্ধ্যেবেলায় বিছানা গুটিয়ে নিয়ে ওখানে পেতে ফেলে শুয়ে পড়ব। এমন কি হরি ডাক্তারের ক্যাস্টর অয়েল অবধি গিলতে রাজী ছিলাম। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় এসে একবার দেখে যেতাম, আমার সেই তক্তাপোশখানা কেউ অধিকার করেছে কিনা। সেদিন গিয়ে দেখি সেই তক্তাপোশের উপর শুয়ে আছে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রজিত। শুধালাম, প্রজিত, তোমার কী হল ?

প্রজিত বলল, কী আবার হবে, তিন দিন পরে ইতিহাসের পরীক্ষা।

তবে আবার এত আগে কেন ?

আরে একটু আগে থেকে না শুয়ে পড়লে, ডাক্তারে ভাবতে পারে আমার পরীক্ষা-ব্যাধি হয়েছে।

আমিও সেই ব্যাধির ভয়ে ভীত, কাজেই আপত্তি করা চলে না। দীর্ঘনিশ্বাসটা চেপে বললাম, তবে আর কি হবে, চেপে শুয়ে থাকো। ভাবলাম গণিত পরীক্ষার দিনে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। হাসপাতালে একটা চাকর ছিল, তার নাম গর্ভু, বাড়ি দুম্‌কা জেলায়, সে এমন সময় ঢুকে বললো, বাবু, আপনার জন্য ক্যাস্টর অয়েল ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রজিতের মনটা খুব সম্ভব কোনও কারণেই ক্ষুব্ধ ছিল। সে বলল, খাব না, যা।

উত্তরে গর্ভু বলল, বাবু, আপনি না খেলে কম্পাউণ্ডারবাবু এসে দেখে বিরক্ত হবেন।

প্রজিত অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল, তবে তুই খেয়ে নে। কম্পাউণ্ডারবাবু দেখবেন ওষুধের শিশি খালি।

এরকম ব্যবস্থা গর্ভু আগে কখনো শোনেনি। তবে একজনের বদলে আর একজনকে ক্যাস্টর অয়েল খাওয়ানো চলে কিনা ভাবতে ভাবতে প্রস্থান করলো। আমি বললাম, খামোকা ওর উপর বিরক্ত হলে কেন ?

সে উল্টে বললো, তোমার যদি ওর ওপর এতই দরদ তবে তুমিই না হয় খেয়ে ফেলো। আমি ভাবছি আকবর বাদশার মৃত্যু কত সালে হয়েছিল, আর ও এসে বলে কিনা ক্যাস্টর অয়েল খেতে !

আমি বুঝলাম, যে কোনও কারণেই হোক্ ওর মনটা সুস্থ নেই।

এমন সময় কয়েকটি মেয়ে এসে উপস্থিত হলো। তারা আশ্রমের হোস্টেলে থাকে। বিকেলবেলা বেড়িয়ে ফিরবার সময় একবার

রোগীদের দেখে যাবে। এটাই ছিল তাদের উপবে আদেশ। সংখ্যায় তারা পাঁচজন ছিল, কিন্তু কণ্ঠস্বরে পঞ্চান্নজন। আর চারজন মামুলী কুশল প্রশ্ন করে চলে গেল। কেবল একটি মেয়ে কুণ্ঠিত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল প্রজিতের শিয়রে। মেয়েটিকে আমি চিনতাম। ওখানে সকলেই সকলকে চেনে। বললাম, তুমি যে গেলে না অতসী ?

তদুত্তরে বললো, আজ আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে।

কি প্রশ্নের কি উত্তর! কিন্তু আমার হয়ে উত্তর দিল প্রজিত, তবে না আসলেই হতো!

কুণ্ঠিত স্বরে অতসী বললো, কি করবো, গুরুদেব ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

বেশ রাগত ভাবে প্রজিত বললো, তবে গুরুদেবের কাছে থাকলেই হতো। এখানে কেন ?

অতসী নীরব। আমি তার হয়ে বললাম, ওর ওপর খামোখা রাগ করছো কেন ? গুরুদেব ডেকে পাঠালে তো না-যাওয়া চলে না।

পুনরায় রাগত ভাবে প্রজিত বললো, আমি কি তাই বলেছি ?

আমি আব উত্তর দিলাম না, বুঝলাম—গুরুদেবের অপরাধের দায়িত্ব বহন করছে নিরপরাধ অতসী। অতসী কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে নিঃশব্দে প্রস্থান করলো। বুঝলাম অকারণে যাদের উপর রাগ করা যায়, অতসী তাদেরই একজন। মনে মনে হেসে গম্ভীরভাবে বললাম, খামোখা মেয়েটার মনে কষ্ট দিলে তো!

কষ্ট পাওয়া যার স্বভাব সে কষ্ট পাবেই।

আমি বললাম, তুমি ভাই তক্তাপোশখানা চেপে আমার গণিত পরীক্ষা পর্যন্ত শুয়ে থেকো। আমি চললাম।

আমি হাসপাতাল থেকে বেরোতে দেখি, বারান্দার রেলিং-এর ওপর মাথা রেখে অতসী দাঁড়িয়ে আছে। আমি পায়ের শব্দটুকু যাতে না হয় এমনভাবে প্রস্থান করলাম। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, প্রজিত ও অতসীর সম্বন্ধটা কোথায় দাঁড়িয়েছে।

পরদিন ভোরবেলা প্রজিতকে দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম যে, প্রজিত তখনই উঠছে, উঠে বালিশের তলায় একমুঠো বেলফুল আবিষ্কার করে স্তম্ভিতভাবে বসে আছে।

শুধালাম, এত ভোরে ফুল এলো কোত্থেকে ? বাইরে বেরিয়ে-

ছিলে নাকি।

সে বললো, ফুল আপনি আসে না।

তা জানি, কেউ রেখে যায়।

প্রজিতের মুখে সেই সন্ধ্যাবেলাকার অপ্রসন্ন ভাব আর নেই।

আমার মনে পড়ল, হাসপাতালের রেলিং-এর উপরে অতসীর সেই স্তব্ধ সন্নত মস্তক।

এই ছিল সেকালে শান্তিনিকেতনের হাসপাতালের চেহারা। আশা করি সবসুদ্ধ মিলে ভীতিকর কিছু নয়।

এই ঘটনার জের টেনে মনে পড়ল আরেক দিনের কথা। আমি যে ঘরটায় থাকতাম, সেটার নাম বীথিকা গৃহ। সেই ঘরের উত্তর-পূব কোণে একটি শিশু মহুয়া গাছ ছিল। মহুয়া গাছের বাকল স্বভাবতই নরম। একদিন কি কাজে যেন সেই গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম, চোখে পড়ল মানুষ-প্রমাণ উঁচুতে দুটি পাশাপাশি শব্দ। ছুরির ফলা দিয়ে খোদাই করা, প্রজিত-অতসী। এতদিনে তাদের রহস্য উদ্ধার হল। অবশ্য উদ্ধারের কিছু বাকী ছিল না।

ইতিহাসের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে, অর্থাৎ আকবর বাদশার মৃত্যুর তারিখটার ভুল উত্তর লেখা শেষ হলে প্রজিতকে আবার স্বস্থানে প্রস্থান করতে হলো। তখন আমি আর কালবিলম্ব না করে নিজের বিছানা সেই তক্তাপোশখানার উপরে পেতে শুয়ে পড়লাম। গণিতের পরীক্ষা তখন আর ভয়াবহ মনে হলো না। পূবদিকে মানুষ-প্রমাণ উঁচু জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকলাম। এখন সেই মাঠটা ছোট বড় নানা আকারের বাড়িতে ভরে গিয়েছে। নাম হয়েছে পূর্বপল্লী। তখন সেখানে গাছপালা কিছু ছিল না। কেবল এখানে-ওখানে খেজুর গাছের গুল্ম আর লতানো কুলের গাছ। কুল পেকে উঠলে কাগজের মোড়কে কিছু নুন নিয়ে আমরা খেতাম।

তখন রোগশয্যায় সেই অম্লমধুর কুলের স্বাদ আর সমস্যাবহুল গণিতের প্রশ্নের মধ্যে তুলনা করে গণিতকেও সরস মনে হতো। কিন্তু নিরুপায়। কাজেই হতাশ হয়ে জানালা দিয়ে ঐ মাঠখানার দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

॥ ৮ ॥

কাঁচা-মিঠে আম

বীথিকা ঘরের পূব-দক্ষিণের কোণটিতে আমার একরকম স্থায়ী আবাস। দুদিকে দুটি জানলা। পূব দিক দিয়ে আসে রোদ, দক্ষিণ দিক দিয়ে হাওয়া। রোদ-হাওয়ার কিছুই অভাব নেই। কাজেই ঋতুভেদে আমি বেশ সুস্থ থাকি। এখন বুঝতে পারি, কেন একসময়ে সেই শান্তিনিকেতনের আদিকালে গুণচটের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল এখানে বাস করেছিলেন। এখানে বসেই লিখেছিলেন শারদোৎসব নাটক।

রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে এমন করতেন, যখন শিক্ষকদের মুখে জানতে পেতেন যে ঘরের ছেলেরা দুর্বিনীত হয়ে উঠবার ভাব দেখাচ্ছে। তখন তিনি একটু আব্রু রচনা করে সেখানে এসে বসে কোনো একটা নাটক লিখতেন। নাটকের সঙ্গে গুন্‌গুন্ করে গান করতেন। ছেলেরা শান্ত হয়ে যেত। অনেক পরবর্তীকালে তৎকালীন লাইব্রেরির দোতলাতে এইভাবেই ও এই কারণেই অবস্থিত হয়ে 'ডাকঘর' নাটকটি লিখেছিলেন। আজ বীথিকা ঘরের সেই কোণটি আমার আয়ত্তে।

কোনো একখানা বই নিয়ে পড়বার চেষ্টা করছি, কিন্তু বিঘ্ন ঘটাচ্ছে দক্ষিণের হাওয়াতে। মন লাগাতে পারছি না। অনুমান করি, এইরূপ দক্ষিণের হাওয়াই সেকালের তপোবনগুলিতে এমন সব কাণ্ড করতো যা আশ্রমোচিত নয়। যাই হোক আমি বইটাতে মন দিতে চেষ্টা করছি, এমন সময় কানে এলো সাইকেলের বেলের শব্দ। এমন তো কতই আসে। কিন্তু দক্ষিণের হাওয়াকে পরাস্ত করে বেলের শব্দ যখন বেজেই চললো, তখন মন না দিয়ে পারলাম না।

মনে হলো বাইরে কোনো একজন বেল-বাজিয়ে আছে। উঁকি মেরে দেখলাম, সাইকেল থেকে সদ্য অবতীর্ণ একটি মেয়ে। তার কোঁকড়া চুল ও লাল শাড়ি নিয়ে দক্ষিণের হাওয়া মাতামাতি করছে। বলে উঠলাম, অতসী যে!

কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুতভাবে বললো, হ্যাঁ, আমি।

তা হাতের ওই থলিটাতে কি?

এবারে অধিকতর অপ্রস্তুত হয়ে বললো, আম।

পাকা ?

না, কাঁচা।

তারপরে যোগ করে দিল, কাঁচা-মিঠে আম।

এ সময়ে কাঁচা-মিঠে আম কোথায় পেলে ? ডাকবাংলোর মাঠে ছাড়া কোথাও কাঁচা-মিঠে আমের গাছ নেই বলে জানি।

হাঁ, সেখান থেকেই এনেছি।

কি বলছো তুমি ? এই দুপুরবেলা একাকী সেই ডাকবাংলোর মাঠে গিয়েছিলে আম পাড়তে ?

এবারে সে কিঞ্চিৎ সপ্রতিভভাবে বললো, সঙ্গে সাইকেলটা ছিল।

সে তো আরো খারাপ। তুমি যে এমন ডানপিটে মেয়ে তা তো জানতাম না। তা এই দুপুর রোদে আম পাড়তে গেলে কার জন্যে ? আমার জন্যে যে নয়, সে তো বুঝতেই পারছি।

এ কথার সে কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকলো।

যার জন্যে এনেছো তাকেই না দিয়ে আমার ঘরের কোণে এসে সাইকেলের বেল বাজাবার অর্থ কি ?

অতসী বললো, এই আমগুলো নিয়ে আপনি তাকে দেবেন, সেইজন্য বেল বাজিয়ে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছিলাম। মনোযোগ তো আকৃষ্ট হলো !

থলি থেকে কয়েকটা আম বের করে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললো, আপনি খাবেন।

বললাম, কাঁচা-মিঠে আমে আমার খুব আসক্তি, কিন্তু প্রজিত যদি জানতে পারে যে তার নৈবেদ্যে আমি ভাগ বসিয়েছি, তাহলে কি সে খুশী হবে ?

প্রজিতদাব কাছে আর ঘেঁষবার উপায় নেই।

কেন, সেদিনকার হাসপাতালের কথা মনে পড়লো বলে ?

না, সেকথা তিনি ভুলেই গিয়েছেন।

তবে আবার নূতন কী হলো ?

মাস্টারমশায় নিষেধ করে দিয়েছেন যে, প্রজিতের সঙ্গে কাজের কথা ছাড়া আর কোনো কথা বলবি না।

তারপরে ?

আমি গিয়ে মিনুদিকে এই কথাটা জানালাম।

মিনু আমার প্রায় সমবয়স্ক। অতসীর চেয়ে বেশ কয়েক বছরের বড়।

তা সে কি করলো?

মিনুদিকে তো জানেনই। তিনি সোজা গিয়ে গুরুদেবের কাছে জানালেন, আমরা কি ছেলেদের সঙ্গে কাজের কথা ছাড়া আর কিছু বলতে পারবো না?

শুনে গুরুদেব হেসে বললেন, আরে সংসারে কাজের কথা আর ক'টা। জীবন বলিস, সাহিত্য বলিস সমস্তই তো অকাজের কথা নিয়ে।

শুনে আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম। হাসলে অতসীকে আরও সুন্দর দেখায়।

ব্যস, তবে তোমরা ডিক্রী পেয়ে গিয়েছো! এবার গিয়ে প্রজিতকে আমগুলো দিয়ে এসো।

তাকে দেবো বলেই তো এনেছিলাম।

তবে আর বাধা কি?

শাড়িটা বদলাতে হবে।

কেন, এ শাড়িতে দোষ করলো কি? তোমাকে তো লাল শাড়িতে ভালই মানায়।

কিন্তু প্রজিতদা বলেন, লাল শাড়ি পরলেই তাঁর সঙ্গে আমার নাকি ঝগড়া বাধে।

কাঁচা-মিঠে আম পেলে আজ আর ঝগড়া বাধবে না।

দেখি আপনার কথা কত দূর সত্য হয়! তবে এই চারটে আম আপনি রাখুন।

রাখছি। কিন্তু প্রজিতকে জানাবো যে, তার ভোগের নৈবেদ্যে আমি ভাগ বসিয়েছি।

তা যা হয় বলবেন। আপনাকে প্রজিতদা খুব ভালবাসে।

এই পর্যন্ত বলে সে রওনা হয়ে গেল। এবারে আর সাইকেলে নয়।

আমি বললাম, সাইকেলে কি দোষ করলো?

প্রজিতদা ডানপিটে মেয়ে একবারে পছন্দ করে না।

আমি উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে তার দিকে চেয়ে রইলাম। ভাবলাম,

প্রজিতটার একেবারে পছন্দ নেই। লাল শাড়িতে তো ওকে বেশ মানায়।

কদিন অতসীর সঙ্গে দেখা হয়নি। তারপরে যেদিন দেখা হলো, বললাম, কী, বকুনি খেলে?

সে বললো, কাঁচা-মিঠে আম প্রজিতদার খুব ভাল লাগে। তাই বোধ করি বকতে ভুলে গিয়েছিল।

আমি বললাম, একতরফা বকুনিটা কিছু নয়। মাঝে মাঝে তুমিও ওকে বোকো।

আমার কথা শুনে সে হাসলো। বুঝলাম হাসিটা অর্থগূঢ়, একেবারে অকারণ নয়।

তোমার হাসি দেখে মনে হচ্ছে, ইতিমধ্যে কিছু একটা ব্যাপার ঘটে গিয়েছে!

অতসী আবার অর্থগূঢ় হাসি হাসলো।

কী হয়েছে বল তো?

বলছি, কিন্তু আপনি যেন প্রজিতদাকে বলবেন না। আপনি তো জানেন, ভকিল সাহেবের বাড়িতে আমাদের প্রায়ই দেখা হয়!

তখন ভকিল দম্পতি বীথিকা ঘরের অদূরস্থিত দেহলী বাড়িটাতে থাকতেন। সেখানে আমাদের সকলেরই যাতায়াত ছিল। ঘটনাটা প্রজিতের মুখে শুনেছিলাম। তাই এখন আর বলতে বাধা নেই। ভকিলের বাড়িতে তখন কেউ ছিল না। এমন সময় সেখানে দেখা হলো প্রজিত-অতসীর। অতসীর কারণে-অকারণে, তুচ্ছ কারণে হাসবার অভ্যাস ছিল। ওটা ওর মুদ্রাদোষ। দুজনে হাসাহাসি চলছে।

এমন সময়ে প্রজিত এক কাজ করলো। দেখলো টেবিলের উপরে একটা কুঙ্কুমের কৌটো আছে। সে হঠাৎ কুঙ্কুমের কৌটো থেকে কাঠিটা দিয়ে কুঙ্কুম তুলে আচম্বিতে অতসীর কপালে পরিয়ে দিল। এক মুহূর্ত আগে যে মুখ হাসিতে উজ্জ্বল ছিল, সেটা গুরুতর গম্ভীর হয়ে গেল। সে প্রজিতের দিকে তাকিয়ে বললো, শেষরক্ষা করতে পারবেন? এ কথার অর্থ কতদূর গড়ায় প্রজিত বুঝতে পারলো না। সেও গম্ভীর হয়ে গেল। ভাবলো অতসীর রাগ সহজে পড়বে না। কিন্তু নারীর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রজিতের কিছুমাত্র ধারণা ছিল না।

কারণ সেইদিনই বিকেলবেলা প্রজিতের ঘরে আমার ডাক পড়লো। গিয়ে দেখি প্লেটভর্তি কাঁচা-মিঠে আমের টুকরো।

প্রজিত বললো, নাও, খেয়ে নাও।

আমি বললাম, কাঁচা-মিঠে আম পাকা আমের চেয়েও মনোরম।

আমার কথার উত্তরে প্রজিত যা বললো তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

প্রজিত বললো, ওকে আমি কাঁচা-মিঠে আম বলে ডাকি। সেইজন্যেই ও পরের বাগানে ডাকাতি করে কাঁচা-মিঠে আম নিয়ে আসে।

সেই আমে আগে যে আমি ভাগ বসিয়েছি, এ কথাটা আর ভাঙলাম না।

একটু আগেই ভকিলের বাড়ির উল্লেখ করেছি। দেহলী বাড়িতে ভকিল-দম্পতি বাস করতো। এই বাড়িতে আমাদের আড্ডা ছিল। জাহাঙ্গীর জিবাজী ভকিল পার্শী সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। অত্যন্ত সুপুরুষ, সুরসিক এবং একটু cynic প্রকৃতির। তিনি Oxford University'র Classical grates-এ উত্তীর্ণ। পরীক্ষার ফল বেরোলে তাঁর অধ্যাপক বললেন, দেখো, তুমি যদি ইচ্ছা করো তবে ভারতের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমাকে প্রফেসার করে দিতে পারি। কিন্তু যেহেতু তাঁর কপালে অনেক দুঃখ ছিল, তিনি অস্বীকার করলেন, বললেন, না, আমি দেশের কাজ করবো। এমন বলা মোটেই অসম্ভব ছিল না। কারণ তখন অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ দেশময় চলছে। ভকিল সস্ত্রীক একটি শিশুকন্যা নিয়ে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হলেন। চাকরিও জুটে গেল। ঐ দেহলী বাড়িটা তাঁর বাসস্থান বলে নির্দিষ্ট হলো। যেহেতু আমার বাসস্থান বীথিকা-গৃহ ও দেহলী বাড়িটা এক রশির ব্যবধান, তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হতে বিলম্ব হলো না। জলের সঙ্গে যেমন জল মিশে যায়, তেমনি ভকিলে ও আমাতে মিশে গেলাম। ক্লাসের সময়টুকু বাদে দুজনে সর্বদাই একত্র থাকতাম। তিনি গ্রীক, ল্যাটিন, প্রাচীন ইতিহাস ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ব্যক্তি। কিন্তু পাণ্ডিত্য এক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করলো না। শান্তিনিকেতনের একটি লক্ষণ যে, কোনো মানুষকে অনায়াসে আপন করে নিতে পারতো। আর অচিরকালমধ্যে বাংলা ভাষাটা

তার মুখে তুলে দিত। এই সময়ে ওখানকার মুখপত্র যা 'শান্তি-নিকেতন পত্র' নামে প্রকাশিত হতো, অনেক হাত ঘুরে তার সম্পাদনার ভার আমার হাতে এসে পড়লো। আমি ভকিলকে বললাম, তুমি বাংলায় কবিতা লেখ না কেন ?

ভকিল ইংরাজীতে ভালো কবিতা লিখতো। আমার কাছে উৎসাহ পেয়ে বাংলায় কবিতা লিখতে শুরু করলো আর আমি সেসব অবাধে 'শান্তিনিকেতন পত্রে' ছাপতে শুরু করলাম। তখন এই পত্রিকার প্রধান লেখক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি লিখে যে জায়গাটুকু বাকী থাকতো (নিতান্ত অল্প নয়), সেটুকু আমি লিখে পুরিয়ে দিতাম। এখন আবার আমার সঙ্গী পেলাম ভকিলকে। লোকে বলতো, ভকিল খাইয়ে-দাইয়ে আমাকে হাত করে ফেলে বাংলায় লিখতে শুরু করেছে। আসল কথা তা নয়। ওখানে বাংলা ভাষাটা সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি ছিল। কাজেই ভকিলের মতো মেধাবী ব্যক্তি যে বাংলা ভাষাটা আয়ত্ত করে নেবেন, এতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। তবে গোড়ার দিকে তাঁর বাংলা কবিতাগুলো একটু আড়ষ্ট হতো। ক্রমে তা সহজ বাংলায় পরিণত হলো। আমি সম্পাদক হলাম বটে, তবে তখন আমার বয়স ২ ।২৩ বছরের বেশী নয়। কাজেই আমার লেখাগুলো মুদ্রিত হবার আগে ববীন্দ্রনাথ একবার দেখে দিতেন। হয়তো তার প্রয়োজনও ছিল। একবারের কথা বলছি। ঐ কাগজে 'আশ্রম সংবাদ' নামে একটি অংশ ছিল। আমি লিখেছিলাম, "ত্রিপুরা দরবার থেকে ছেলেমেয়েদের নাচগান শিক্ষা দেবার জন্য একজন শিক্ষক এসেছেন।" ওই অংশটা পড়ে রবীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, "তুই দেখছি আমার ইস্কুলটা উঠিয়ে দিবি !"

আমি বললাম, "কেন ? এই খবরে এমন কি আছে, যাতে ইস্কুল উঠে যেতে পারে !"

তিনি বললেন, "এ আর বুঝলি নে, অভিভাবকরা ভাববে ছেলে-মেয়েদের নাচগান শেখানো হচ্ছে। তখনই তাদের নিয়ে যাবে।"

আমি বললাম, "তাহলে এই অংশটুকু বাদ দিয়ে দিই।"

তিনি বললেন, "একটু সবুর কর্।" এই বলে বাকী অংশটুকু পড়তে লাগলেন। তারপরে পড়া শেষ হলে বললেন, "দেখ্ কী লিখেছি—'ত্রিপুরা দরবার হইতে একজন কলাবিদ আসিয়াছেন, তিনি

ছাত্র-ছাত্রীদের সাঙ্গীতিক ব্যায়াম-শিক্ষা দিবেন।' এমন কি তুই লিখতে পারতিস? কলাবিদ বলতে ৬৪ কলার মধ্যে যে কোনো এক-টাকে বোঝায়। আর সাঙ্গীতিক ব্যায়াম মানে ব্যায়ামেরই রকমভেদ।" জিজ্ঞাসা করলেন, "এরকম তোর মাথায় আসতো?"

আমি অত্যন্ত সরল ভাবে বললাম, "আজ্ঞে না, আমার মাথায় তো আসতই না। বাংলা দেশের আর কারো মাথাতে আসত না।"

তারপর কাগজখানা আমার হাতে দিয়ে বললেন, "যা, এবার প্রেসে দে।"

এই সমস্ত ব্যাপারটা ভকিলের বাড়িতে, অর্থাৎ দেহলীতে হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ অবসর-সময়ে অধ্যাপকদের বাড়িতে বিনা নোটিশে গিয়ে উপস্থিত হতেন। এইরকম একটা বিনা নোটিশের উপস্থিতি যখন দেহলীতে ঘটেছিল, এই ব্যাপারটা তখনকার।

দেহলী বাড়িটা ছোট্ট একটা ব্যাপার। দোতলায় একটিমাত্র শয়নঘর। সেটাও আবার একজনের মাপে। তার পশ্চিমদিকে এক ফালি বারান্দার মতো ছিল, যেখানে তাঁর লিখবার ব্যবস্থা ছিল। সকালবেলাতে তিনি লিখতে বসতেন। আর লিখবার সময় মাঝে মাঝে গলা পরিষ্কার করে নেবার জন্য খাঁকারি দিতেন। সে শব্দটা এমনি উদাত্ত হতো যা আশ্রমের প্রায় সর্বত্র থেকে শোনা যেত। যারা শুনতো সাবধান হয়ে যেত। বুঝতো কল চলছে। দোতলার উত্তর-দিকে আর এক ফালি বারান্দা ও স্নানের ঘর। দক্ষিণদিকে আর এক ফালি বারান্দা, তার সঙ্গে যুক্ত ছিল নীচে নামবার সিঁড়ি, বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে সিঁড়িটা after-thought, বাড়িটা তৈরী করবার সময় সিঁড়িটা নক্সাতে ছিল না। এই রকম একটা after-thought সিঁড়ি আছে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে, 'লাল বাড়ি' নামে পরিচিত বৃহৎ বাড়িটাতে। এ-কথা রবীন্দ্রনাথ অনেকবার অনেক স্থানে বলেছেন। দেহলী বাড়ির একতলাটা ঠিক দোতলার অনুরূপ। বাড়তির মধ্যে পূর্বদিকে একটা বৃহৎ হলঘর।

এই দেহলী বাড়ির ইতিহাস লিখতে গেলে ঠিকুজী অনেক দীর্ঘ হয়ে পড়বে। প্রথমে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। তারপরে সন্তোষচন্দ্র মজুমদার সপরিবারে শান্তিনিকেতনে এসে উপস্থিত হলে তাঁরাও ছিলেন কিছুদিন। তারপর দেখেছি দিনুবাবুকে অনেককাল থাকতে। যখনকার

কথা বলছি, ভকিল দম্পতি এ বাড়ির বাসিন্দা। দিনুবাবু যখন থাকতেন, তখন সদর রাস্তা দিয়ে রাতের বেলায় গরুর গাড়ির চলাফেরা করা একটা সমস্যার ব্যাপার ছিল। দেহলী বাড়িটার পুবের দিকে পঞ্চাশ হাতের মধ্যে বোলপুর শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে যাওয়ার সদর রাস্তা। গরুরগাড়ির গাড়োয়ানরা দেহলী বাড়িটা রাতের প্রথম ভাগে পার হয়ে যেতে চেষ্টা করতো। কারণ দিনুবাবু ঘুমিয়ে পড়লে তাঁর নাসিকা গর্জনকে বাঘের ডাক মনে করে গরু ভড়কে যেত। বর্তমানে এই দেহলী বাড়িটা রবীন্দ্রনাথের পত্নী মৃণালিনী দেবীর স্মরণে 'আনন্দ আশ্রম' নামে শিশুদের বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। এই মহিলার সঙ্গে শান্তিনিকেতন আশ্রমের যোগ খুব ঘনিষ্ঠ। কিন্তু কোনোদিন কারো তাঁর স্মারক স্থাপন করবার কথা মনে ওঠেনি। অবশেষে সেটা সম্ভব হয়েছে। যাক্, এসব প্রাচীন ইতিহাসের কথা। এখন ভকিল দম্পতির বাসস্থান হিসাবে এটা আমার আলোচ্য বিষয়।

আগেই বলেছি এই বাড়িটা ভকিল দম্পতির অধিকারে থাকবার সময় এটা আমাদের প্রধান আড্ডা ছিল। বলা বাহুল্য, আড্ডাধারীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ এবং তারা সকলেই ভকিলের অন্তরঙ্গ। এর মধ্যে আমাকে ছেড়ে দিলে গোসাঁইজীর উল্লেখ করতে হয় (গোসাঁইজীর কথায় পরে আবার আসবো)। একদিন ভকিল-পত্নী প্রস্তাব করলেন যে, কোথাও পিক্‌নিক্ করতে যাওয়া যাক্। ভকিল আমার দিকে তাকালেন। ভাবটা এই যে, তুমি কী বলো ?

আমার ভাবটা এই যে, এরকম প্রস্তাবে দ্বিমত হতেই পারে না। তখন ভকিল বললেন, পাঁচ-সাতজন লোক নিয়ে তো বনভোজন বা পিক্‌নিক করা চলে না। আরো কিছু লোক যোগাড় করো। ভকিল বললেন, প্রজিতকে সঙ্গে নেওয়া যেতে পারে। তখন গোসাঁইজী বললেন, সত্যবাবুকেই বা নয় কেন (তিনি গ্রন্থাগারের সহকারী)।

মিসেস ভকিল বললেন, সঙ্গে দু-চারজন মেয়েছেলে থাকা দরকার। তাহলে রান্নার কাজ সহজ হবে।

প্রজিত বললো, হ্যাঁ, সহজেই পুড়িয়ে ফেলতে পারবে।

কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল অতসী। সে বললো, "আমি কবে পুড়িয়েছি, বলুন !"

"তার আগে বলো, কবে তুমি আমার জন্য রেঁধেছো ?"

"আপনার জন্য কখনো রাঁধতে বলেছেন ?"

"সেটা তোমার প্রতি অনুকম্পাবশতঃ, পাছে হাত পুড়িয়ে ফেলো !"

মিসেস ভকিল বললেন, "এ আপসে ঝগড়া এখন থাক্, অতসীও সঙ্গে চলুক।" তিনি বোধ হয় ওদের সম্বন্ধ আঁচে-আন্দাজে বুঝতে পেরেছিলেন।

এমন সময় সেখানে হঠাৎ এসে উপস্থিত হলো মিনতি, যার ডাক নাম মিনু। সেই মেয়েটি, যে গুরুদেবের কাছে গিয়ে নালিশ করেছিল।

মিনু বললো, "কিসের দরবার এখানে ?"

ভকিল বললেন, "আমরা পিক্‌নিকে যাবো, কিন্তু রাঁধবার লোক জুটছে না।"

মিনু বললো, "কেন, এই তো অতসী আছে !"

ভকিল বললেন, "প্রজিতের ধারণা ও হাত পুড়িয়ে ফেলবে।"

মিনু বললো, "একটু ভুল হলো। ও হাত পোড়াবে না, ভাত পোড়াবে। তেমন প্রয়োজন হলে নিজের মুখ পোড়াবে।"

"এ ভাল হচ্ছে না মিনুদি। আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো না। এই চললাম।"

বললো বটে চললাম, কিন্তু চলবার কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেল না।

মিসেস ভকিল বললেন, "অতসীর সঙ্গে জুটেছে মিনু। আজকে বিশুদ্ধ হাওয়া খেয়েই পেট ভরাতে হবে দেখছি। তার চেয়ে আমি গিয়ে হিরণদিকে ডেকে আনছি।" এই বলে তিনি মেয়ে-বোর্ডিং-এর দিকে চললেন।

বনভোজনে আর যারই অভাব হোক, লোকের কখনো অভাব হয় না। দেখতে দেখতে দলটি বেশ পুরুষ্টু হয়ে উঠলো। হিরণদি এসে কাজের কথা পাড়লেন। বললেন, "কবে আপনাদের বনভোজন ?"

ভকিল বললেন, "আজই দুপুরবেলা।"

হিরণদি বললেন, "আরে দুপুর তো গড়িয়ে গেল ! কখন যাবেন, কখন রাঁধবেন, কখন খাবেন ?"

ভকিল বললেন, "এই তো, এখনই রওনা হবো।"

হিরণদি বললেন, "তার চেয়ে আমি বলি কি, বনভোজন থেকে 'বন'টা বাদ দিয়ে ভোজনটা আজ রান্নাঘরেই হোক না। তাহলে

নিশ্চয়ই দুপুরবেলার মধ্যে হবে।"

গোসাঁইজী এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। এবারে বললেন, "হিরণদি মন্দ বলেননি। এবেলার খাওয়াটা রান্নাঘরেই হোক। আজ পূর্ণিমা আছে। চাঁদের আলোয় বনে ভোজনটা বেশ জমে উঠবে।"

দেখা গেল এ বিষয়ে সকলে একমত। তখন ভোজ্য পদার্থ সংগ্রহে সকলেই মন দিল। এবং আপাতত সংকটটা কেটে গেল।

সন্ধ্যার আগে সকলে যখন বল্লভপুরে এসে পৌঁছল, তখন সবে চাঁদের আলো গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে এসে পড়তে শুরু করেছে।

এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, আশ্রমের লোকদের বনভোজনের দুটি বাঁধা জায়গা ছিল। একটা গোয়ালপাড়া গ্রামের কাছে কোপাই নদীর তীরে, আর একটা বল্লভপুরে, সেটাও কোপাই নদীর তীরে। এ বল্লভপুর জায়গাটা একটু বুনো রকমের। সেখানে অনেক রকমের গাছপালা। গাছপালার সংখ্যা আর একটু বেশী হলে ছোটখাটো একটা বন বলা যেতে পারতো। মিসেস ভকিল বুদ্ধি করে আগেই জনচারেক লোক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর নারীবুদ্ধি বলেছিল, এইসব অ্যামেচার রাঁধুনীদের উপর নির্ভর করলে বনটা দেখা হবে বটে কিন্তু ভোজনটা নয়। সকলে এসে উপস্থিত হয়ে দেখলো যে, রান্নার কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। কাজেই তারা নিশ্চিন্ত হয়ে শতরঞ্চি পেতে (শতরঞ্চি সঙ্গেই ছিল) বেশ কায়েম হয়ে বসলো।

কে একজন বলে উঠলো, "এখন গান হলে মন্দ হয় না।"

কিন্তু গাইবে কে? সকলেই অস্বীকার করলো যে, তারা গান গাইতে পারে না।

গোসাঁইজী বললেন, "সত্যবাবুর মেয়েটি বড় হলে খুব সুগায়িকা হবে। কিন্তু মনে হচ্ছে, ততদিন অপেক্ষা করতে হলে আমাদের বনভোজনের পালাটা অসমাপ্ত রয়ে যাবে।"

তখন অতসী বলে উঠলো, "কেন, এই তো মিনুদি আছেন!"

মিনু বললো, "অতসী, তুমি আগে একটা গান করো, তারপর আমি করবো।"

অতসী বললো, "আমাকে কবে গান করতে শুনেছেন?"

"শুনিনি, এবার শুনবো বলেই তো তোমাকে গান করতে বলেছি।"

তখন সকলে সমস্বরে বলে উঠলো, "আজ অতসীর গান শুনবই।" সবচেয়ে উচ্চ কণ্ঠ প্রজিতের।

"এমন জানলে আমি এ বনভোজনে আসতাম না। আমি চললাম।" এই বলে সে ঘনতর গাছপালার মধ্যে অদৃশ্যপ্রায় হতে চললো।

চাকরদের একজন বলে উঠলো, "ওদিকে যাবেন না দিদিমণি, রাতের বেলায় মাঝে মাঝে হুঁড়ার বেরোয়।"

প্রজিত বললো, "তোমার দিদিমণির গান শুনলে হুঁড়ার ভয়ে পালাবে।"

অন্য একজন চাকর বলে উঠলো, "হুঁড়ার না থাক, ভূতপ্রেত আছে বলে শোনা যায়।"

প্রজিত বললো, "সেজন্য ভয় কোরো না। তারা তোমার দিদিমণির চেহারা দেখলেই ভয়ে পালিয়ে যাবে।"

বেচারা অতসীর উপরে অবিচার হচ্ছে মনে করে মিনু বলে উঠলো, "ভূতপ্রেত কি করবে জানি না, তবে আপনি তো পালাননি দেখতে পাচ্ছি। গানের কথাই যদি তুললেন, সেদিন পাহাড়ের কাছে গাছের তলায় বসে 'এসো নীপ বনে ছায়াবীথি তলে'—গানটা গাইছিল কে? আপনি কি ভাবেন কারো চোখ নেই?"

তখন এই বিতর্ক থামিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে গোসাঁইজী বললেন, "হুঁড়ারও থাক, ভূতপ্রেতও থাক, কিন্তু মেয়েটা গেল কোন্ দিক দেখা দরকার।"

"যার দরকার সে যাবে।" আমি বলে উঠলাম।

ভবিষ্যৎকালের প্রয়োগটা ভুল হলো। সে ইতিমধ্যেই চলে গিয়েছে। আমার কথার ব্যঞ্জনা সকলে বুঝতে পারলো না, কারণ তাদের মনটা ছিল অন্নব্যঞ্জনের দিকে। পাত পাড়া হল, কিন্তু অতসীর দেখা নাই। আমার লক্ষ্য ছিল প্রাজতের উপর। দেখলাম সেও অদৃশ্য। তখন নিশ্চিন্ত হলাম। ইতিমধ্যে অতসীকে খুঁজতে চারদিকে লোক গিয়েছে। কেউ কেউ উচ্চস্বরে নাম ধরে ডাকছে। কোপাই নদীর উচ্চতটে আহত হয়ে প্রতিধ্বনি ব্যঙ্গ করছে, 'ডাক পাড়িয়ে-দে'র। এমন সময় দেখা গেল, গাছপালার ফাঁক দিয়ে দুটি অস্পষ্ট মূর্তি এইদিকেই আসছে। সকলে তাদের দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে প্রশ্ন

করলো, "কোথায় গিয়েছিলে তোমরা এই বনের মধ্যে ?"

প্রজিত অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে কয়েকটা আম সকলের দিকে এগিয়ে দিল। একজন একটা আম হাতে নিয়ে বললো, "এতক্ষণ বন গবেষণা করে আনলে এই কাঁচা আম ?"

প্রজিত বললো, "কাঁচা বটে, কিন্তু খেয়ে দেখো খুব মিষ্টি।"

"তা তো এখন বলবেই। ঠকে গিয়েছ কিনা!"

প্রজিত বললো, "বিশ্বাস করো, আমি ঠকিনি।" এই বলে আমার দিকে একটা আম সে এগিয়ে দিল। বললো, "খেয়ে দেখ।"

আমি আমটা হাতে নিয়ে বললাম, "সব জিনিসের স্বাদ বুঝতে খাবার দরকার হয় না। বেশ বুঝতে পারছি, এ আম খুব মিষ্টি।"

মিনু বললো, "কী করে বুঝলে ?"

আমি বললাম, "স্পর্শ করেই বুঝতে পারছি এ সাধারণ আম নয়, এ আমকে বলে কাঁচা-মিঠে আম, তাই।" অতসীর মনে ভয় ছিল, না জানি কী বলে ফেলি আমি। কিন্তু আমার উত্তর শুনে মনে হলো, একটা সঙ্কট থেকে সে বেঁচে গিয়েছে। খুব সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার দিকে সে তাকালো। আমি প্রজিতকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি রকম লাগছে হে, আম ?"

সে বললো, "খুব মিষ্টি। ও অনেক কষ্ট করে বনের মধ্যে গাছ খুঁজে পেড়ে এনেছে।"

অতসীর দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, "তোমাকে আর জিজ্ঞাসা করবো না। প্রজিতের উত্তরেই তোমার উত্তর পাওয়া গিয়েছে।"

প্রজিত আবার বললো, "পাকা আম এমন মিষ্টি হয় না।"

প্রজিতের কথা শুনে অতসী এমন একটা দৃষ্টিনিক্ষেপ করলো তার দিকে, যেটা ধিক্কার না গঞ্জনা, না কৃতজ্ঞতা, না আর কিছু আজও বুঝতে পারিনি।

॥ ৯ ॥

বিরহী যক্ষ

শীত গ্রীষ্ম নির্বিশেষে ঘরের দক্ষিণ-পূব কোণের জানালাটির ধারে একখানি চৌকি টেনে বসা আমার অভ্যাস। সামনে লজ্জাবতী ফুলের বেগনি রঙের ফুলে ছাওয়া ছোট্ট একটুকরা জমি। ভোরবেলা ওঠা আমার অভ্যাস কিন্তু ঐ ফুলগুলো আমার চেয়েও আগে ওঠে। চৌকিখানিতে বসবার আগেই একটি তরুণীর অভ্যাস আমার জানলার ধারে এসে দাঁড়ানো। শেফালি-সরল তরল চোখের দৃষ্টি দিয়ে আমাকে সুপ্রভাত জানায়, মুখে কোন কথা বলে না, আমিই আগে কথা বলি, প্রজিতের খবর কি ? সংক্ষেপে সে যাহোক একটা উত্তর দেয়, মোটের উপরে সন্তোষজনক। আজকের প্রশ্নের উত্তরে পায়ের নখ দিয়ে সে মাটি খোঁচাতে লাগলো, ভাবলাম এ কি হ'ল, আজ এখনো নিরুত্তর কেন ? আমাকে আবার প্রশ্নোদ্যত দেখে বলল, প্রজিতদা তো কালকে কলকাতায় চলে গিয়েছেন।

শুধালাম, হঠাৎ ?

তাঁর তো সবই হঠাৎ।

কালকে গানের আসর ভাঙবার পরেও দেখা হয়েছিল, তখন তো কলকাতা যাওয়ার আভাস পাইনি।

আভাস দেওয়া তো তাঁর অভ্যাস নয়।

তখন প্রশ্নের গতির বেগতিক দেখে অতসী বলল, যাই আমার ক্লাস আছে।

এখানে ক্লাস আছে উক্তিটির একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক।

তখন পূজার ছুটি, আশ্রম প্রায় জনশূন্য। কেবল যেসব ছাত্র-ছাত্রী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ঘাটের কাছে এসে খেয়ার অপেক্ষায় আছে তারাই পড়াশুনার অজুহাতে রয়ে গিয়েছে। প্রজিত অতসী তাদের অন্যতম। আর সবার উপরে আছেন রবীন্দ্রনাথ কোণার্ক নামে বিচিত্র বাড়িটিতে আর তাঁর সহচররূপে আছে একটি খড়ের বাংলো। কোণার্ক বাড়িটির উপরে ওঠবার সিঁড়ি নেই, এক ছাদ থেকে অপর ছাদে উঠতে পারা যায়। খুব সম্ভব তরুণ বয়সে

জ্যোতিদার সঙ্গে চন্দননগরে গঙ্গাতীরের যে বাড়িটিতে ছিলেন তারই বস্তুগত প্রতিচ্ছবি। বর্তমানের প্রাসাদোপম উত্তরায়ণ তখন ছিল কেবল কবির কল্পনায় ও ঠিকেদারের মস্তিষ্কে। যখনকার কথা বলছি তখন উত্তরায়ণ বলতে কোণার্ক ও পার্শ্ববর্তী খোড়ো বাংলোটাকে বোঝাতো। রবীন্দ্রনাথ বাস করতেন কোণার্কে।

একদিন তাঁর খেয়াল হ'ল কোজাগরী পূর্ণিমা উদ্‌যাপন করতে হবে। কোণার্কের ছোটবড় অনেকগুলো ছাদের মধ্যে যেটা প্রশস্ততম তার উপরে সভার আয়োজন হ'ল, আয়োজনের মধ্যে গান ও কবিতা পাঠ। আশ্রমে যারা ছিল সকলকেই কুলিয়ে গেল ছাদটাতে। তখন লক্ষ্য করলাম যে রবীন্দ্রনাথ চাঁদের আলোয় কবিতা পাঠ করতে পারেন, তখন তাঁর বয়স ষাটের উপর। বলা বাহুল্য গানগুলি সবই তাঁর, কবিতাগুলিও, তবে একটি অন্য হাতের। শ্রোতাদের মধ্যে প্রজিত, অতসী ও আমি ছিলাম। সভাভঙ্গ হ'লে সবাই যে যার ঘরের দিকে চললাম, শেফালি ও বেলফুলের গন্ধ আমাদেব এগিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলল। পরদিন প্রাতঃকালে অতসীর সঙ্গে দেখা। আশা করি এবারে বুঝতে যেন পারি অতসীর ঐ ছোট উক্তিটির মধ্যে কতখানি বস্তু ছিল। যাক, অতসী তো ক্লাসের উদ্দেশ্যে চলে গেল, আমার মনও নিক্ষিপ্ত হ'ল অন্য কাজে।

কিন্তু তারপরে যতবারই অতসীকে চোখে পড়েছে, দেখেছি তার জোড় ভাঙা অবস্থা। তাদের জুটি দেখতে সবাই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তাদের জোড় ভাঙা রূপ চোখে পড়বার মতো চোখ সেই জনহীনপ্রায় আশ্রমে বেশি ছিল না। লক্ষ্য করলাম অতসী আমাকে যেন এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। সন্ধ্যার দিকে একবার মুখোমুখি হতেই সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম, প্রজিত যে কলকাতা গিয়েছে, জানলে কি করে?

অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিল, বাঃ, আমি নিজে গিয়ে তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলাম!

সবিস্ময়ে বললাম, তুমি গেলে!

সবিস্ময়ে সে বলল, তবে আর কে যাবে?

কেন, আমি তো ছিলাম।

এই কথা শুনে এমনভাবে সে আমার দিকে তাকালো যার অর্থ

করতে গেলে দাঁড়ায়, আমি থাকতে আপনাকে বলবেন কেন।

তা কি বলল ?

বলবেন আর কি। হাঁ, বললেন, এখন আমের সময় নয়—কাঁচামিঠে আমের লোভে ডাকবাংলোর মাঠে আর যেও না, সোজা আশ্রমে চলে যেয়ো।

প্রায়ই দেখতে পেতাম কখনো আম্রকুঞ্জের মধ্যে, কখনো পাহাড়টার ধারে, কখনো বা পূর্বপল্লীর মাঠে অতসীর লাল শাড়ির ভূলুণ্ঠিত প্রান্ত। এখন আবার শীতের আমেজ দিয়েছে, গায়ে চকোলেট রঙের আলোয়ানখানা, অবশ্য সর্বদাই একাকী। কখনো আমার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেলে শুধাতাম, কি অতসী, খবর কিছু পেলে প্রজিতের ? অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে উত্তর দিত, আপনি কি আপনার বন্ধুকে জানেন না ?

কেন বলো তো ?

তিনি কি চিঠি লেখবার মানুষ !

তা বটে। কলকাতায় কত কাজ।

আমার কথা শুনে সে হাসলো।

হাসলে যে ?

ভাবছি মানুষ নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও কত কম জানে। ভাবছেন তিনি স্থির হয়ে কলকাতায় বসে আছেন ?

আবার যাবে কোথায় ?

যাওয়ার জায়গার কি অভাব আছে !

তাহলে তুমি তার চিঠিপত্র পাচ্ছ না ?

আমার কথায় কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে বলল, চিঠিপত্র নিত্য আসে, তবে তাতে কাজের কথা থাকে না। থাকে যত সব বাজে কথা।

বাজে কথা বলবার লোক সে তো নয়—বললাম আমি।

আপনারা অবশ্য সে সবকে ঘোরতর কাজের কথা বলেন।

যেমন ?

যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব এমনি আরো কত কি।

হঠাৎ মনে হল অতসীর কোন কোমল স্থানে আঘাত দিয়েছি ; তখন সেই আঘাতের উপরে স্নিগ্ধ প্রলেপ দেবার উদ্দেশ্যে বললাম, তাহলে বেশ দু'জনে পত্রাপত্রি হচ্ছে।

দু'জনে নয় বিশীদা, আমি তার চিঠির উত্তর দিই না।

কেন, তার অপরাধ ?

অপরাধ নয়, কোথায় আমার এত জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডার !

জ্ঞানবিজ্ঞানের কথাই লিখতে হবে এমন কি মাথার কিরে আছে ! খুব সাধারণ কথা লিখবে।

যেমন ?

যেমন এই ধরো এখানে শীতের আমেজ দিয়েছে। তুমি চকোলেট রঙের আলোয়ানখানা বের করেছ। শিউলি আর বেলফুলের গন্ধে চারদিক আমোদিত।

অতশত কবিত্ব করবার সময় আমার নেই,—বলে ঝাঁঝিয়ে উঠে সে বিনা উপসংহারে প্রস্থান করলো। বুঝলাম অজান্তে তার মনে আঘাত দিয়েছি। লোকে বলে মেয়েদের পেটে কথা থাকে না, কিন্তু তারা কেমন করে জানবে যে শত চেষ্টাতেও মেয়েদের পেট থেকে কথা বার করা যায় না। আজ ক'দিন তার পেট থেকে প্রজিত সম্বন্ধীয় কথা বার করবার চেষ্টা করছি। আমাকে দেখলে বা আমার প্রশ্নের উত্তরে অনেক কথাই সে বলেছে—কিন্তু একটা কথাও যথার্থ নয়। প্রজিত ফিরে এলে বুঝলাম যে এতদিন আমি ছায়ার সঙ্গে কথোপকথন করেছি। কত সহজে সে আমাকে ছলনা করেছে ! মেয়েদের ধমনীতে এখনো আদি রমণী ইভের রক্ত সক্রিয়।

ভকিল সাহেবের উল্লেখ আগে করেছি। তিনি তখন থাকতেন দেহলী বাড়িটাতে। মেয়েদের বোর্ডিং বাড়ি। দুটি বাড়ি কাছাকাছি মুখোমুখি, মাঝে একসার কিশোর আমলকি গাছ। আরো উল্লেখ করেছি ভকিল সাহেবের বাড়ি আমার প্রধান আড্ডা ছিল। এখন ছুটির সময় সেখানেই কাটতো সারাটা দিন। রাতেরও অনেকটা। বলা বাহুল্য তিন চার দফা আহারও জুটতো সেখানে।

সেদিন সকালবেলায় সাফোর গ্রীক কবিতার ইংরেজি অনুবাদের একখানা বই নিয়ে পাঠোদ্ধার করবার চেষ্টায় মত্ত আছি, হঠাৎ পিঠের উপরে করস্পর্শ অনুভব করে তাকিয়ে দেখলাম ভকিলের স্মিত বদন। আমাকে কথা বলতে উদ্যত দেখে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললেন, কথা বলো না। বলি অবনী ঠাকুরের আঁকা কচ ও দেবযানীর ছবি দেখেছ ?

বললাম, হঠাৎ একথা কেন ?

কারণ না থাকলে কার্য হয় না। আমার সঙ্গে এসো, সেই ছবি-খানা দেখবে।

তোমার দেয়ালে টাঙানো আছে, অনেকবার দেখেছি।

আর একবার দেখলে ক্ষতি নেই।

এই বলে তিনি আমাকে ধবে নিয়ে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড় কবিয়ে দিলেন, দেখলাম অবনীবাবুর কচ ও দেবযানী মূাত ধরে একটা আমলকি গাছের তলায় দণ্ডায়মান অতসী ও প্রজিত।

রসভঙ্গ করো না, দেখে যাও।

দেখলাম দেবযানী নতমুখী। কচ ব্যস্ত নিবদ্ধদৃষ্টি দেবযানীর কুণ্ঠিত চঞ্চল কেশকলাপে। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল দেবযানী আঁচলের প্রান্ত দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বোর্ডিংয়ের দিকে চলে গেল। আর দাঁড়িয়ে থাকা বৃথা মনে করে কচ স্বগৃহের দিকে চলল। ততক্ষণে আমরা আড়ালে চলে গিয়েছি।

ভকিল সাহেব বলে উঠলেন, প্রজিত কতক্ষণ এলে, এসো এক কাপ চা খেয়ে যাও।

প্রজিত হাঁফ ছেড়ে ভাবলো, তাদের কচ ও দেবযানী লীলার সাক্ষী কেউ হয়নি। চোর ও প্রেমিক সর্বদা ভাবে তাদের ক্রিয়াকলাপ নিঃসাক্ষী। বোধ হয় ভুল হ'ল। প্রেমিক সাক্ষী খুঁজে বেড়ায়। সাক্ষীবিহীন প্রেম তৃপ্তি দিতে পারে না।

আমার উক্তির সত্যতা প্রজিতের কথাবার্তায় কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম।

কিন্তু হঠাৎ কলকাতায় চলে গিয়েছিলে কেন ?

বিস্ময়ে বলে উঠল প্রজিত, কলকাতায় !

হ্যাঁ কলকাতায়।

কে বলল ?

বলবার অধিকার যাকে দিয়েছ।

অতসী নাকি ?

আর কে !

কি বলল শুনি ?

বলল এই যে হঠাৎ দরকার পড়ায় তুমি কলকাতায় রওনা হয়ে

গিয়েছ। সে নিজে তোমার সঙ্গে স্টেশনে গিয়ে টিকিট কিনে তোমাকে গাড়িতে বসিয়ে দিয়েছে।

অতসীটা এত মিথ্যা কথাও বলতে পারে।

কে যে মিথ্যাবাদী ঠিক করতে পারছি না।

তুমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলে কেন?

আর কাকে জিজ্ঞাসা করবো বলো।

প্রথম দু' তিন দিন এই রকম কথা-কাটাকাটির mock fight চলল, অবশেষে প্রজিত surrender করলো। তা ছাড়া আর তার কোন উপায় ছিল না, ক্রমে তাকে কোণঠাসা করে আনাও যায় আর সে-ও বোধ হয় মনে মনে ছটফটিয়ে মরছিল সব কথা প্রকাশ করবার জন্যে। তার পরে একদিন রাত যখন অনেক, ঘণ্টাতলার বেদীতে গিয়ে দু'জনে বসলাম।

প্রজিত তখন মুখ খুলল, বলল, ভাই, তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু যার কাছে আমার আকস্মিক অন্তর্ধান রহস্য প্রকাশ করা চলে।

বললাম, একথা যখন বুঝেছ তখন কথার প্যাঁচ কষাকষি ছেড়ে দিয়ে সব খুলে বলেই ফেলো।

সে আরম্ভ করলো, তোমার কোজাগরী পূর্ণিমার সভাব কথা নিশ্চয় মনে আছে।

তোমার চেয়ে আমার মনে আছে বেশি।

কেন এমন বলছ?

বলছি এইজন্যে, তোমরা তখন বাহ্যজ্ঞানরহিত হয়ে তন্ময় অবস্থায় বসেছিলে।

তার মানে কি হ'ল?

মানে হ'ল এই যে অস্ত্রপরীক্ষার সময়ে অর্জুনের মতো তোমার অবস্থা হয়েছিল, পক্ষীটার চক্ষু ছাড়া তোমার কাছে বিশ্বচরাচর তখন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

সে বলল, তোমার বদ অভ্যাস এই যে অলঙ্কার ছাড়া কথা বলতে পারো না।

অবশ্যই পারি, তবে এসব কথাবার্তা অলঙ্কার-ছুট হলে ভারি ন্যাড়া লাগে, সাঁওতাল পরগণার পাহাড়গুলোর মতো।

এটাও তো অলঙ্কার হ'ল।

স্বীকার করছি, তার কারণ হচ্ছে এযুগে শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিকের গদিতে দীর্ঘকাল কাজ করতে করতে ওটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

এটাও তো অলঙ্কার হ'ল।

হ'লই তো। তবে তুমি না হয় নিরলঙ্কার ভাবে আত্মপ্রকাশ করো।

সেই ভালো, বলে সে শুরু করলো, সভা ভাঙলে তোমাদের সকলকে পাশ কাটিয়ে আমরা দু'জন পিছু পিছু চললাম।

আর দু'জনে রাস্তার দু'দিক থেকে ফুল তুলে নিলে, একজন শিউলি, একজন বেল।

জানলে কি করে?

এটা এমন কোন গোপন রহস্য নয়, কারণ উত্তরায়ণের পথের দু'দিকে ও ছাড়া আর কোন ফুলের গাছ নেই।

ভুলেই গিয়েছিলাম, তারপরে শোনো।

আমি উৎকর্ণ হয়ে আছি, বলে যাও।

সমস্ত আশ্রম তখন নির্জন, রাত নিষুতি, পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় দু'জনে দুটি ছায়া নিক্ষেপ করে চলে এলাম তোমার বীথিকাগৃহ পর্যন্ত, মাথার মধ্যে তখন কত কথা বের হওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু কাকে অগ্রাধিকার দেব ভাবছি এমন সময়ে পাশের বকুল গাছটায় রাতজাগা পাখী ধড়ফড় করে উঠল। আমার মুখ বলে ফেলল, "অতসী, আমার মনটা কেমন করছে।" এই অত্যন্ত সাধারণ কথাটাকে অসাধারণ বলে গ্রহণ করে সে ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, "তা আমি কি করবো, যা ইচ্ছা হয় করুন।" এমন কতবারই তো বলেছে - কিন্তু তখন এই সাধারণ কথাটাকে আমার অসাধারণ বলে মনে হ'ল, মনে হ'ল পায়ের তলাকার মাটি যেন কাঁপছে। তার কথার কোন প্রত্যুত্তর আমার জোগালো না। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম, আর এগোবার উপায় ছিল না। কারণ ততক্ষণে মেয়ে বোর্ডিঙের মেহেদি গাছের বেড়া পর্যন্ত এসে পড়েছি। আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম কিন্তু সে যেমন চলছিল তেমনি চলে গেল, আমি এলাম। তখনি স্থির করে ফেললাম, আজ রাতেই কোথাও যেতে হবে, কোথায়, কেন, কিছুই বিচার করলাম না। তখনি ঘরে এসে হাল্কা একটা বিছানা আর কিছু টাকা নিয়ে স্টেশনে এসে দেখি টিকিট ঘরের কাছে গোঁসাইজি দাঁড়িয়ে আছেন।

বললাম, গোঁসাইজি কোথায় চললেন ?

শ্রীবৃন্দাবনে মা জননীকে দেখতে। আপনি ?

যাওয়াটাই স্থির করেছি, কোথায় এখনো স্থির করিনি।

এ যে ফাল্গুনীর নবযৌবনের দলের মতো উত্তর দিলেন।

এমন সময়ে টিকিটের ঘণ্টা পড়লো গোঁসাইজি আগে দাঁড়িয়ে-ছিলেন, একখানা টিকিট দিন শ্রীবৃন্দাবনের। আপনাব জন্যে কোথাকার টিকিট কববো বলুন।

আবার আমার অবাধ্য মুখ বলে ফেলল, দেওঘরের টিকিট করুন, এই নিন টাকা।

ঘণ্টা দেড়েক পরে দু'জনে যখন খানা জংশনে নামলাম তখনো স্থির করতে পারিনি এত জায়গা থাকতে কেন দেওঘরের টিকিট চাইলাম। তখনো মনের মধ্যে অতসীর সঙ্গে কথা-কাটাকাটি চলছিল।

গোঁসাইজি বললেন, একেবারে শেষরাতে গাড়ি আসবে, এখনো ঘণ্টা তিনেক এখানে থাকতে হবে। চলুন এই বারোয়ারী ওয়েটিং রুমটায় বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়া যাক।

গোঁসাইজির অনুকবণে বিছানা খুলে ফেললাম, দেখি যে তিনি একটা মশারি বেব করে টাঙাবার উপায় সন্ধান করছেন।

আমি বললাম, এই যে মাল ওজন করবাব মস্ত কলটা আছে তার হাতগুলোব সঙ্গে মশাবি ঝুলিয়ে নেওয়া যাক।

উপায় এত সহজলভ্য দেখে গোঁসাইজি বললেন, নিন, এবাব শুয়ে পড়া যাক। বাবাঃ, এ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মাথা!

আমি বললাম, দ্বৌ অপি অত্র আরণ্যকৌ। দু'জনেই বারেন্দ্র।

সে রাতের নিদ্রার স্মৃতি ভুলতে পারবো না, বিশেষ সেই বিচিত্র মশারি খাটাবার দৃশ্যটি। তারপরে যখনই খানা জংশন পার হয়ে যাতায়াত করেছি কল্পনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে মাল ওজন করবার কলের সঙ্গে সংলগ্ন সেই যুগল মশারিব দৃশ্য।

আমি বললাম, তোমার মশারি-পর্ব থাকুক, তার পরে কি হ'ল বলো।

গোঁসাইজি তো চলে গেলেন বৃন্দাবন বলে, আমি যশিডি স্টেশনে নেমে দেওঘরের গাড়িতে উঠলাম। বাল্যকালের সেইসব অতিপরিচিত

দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে যখন গাড়ি চলল, মনে হ'তে লাগলো পুরাতন ছবির বইয়ের পাতার পরে পাতা উলটিয়ে যাচ্ছি।

তাকে বাধা দিয়ে বললাম, ভাই প্রজিত, এও তো অলঙ্কার হচ্ছে।

সে বলল, কাজে-কাজেই, আমিও তো একজন আলঙ্কারিকের সাগরেদি করছি।

বললাম, তা নয়, মানুষের ভাষা পুরনো অলঙ্কারের সোনা গালিয়ে তৈরি।

এটাও তো অলঙ্কার হ'ল।

আচ্ছা অলঙ্কার-তত্ত্ব না হয় থাকুক, এবারে সোজা কথায় বলো দেওঘরে পৌঁছে তোমার মনের অবস্থা কি রকম দাঁড়ালো।

সেই কথাই ভালো। স্টেশনে নামবার পরে প্রথম মনে হল আমি নিরাশ্রয়। এতক্ষণ আশ্রয় ছিল ট্রেনের কামরা। এখন যাই কোথায়! তখনকার দিনে দেওঘরে হোটেল বলে কিছু ছিল না, তাব তার বদলে ছিল পাণ্ডাদের আশ্রয়। সেখানে ভিড়ের মধ্যে যেতে ইচ্ছা ছিল না; কি করবো ভাবছি, এমন সময়ে মনে পড়লো যে উইলিয়ামস্ টাউনে আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোক বাস করেন। সেখানে এসে উঠে স্নানাহার সেরে ফরাসের উপর শুয়ে পড়লাম।

এতখানি বিবরণ একটানা লিখে গেলাম বটে তবে একটানে বের করতে পারিনি প্রজিতের পেট থেকে, অনেক পরিচর্যা করে, অনেক চা খাইয়ে একটু একটু করে যা সংগ্রহ করেছিলাম তাই জোড়াতাড়া দিয়ে দাঁড় করালাম।

একদিন সে আপনা থেকেই জিজ্ঞাসা করলো, অতসী কি ভাবতো জানতে ইচ্ছা হয়।

বললাম, দেখো আমি তো সামান্য মানুষ, স্বয়ং মহাকবি কালিদাস যক্ষ-পত্নীর মনের কথা লিখে যাননি।

কেন?

কেন আর কি, তা মহাকবির পক্ষেও অজ্ঞেয় বলে।

তোমাকে কিছু বলেনি?

আমাকে বলতে যাবে কেন। হাঁ বলেছিল যে প্রজিতদা কলকাতা গিয়েছেন।

তুমি বিশ্বাস করেছিলে ?

অবিশ্বাস করতে যাবো কেন ? দেখো ভাই প্রজিত, একালের মহাকবি বলেছেন, "রমণীরে কে বা জানে মন তার কোন্‌খানে।" ও ছেড়ে দাও। তুমি তোমাব দিকের বিবরণটাই শোনাও।

তবে তাই শোনো। আমার মনে না ছিল শান্তি, না ছিল স্বস্তি। এদিকে ওদিকে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াই। আমার গৃহস্বামী একদিন বললেন, আপনাকে ফেরারী আসামী বলে মনে হয়, দু-দশদিন থাকুন, না বলছেন আজ রাতেই রাঁচি রওনা হবেন।

তাই তো স্থির করেছি।

আমার অনুরোধে তিনি রাঁচির ট্রেনের বিবরণ জানালেন। যশিডি থেকে আসানসোল, সেখানে ট্রেন বদলি করে আদ্রা নামে এক স্টেশনে রাঁচির ছোট গাড়ি ধরতে হবে। দুটো বদলিই রাতের বেলায়, সময়মতো ঘুম না ভাঙলেই অপথে চলে যেতে হবে।

বললাম, সে ভয় নেই, ঠিক সময়ে ঘুম ভাঙবে। মনে মনে বললাম, আদৌ যদি ঘুম আসে !

রাঁচি স্টেশনে নেমে একখানা ঘোড়ারগাড়ি নিয়ে ডেপুটি পাড়ায় এসে উপস্থিত হলাম। নামতেই প্রথমেই দেখা হল আরতির সঙ্গে। আরতি বলল, প্রজিত, তুই অতসীর সঙ্গে রাগারাগি করে এসেছিস !

কি করে বুঝলে ?

নইলে তোর মাসী হ'তে গেলাম কেন ?

আমি আরতির সঙ্গে মাসী সম্বন্ধ পাতিয়েছিলাম। এই প্রথম স্বস্তিব নিঃশ্বাস অনুভব করলাম মনের মধ্যে।

নে, এখন স্নানাহার করে ঘুমো। দাদা অফিস থেকে ফিরবেন পাঁচটায়। তখন বেড়াতে বের হওয়া যাবে।

তার দাদা শান্তিনিকেতনের ছাত্র। এখানকার ইনকাম ট্যাক্স অফিসার।

আমাকে শুইয়ে দিয়ে মাসী বললেন, দ্যাখ ঘুমের মধ্যে অতসীর স্বপ্ন দেখতে পাস কিনা ?

একদিন বিনা ভূমিকায় প্রজিত আমার ঘরে এসে বলল, চা খেতে এলাম।

বললাম, বসো, চা অবশ্যই পাবে, তবে মুখ্যত সেজন্যে আসনি। আর কোন কারণ আছে।

সে বলল, আছে। দেখো আজকালকার মেয়েগুলো কিরকম একগুঁয়ে, কিছুতেই বশ মানে না।

কেন অতসীর তো বেশ নরম স্বভাব!

নরম না আর কিছু। এই ক'দিন কতরকমে সাধ্যসাধনা করলাম, কোন ফল হয়েছে বলে মনে হয় না।

আমি বললাম, যেরকম ব্যবহারটা তার সঙ্গে করলে অন্য মেয়ে হ'লে তোমার মুখদর্শন করতো না। কি হয়েছে গোড়া থেকে খুলে বলো তো!

প্রজিত বলল, আমি ফিরে এসে দ্বারিকের আমলকি গাছটার কাছে দাঁড়িয়ে অতসী বলে ডাকলাম।

সে যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল, 'আসছি' বলে উত্তর দিয়ে সোজা এসে দাঁড়ালো আমার কাছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, পড়াশোনা কি রকম হ'ল? বলল, আরেকজনের বেড়ানো যেমন হল?

আমি বললাম, বাঃ এ তো বেশ নাটকীয় প্রস্তাবনা, স্বয়ং মহাকবি কালিদাসও এর চেয়ে উত্তম সূচনা করতে পারতেন না।

বাখো তো, আমি ওর সঙ্গে আর কথা বলবো না।

কথা বলবে না, তবে জেগে জেগে চকোলেট রঙের আলোয়ান-খানার স্বপ্ন দেখবে।

আমার কাছে প্রশ্রয় না পেয়ে সে বলল, আমি এখন চললাম।

আমিও চললাম। তোমাকে আগে জানাতে পারিনি। জলপাইগুড়ির ডাক্তার চারু সান্যাল আমার পুরাতন বন্ধু, অনেকদিন থেকে নিমন্ত্রণ করেছেন। যাবো যাচ্ছি করি কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। এবারে একটা সভার আয়োজন করে আমাকে জানিয়েছেন, না গিয়ে আর উপায় নেই।

বিপদে এমনি করে বন্ধুরা ছেড়ে যায়।

আরে তোমার বিপদ তো কেটে গিয়েছে।

আজকাল মেয়েদের হাতে পড়লে বিপদ এত সহজে কাটে না।

Uttarpara

ও প্রতিশোধ নেবার জন্যে কখন কি করে বসে তার স্থির নেই। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকি।

তা একটু ভয়ে ভয়ে থাকা মন্দ নয়। আর যাই করো ওকে বেশি ঘাঁটিও না।

মনে রাখবার চেষ্টা করবো, বলে রাগত ভাবে সে বেরিয়ে গেল।

আমিও জলপাইগুড়ি রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত হইগে বলে সংক্ষেপে তাকে বিদায় দিলাম।

॥ ১০ ॥

শিলিগুড়ির আলো

সেই আমার প্রথম দার্জিলিং দর্শন। শিলিগুড়ি স্টেশনে ছোট মাপের গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি ছাড়লো। গাড়ির বেগ যত তার চেয়ে বেশি তার শব্দ। কিন্তু সে দিকে আমার কান ছিল না। আমার চোখ কেড়ে নিয়েছিল দু'দিকের পাহাড়ী দৃশ্য। দৃশ্য বলতে পাহাড়ী অরণ্য। সুখনা স্টেশন থেকে অরণ্যের সূত্রপাত। সে-সব কি গাছ, কি তাদের নাম কিছুই জানি না, জানবার ইচ্ছাও নেই। আমি উন্মুখ হয়ে আছি কখন তুষারমৌলী গিরিশিখর দেখা দেবে। সেই প্রথম যাত্রা তাই জানতাম না, কালিম্পঙ পৌঁছবার আগে তুষার দেখা যায় না।

সুতোর মতো সরু রেলপথ। একদিকে খাড়া পাহাড়। কেবলি ভয় হচ্ছিল এই সব শিখর থেকে একখানা পাথর খসে পড়লেই এই খেলনার মতো গাড়িখানা চুরমার হয়ে যাবে। তবে ভরসার মধ্যে এই যে এ রকম বিপদ সংবাদপত্র ছাড়া আর কোথাও বড় ঘটে না। বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখলাম ডান দিক থেকে প্রচণ্ড জলধারা সবেগে নেমে আসছে। একজন যাত্রী নিজেদের মধ্যে বলল, পাগলা ঝোরা, আর একজন বলল এখন তো কিছুই নেই, আগে দেখেছি জলের বেগে গাড়ি কাঁপতো। সত্যেন দত্তের পাগলা ঝোরা নামে কবিতাটা মনে পড়লো। এবারে গাড়িটা আরো পিছু হঠে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠেছে। একজন যাত্রী অপরকে বলল, ঐ দেখুন! ডান দিকে দূরে কি দৃশ্য।

জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, অতি দূরে সমতল ভূমিতে একটা মালার ছড়ার মতো ছড়িয়ে পড়ে আছে কয়েকটা নদীর রেখা।

ঐ দেখুন তিস্তা, ঐ মহানন্দা!

আর ওইটার নাম কি?

নাম জানি নে, দেখে যান। এ সব পাহাড়ী দেশে নদীর নাম, গাছপালার নাম, ঝরণাধারার নাম জানবার চেষ্টা করবেন না।

আর একজন যাত্রী যার ভূগোলের জ্ঞান ছিল, সে বলল, তিস্তা

চলে গিয়েছে জলপাইগুড়ির দিকে, আর মহানন্দা মালদা হয়ে গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে।

আমি আপন মনে বললাম, কোথায় মালদা, কোথায় গঙ্গা, এখন মনে হচ্ছে কত কাছে।

এ তো কিছুই নয়। এরেপ্লেনে চেপেছেন কখনো?

আমি সভয়ে বললাম, না।

তবে আর কি দেখলেন। এবোপ্লেন থেকে দেখলে মনে হয়, সমস্ত বাংলা দেশটাকে অসংখ্য নদী হাত দিয়ে আঁকড়ে জড়িয়ে ধরেছে। সুযোগ পেলে এবোপ্লেনে চড়ে দেখবেন।

মনে মনে বললাম, সুযোগ না দুর্যোগ! একজন যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ সব কী গাছ? পাইন নাকি?

দার্জিলিঙে পাইন নেই, পাইন দেখতে চান তো শিলং যান—বললেন তিনি।

এ যে কুয়াশা হয়ে এলো!

আবও ঘন হবে, ঘুম স্টেশন আসুক আগে। ঐ দেখুন সব বৌদ্ধদেব মন্দিব, ওদেব নাম গুম্ফা।

আচ্ছা ঘুম নাম কেন?

তা জানি নে! এই রেলপথে এটাই সবচেয়ে উঁচু জায়গা। এবাবে গাড়ি নামতে শুরু করবে।

কুয়াশা যেন কিছু কম। আরো কম হবে দার্জিলিং স্টেশনে পৌঁছলে।

গাড়িটা একবার পাক খেয়ে নিচে নামতে শুরু করলো।

এই জায়গাকে বলে ঘুম স্টেশন। আপনার বুঝি এই প্রথম?

বললাম, হ্যাঁ। এর আগে পাহাড় দেখিনি। তবে সাঁওতাল পরগণার পাহাড় দেখেছি।

ও সব এর তুলনায় কিছুই নয়। বলে গায়ের কাপড়খানা বেশ করে জড়িয়ে নিয়ে বসে বললেন, ঐ দেখুন শহরের বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যাবেলায় তাকিয়ে দেখবেন—এলোমেলো যত্রতত্র আলো জ্বলছে, যেন গাঁদা ফুলের ঝাড়।

আবার সত্যেন দত্তর কবিতাটা মনে পড়লো। হয়তো নামটা জোরে বলে ফেলেছিলাম, সহযাত্রী বললেন, ওসব হচ্ছে কবিতা। দার্জিলিঙের বর্ণনা যদি পড়তে চান তো পরশুরামের কচি-সংসদ পড়বেন।

গাড়ি এসে থামলো।

দার্জিলিঙ!

হিন্দু ন্যাশনাল হোটেল নামে এক হোটেলে এসে উঠেছি। আগে পরিচয় ছিল না কিম্বা চিঠি লিখেও জানাইনি। তবে পথে বের হয়ে খুঁজতে খুঁজতে এই নামের হোটেলটি দেখে বুঝলাম আমার মতো স্বল্পবিত্তের পক্ষে এটিই যোগ্য বাসস্থান। হিন্দু আখ্যা থাকলেই বুঝতে পারতাম, তার উপরে ন্যাশনাল শব্দটি থাকাতে বুঝলাম এ আর কিছুই নয়, স্বল্পবিত্ত স্বাস্থ্যান্বেষীর পক্ষে যোগ্যতম আশ্রয়।

হোটেলের মালিকের নাম কাল বাবু। তাঁর দিবারাত্রির আশ্রয় একটি প্রমাণ সাইজের কাঠের সিন্দুক। তারই উপরে তাঁর আসন এবং শয়ন, তিনি কদাচিৎ সেই সিন্দুক পরিত্যাগ করে হোটেল থেকে বের হন। লোকে বলে এরই মধ্যে তাঁর স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি রক্ষিত। "কালীবাবুর হোটেল" ও "কালীবাবুর সিন্দুক" এক ডাকে দার্জিলিঙের লোকে চেনে। যাই হোক, কালীবাবুর আশ্রয়ে একটি ঘর দখল করে বসলাম। আমাকে নবাগন্তুক দেখে তিনি আমার গার্জিয়ান হয়ে বসলেন এবং এখানকার যাবতীয় দর্শনীয় বহু স্থানের বিবরণ দিলেন। আর আমি শান্তিনিকেতন থেকে আসছি শুনে জানিয়ে দিলেন যে শহরের টাউন হলে একটি ছবির প্রদর্শনী চলছে, ইচ্ছা করলে যেতে পারেন।

শুধালাম, আপনি গিয়েছেন?

তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, পাঁচজনের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে একবার গিয়েছিলাম।

কিরকম দেখলেন?

কিরকম আর দেখবো। কতকগুলো আঁকজোক মাত্র। ছ্যাঃ, একে কি ছবি বলে! ভেবেছিলাম ঠাকুর-দেবতার ছবি হবে। গেল কতকগুলো পয়সা বের হয়ে। তাই আপনাকে জানিয়ে রাখলাম এইসব ছবি দেখে পয়সা নষ্ট করবেন না যেন।

মনে মনে স্থির করলাম অবশ্যই যেতে হবে। আর কিছু না হোক প্রজিতের সঙ্গে দেখা হতে পারে।

প্রজিতের কথা মনে হতেই অতসীর কথা মনে হল। মনে পড়লো

কিছুদিন হল ওদের মধ্যে মন-কষাকষি চলছে। ব্যাপারটা সংবাদপত্রের ভাষায় অঘোষিত যুদ্ধের মতো। একদিন আমাকে একলা পেয়ে বলেছিল, দেখুন আমি একদিনের জন্যেও কলকাতা গেলে প্রজিতদাকে না জানিয়ে যেতে পারি না, আর তিনি দশ-পনেরো দিনের জন্য ডুব দিলেন, জানানো দরকার বোধ করলেন না।

বললাম, কথাটা তাকে বললেই তো ভালো হতো।

আপনাকে বললেই তার কানে গিয়ে পেঁছবে জানি।

ধরো তাকে যদি না বলি।

কতক্ষণে তাকে বলবেন তাই ভাবছেন।

আমি কৃত্রিম কোপে বললাম, তোমরা কি আমাকে ডাকঘর পেয়েছ?

কতকটা বটে।

কেমন!

অনেক কথা আছে যা সকলকে বলা যায় না।

তাই পত্রাকারে ডাকবাক্সে ফেলে দাও। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক উত্তর দিয়ো। প্রজিত না বলে ডুব দিয়েছিল, তুমি তো তার প্রতিশোধ নেওয়ার কথা চিন্তা করছো না?

আগে মনে হয়নি, তবে এখন আপনার কথা শুনে কি করবো তা জানি নে।

তবে আমার কথা ফিরিয়ে নিলাম।

ফিরিয়ে নেবো বললেই কি ফেরানো যায়!

এসব কথা অনেকদিন আগে হয়েছিল মেয়ে বোর্ডিঙের চত্বরের মধ্যে শিরিষ গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে অতসীর সঙ্গে। তারপরে প্রজিত অজ্ঞাতবাস থেকে ফিরে এলে, তাকে বলেছি কমা সেমিকোলন বাদ না দিয়ে। সমস্তটা শুনে প্রজিত বলেছিল, ওকে আচ্ছা জব্দ করা গিয়েছে।

আমি বললাম, ধরো ও যদি কোন সুযোগে তোমাকে জব্দ করে?

আগে তাই ভাবতাম, এখন বুঝেছি তা ওর সাধ্য নয়।

কি করে এহেন সত্যটা বুঝলে?

তবে বলি শোনো। তুমি হয়তো জানো না, খেলা করতে নেমে শেষ পর্যন্ত ও আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে।

তবে আমিও বলি শোনো, কথাটা আমি তো জানিই, আশ্রমে

এমন একজন লোকও নেই যে জানে না।

বিস্মিত প্রজিত বলল, বলেন কি!

যা সবাই জানে তাই বলি। এমন কি ঐ শিরিষ গাছটার দোলনাটাও জানে, অমাবস্যার রাত্রির অন্ধকার দুর্বোধ্য মনে করে যাতে তোমরা দুলতে দুলতে গেয়েছিলে "সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, ফুলডোরে বাঁধা দোলনা।"

ব্যাপারটা খুব ছড়িয়েছে দেখছি।

এসব কথা না ছড়ালে আর আনন্দ কিসের। তবে ভাই প্রজিত তোমাকে একটি অনুরোধ, তোমাদের এই প্রেমের খেলায় "Lines'-man"-এর দায়িত্ব থেকে আমাকে মুক্তি দাও।

ছবির প্রদর্শনীর দিকে যেতে যেতে পুরানো সেই দিনের কথাগুলি ভাবছিলাম।

একটা মানুষ-প্রমাণ ছবির কাছে খুব ভিড় জমেছে। একজোড়া সাঁওতাল বর-বধূ মুখোমুখী দাঁড়িয়ে, বিদায়ের পূর্বে কিম্বা মিলনের পরে, নীচে চিত্রকরের নাম সুরেন্দ্রনাথ কর, আরও নীচে লিখিত Sold to P. C. Mahalanobis, অনেকগুলি চিত্ররসিক নরনারী তন্ময় হয়ে দেখছে, আমিও যে চিত্ররসিক প্রমাণ করবার জন্যে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে চোখে পড়লো অতসীকে। ও এখানে কবে এলো, কেন এলো, স্বাস্থ্যের অন্বেষণে, না আর কোন উদ্দেশ্যে? এবারে ও আমাকে দেখেছে, বলল, আপনি এসেছেন দেখছি, কতদিন হল?

কতদিন নয় বলো কতক্ষণ, এই ঘণ্টা তিনেক আগে।

ততক্ষণে সে কাছাকাছি এসে পড়েছে।

আমাকে খুঁজে বের করলেন কি করে?

খুঁজতে হয়নি। তোমার ঐ লাল শাড়িখানাই যথেষ্ট। ওটা রেলগাড়ি থামাবার লাল নিশান।

আপনিও দেখছি প্রজিতদার মতো হলেন। তিনিও ঠিক ঐ কথা বলেন।

সেই তিনিটি কোথায়?

জানি নে, অন্ততঃ দার্জিলিঙে নেই।

তাই বুঝি নির্ভয় হয়েছ?

সে একটু রুক্ষ ভাবে বলল, ভয় আমি কাউকে করি না।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, প্রজিত কি জানে তুমি এখানে এসেছ?

তা কেমন করে বলবো।

তাকে বলে এসেছ কি, কলকাতায় একদিনের জন্যে গেলেও তো এক সময়ে বলে যেতে।

কি করে জানলেন?

তুমিই এক সময়ে বলেছিলে।

সে অপ্রস্তুত হয়ে বলল, তাই নাকি। তারপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, এখনি বৃষ্টি নামবে মনে হচ্ছে।

হাঁ, এখানের আকাশের মতিগতি দুর্বোধ্য, এই বৃষ্টি, এই রোদ, ঠিক মেয়েছেলের মনের মতো।

মেয়েছেলেব মনের আপনি কি বোঝেন?

বুঝি না যে শ্রীমতী অতসীব মনে দারুণ ভয় কখন প্রজিতকুমার এসে পড়ে।

কিন্তু জেনে বাখুন এখানে এসে সারাদিন ধরে খুঁজলেও আমাব দেখা পাবেন না!

এই বলে ঠিকানা লেখা একটুকরো কাগজ আমাব হাতে গুঁজে দিয়ে সে বেরিয়ে গেলো। কাগজেব টুকরো পড়ে দেখি কার্সিয়ঙের একটা ঠিকানা। ভাবলাম তাকে বলবো যে ব্যক্তি দার্জিলিঙ পর্যন্ত আসতে পারে কার্সিয়ঙও তার কাছে অগম্য নয়। কিন্তু ততক্ষণ সে ভিড়ের মধ্যে মিশে মিলিয়ে গিয়েছে। তখনি প্রজিতকে একটা জরুরি তার পাঠিয়ে দিয়ে কালীবাবুব হোটেলে ফিবে এলাম।

সারারাত অতসীর ঘুম হয়নি। সেই যে ছবির প্রদর্শনী থেকে বের হয়ে কার্সিয়ঙে চলে এসে ঘরে ঢুকেছিল, খাওয়ার ডাক পড়লেও বের হয়নি। সে কার্সিয়ঙে এসে এক বন্ধুব বাড়িতে উঠেছে। সকালবেলা উঠে শুনেছিল দার্জিলিঙে শান্তিনিকেতনের চিত্রকরদের একটি ছবির প্রদর্শনী হবে। সে কোনকালেই চিত্ররসিক নয় তবু যে প্রদর্শনী দেখতে রওনা হয়েছিল মনে ক্ষীণ আশা ছিল আশ্রমের লোকদের সঙ্গে প্রজিত আসতে পারে। প্রজিতের দেখা পায়নি বটে তবে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রবীরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার কাছে অনেক কথা শুনেছিল। অনেকের মধ্যে একটি কথাই প্রধান, সেটি প্রজিতের কথা। প্রবীরের কাছে প্রজিত সম্বন্ধে যা শুনলো তাতে

তার মন খারাপ হয়ে গেল। সেই আহত মন নিয়ে বন্ধুর বাড়িতে এসে নিজের ঘরে ঢুকলো। সারা রাতের মধ্যে বের হয়নি, বলা বাহুল্য ঘুমোতেও পারেনি।

সেই যে তাকে না জানিয়ে প্রজিত নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, তার পাল্টা জবাব দেবার উদ্দেশ্যে প্রজিতকে না জানিয়ে সে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে দার্জিলিঙে চলে এসেছিল। তার পরে প্রবীরের কাছে যা শুনলো বুঝলো হার হয়েছে তার। কেন জানি না তার রাগ হলো প্রজিতের উপরে। ভাবলো সে আর ভাববে না প্রজিতের কথা। এমন কি তার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করে দেবে। প্রবীর বলেছিল তাদের প্রেমের উপাখ্যান আশ্রমের সকলেই জানে। সে স্থির করলো প্রজিতই রটনা করেছে। আর শুধু রটনা নয়, রচনাও তার। অতসীর মন যদি সুস্থ থাকতো তবে বুঝতে পারতো রটনা হোক আর রচনা হোক তার নিজের দায়িত্বও কম ছিল না। ঐ যে যখন-তখন তুচ্ছ কারণে, বা অকারণে প্রজিতের সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা, ঐ যে দুপুর রোদে একাকী ডাকবাংলোর মাঠে গিয়ে কাঁচামিঠে আম পেড়ে নিয়ে এসে প্রজিতের বেনামদার প্রবীরের হাতে দেওয়া, প্রজিতের অনুপস্থিতিতে তার ঘরে গিয়ে টেবিলের উপরে করবী ফুলের গুচ্ছ রেখে আসা, আর প্রজিতের চক্ষুশূল লাল শাড়ীখানা পরা—এসব কিসের লক্ষণ! আর সর্বোপরি প্রজিতের চক্ষুশূল লাল শাড়ীখানা পরিত্যাগ করে গেরুয়া বসন ধারণ। এসব কিসের লক্ষণ! আর সবাই যখন তাকে বিরক্ত করবার উদ্দেশ্যে বলতো, প্রজিতদা তোমাকে না জানিয়ে গেল, সে উত্তর দিতো, না জানিয়ে যাবে কেন, আমিই তো স্টেশনে গিয়ে টিকিট কেটে তাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিলাম। আবার কেউ যখন বলতো, প্রজিতদার নাকি বিয়ে! সে দমে না গিয়ে বলতো, আমিই তো পাত্রী স্থির করে দিয়েছি।

কিন্তু এ সব তো ছায়ার সঙ্গে শত্রুতা বা মিত্রতা, লোককে বোঝানো যায় তবে মন তো বোঝে না। তাই সঙ্কল্প করলো প্রজিতের সঙ্গে দেখা হলে কথা বলবে না। তা হলেই প্রমাণ হয়ে যাবে যে অতসীর চরিত্রের একটা দৃঢ়তা আছে। এই ভাবে নিজের মনের সঙ্গে মীমাংসা করে ফেলতেই একটু শান্তি পেলো, শান্তির সঙ্গে এলো নিদ্রা, শান্তি আর নিদ্রা হাত ধরাধরি করে চলে। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল

জানে না, দরজায় ধাক্কা পড়তেই জেগে উঠল।

অতসী বলল, এতক্ষণ ডাকোনি কেন তুলসীদিদি ?

তুলসী বলল, দু'বার এসে দরজায় ধাক্কা দিয়েছিলাম, সাড়া না পেয়ে ভাবলাম থাক ঘুমোক, রাতে বোধ হয় ভালো ঘুম হয়নি।

না তুলসীদি, ঘুম ভালোই হয়েছিল তবে ঘুম আসতে দেরী হয়েছিল।

তার পরে দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, একি দশটা বেজে গিয়েছে !

এখন চলো, বসবার ঘরে এক ভদ্রলোক এসে অনেকক্ষণ বসে রয়েছেন।

নাম ধাম কিছু বলেছেন ?

জিজ্ঞাসা করিনি। ভাবলাম তুমি উঠে জিজ্ঞাসা করবে। চলো এখন।

অতসী ভেবে পায় না কে আসতে পারে। প্রবীরবাবু নিশ্চয় নয়।

সে তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে মাথায় চিরুনিটা একবার বুলিয়ে বসবার ঘরে এসে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে যায়, এ কি আপনি !

তবু ভালো যে চিনতে ভুল হয়নি।

কতক্ষণ এসেছেন ?

সে কথা জিজ্ঞাসা করো তোমার তুলসীদিদিকে।

নামটাও জেনে নিয়েছেন দেখছি।

কাজে কাজেই, যার কাছে এসেছি তার দেখা নেই, কিছু একটা পরিচয় দিতে হবে তো।

যাই, আপনার জন্যে চা নিয়ে আসি।

প্রাজত হেসে বলল, সে শ্রমসাধ্য কাজটা তোমার তুলসীদিদি করেছেন।

তাহলে নিশ্চয়ই কোথা থেকে আসছেন তাও বলেছেন।

না, সেটুকু হাতে রেখেছি, পাছে বললে দরজা দিয়ে না বের হয়ে জানলা দিয়ে পালিয়ে যেতে।

এত অবিশ্বাস কেন ?

না বলে যে চলে আসতে পারে তাকে বিশ্বাস কি !

আপনি তো একবার গিয়েছিলেন।

এটা বুঝি তারই পাল্টা ?

কি উত্তর দেবে ভাবছে অতসী, এমন সময় তুলসী ঘরে ঢুকে বলল, এতক্ষণে আপনার জিম্মাদার এসেছে, পাছে দুজনে পালিয়ে যান তাই একটা অবশ্যজ্ঞাতব্য কথা জানিয়ে রাখি, দুপুরবেলায় এখানে আহার করবেন।

আবার এত হাঙ্গামা করবেন !

তিনজনের জায়গায় চারজন মিলে খেলে এমন কি হাঙ্গামা হবে। তারপরে বিকাল বেলায় বেরিয়ে জায়গাটা একবার দেখবেন। কার্সিয়ঙেও দর্শনীয় বস্তু আছে,দার্জিলিঙ থেকে লোক এখানে আসে।

ঠিক কি বলা উচিত ভেবে না পেয়ে অতসী বলে, আমি তো দার্জিলিঙেই এসেছিলাম, তার পরে—।

তুলসী বাধা দিয়ে বলল, তারপরে কি হল সে সব কথা পরে হবে, এখন চলো চা খেয়ে নেবে।

দুপুর বেলা আহারান্তে প্রজিত ও অতসী বেড়াতে বের হল, এ সব পাহাড়ী জায়গায় সব সময়ই বেড়াবার সময়।

এবারে সুযোগ পেয়ে প্রজিত বলল, তারপরে কি বলতে যাচ্ছিলে এবারে বলে ফেলো।

না আমার কিছু বলবার নেই।

একেবারেই নেই ?

একেবারেই নেই।

তবে আমি না হয় বলি। না জানিয়ে শুনিয়ে হঠাৎ চলে আসবার কারণ কি ?

এ দাবী তো দুপক্ষেরই হতে পারে।

আমার পক্ষেরটা না হয় বলছি শোনো। এক দিনের জন্যেও কলকাতায় গেলে যে জানিয়ে যায়—

তার প্রশ্ন শেষ না হতেই অতসী বলে ওঠে, ঐ ওদিকে দেখুন উপত্যকাটা কত গভীর আর কুয়াসার চাপে কত রহস্যময়।

তোমার মনের চেয়ে নয়।

আমার মনের কথা নিয়ে গবেষণা এখন না হয় থাক।

থাকবে কেন। ওটাই তো এখন আশ্রমের সর্বজনীন গবেষণার

বিষয়।

গবেষণাটা না হয় আশ্রমে ফিরে গিয়ে হবে। এখন বেড়ানো যাক। এখানে চারদিকের পাহাড়ের ছায়া দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে আসে।

তখন ফিরলেই হবে।

তখন আর ফিরবার পথ পাবেন না।

প্রজিত বলল, অন্ধকার না হতেই যে অন্ধকার দেখছি।

ওরা পথ হারাক বা না হারাক ওদের প্রশ্নোত্তরগুলো পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। দু'জনে যখন মনের কথা গোপন করতে চায় তখন এমনই হয়। অন্ধকারে ঠোকাঠুকি লাগে প্রশ্নোত্তরগুলোর মাথায় মাথায়। হঠাৎ অতসী বলে উঠল, আমি আর চলতে পারছি না। বলেই সে বসে পড়লো, কাজেই প্রজিতকেও বসতে হল।

মনের কথা জানাজানির একটি শুভ মুহূর্ত আছে, তবে সেটা মুহূর্ত মাত্র। কখন আসে ঠিক নেই, এসেই চলে যায়। তার পরে শত চেষ্টা করলেও আর তার দেখা পাওয়া যায় না। অথচ কথাটা অতিশয় পুরাতন, যেমন পুরাতন এই নদী গিরি বন, যেমন পুরাতন এই মানব হৃদয়, যেমন পুরাতন সেই গিরি-কন্যার প্রণয়। চাই শুধু একটু আলো।

প্রজিত ও অতসীর মন অন্ধকারে হাতড়ে মরছে, কেউ কি আলো জ্বালবে না, কোথাও কি আলো জ্বলবে না!

এমন সময়ে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটলো। দূরে ওই দূরে, ওই অতি দূর দক্ষিণে হঠাৎ একঝাড় আলো ফুটে উঠল। শতশত আলোর ফুটকিগুলো মন্ত্র-বলে যেন লাফিয়ে উঠল। ওরা এর আগে এ দৃশ্য কখনো দেখেনি।

স্তব্ধ স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইলো। শিলিগুড়ি স্টেশনে, শহরে বিদ্যুতের বাতি জ্বলে উঠছে।

অজানা এই আকাশ ভরা
অতল নিতল কালো
তারই মাঝে উঠল ফুটে
শিলিগুড়ির আলো॥

॥ ১১ ॥

গুরুগৃহের সিলেবাস

গোড়ার দিকের কোন পরিচ্ছেদে বলেছি যে সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা নিয়ে আশ্রম স্থাপন করেননি রবীন্দ্রনাথ। কেবল একটি অনির্দিষ্ট আবেগে তাঁকে ঠেলে নিয়ে এসেছিল এই কাজে। যখন ছাত্রসংখ্যা পাঁচটি মাত্র ছিল, তখন পরিকল্পনার প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি। আর সেই পাঁচটি ছাত্র তাঁর সন্তান এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের সন্তান। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের হাতে ছেলেদের সমর্পণ করেছেন জেনে সন্তুষ্ট ছিলেন, কোন্ পথে তাদেব নিয়ে যাবেন সে দায়িত্ব তাঁদের নয়। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন ৫ জন ছাত্রকে নিয়ে বিনা পরিকল্পনায় চলা যায়, কিন্তু সংখ্যা যখন ৫ থেকে ৫০ এর কাছে যায়, তখন দরকার হয় পরিকল্পনার। এমন সময় ভাগ্যক্রমে ব্রহ্মবান্ধবকে পেলেন ব্রহ্মবান্ধবও ভিতরে ভিতরে নূতন পথের সন্ধানী ছিলেন। এইখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মিল। কিন্তু ব্রহ্মবান্ধবের আরও কিছু বেশী ছিল। বিদ্যালয় পরিচালনার অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর। কাজেই তাঁকে রবীন্দ্রনাথ সাগ্রহে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু নানা কারণে ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে তাঁর শেষ পর্যন্ত মিল থাকলো না। কেন অমিল হলো রবীন্দ্রনাথ নিজেই তা ব্যাখ্যা করে বলেছেন। এখানে তা বলা নিষ্প্রয়োজন। তারপরে যথাক্রমে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেন সান্যালকে তিনি ধরলেন, তাঁদের অবশ্য বিদ্যালয় পরিচালনার অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে পথে চলতে চান সে পথের নয়। তাই কিছুদিন পর তাঁদের বিদায় নিতে হলো। তখন আবার চললো লোকের সন্ধান। এবারে পেলেন অজিত চক্রবর্তীকে, যাঁর সঙ্গে পথের মিল ছিল না, কিন্তু মতের মিল ছিল। ততদিনে আশ্রমের ছাত্রসংখ্যা ৫০ পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু অজিতবাবুকে উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিলেত রওনা হতে হলো। তখন আবার লোকের সন্ধান। এবারে সৌভাগ্যক্রমে এমন একটি লোকের দেখা পেলেন, যাঁর সঙ্গে পথের ও মতের দুই প্রকার মিলই আছে। নেপালবাবুর হলো আশ্রমে প্রবেশ।

রবীন্দ্রনাথ আশ্বাস দিলেন, "বেশী দিন আপনাকে আটকাবো না।

অজিত ফিরে এলেই আপনাকে ছুটি দেবো।”

অজিতবাবু ছয় মাস পরে ফিরলেন। কিন্তু নেপালবাবুর আর ছুটি মিললো না। তিনি সুখে-দুঃখে শান্তিনিকেতনের অঙ্গীভূত হয়ে গেলেন। শান্তিনিকেতনে তথা রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে বারে বারে এমন ঘটেছে। সাময়িকভাবে এসে চিরসাময়িক হয়ে গিয়েছেন এমন লোকের সংখ্যা অনেক। প্রভাত মুখুয্যে এমনি এমন একজন ব্যক্তি।

১৮ বছর বয়সে তিনি শান্তিনিকেতন দেখতে এসেছিলেন। সেই থেকে এখন পর্যন্ত তিনি শান্তিনিকেতনের কাছেইএবংশান্তিনিকেতনের কাজেই নিযুক্ত আছেন। এখন তাঁর বয়স ৯৩ বছর। এক জীবনের কাজ রবীন্দ্র-জীবন-চরিত সমাধানের পর রবীন্দ্রবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করে চলেছেন। প্রভাতবাবুর কথা এর পরে আসবে। এখন এইটুকু বললে যথেষ্ট হবে যে, অদৃষ্টের একই জোয়ারের টানে একই সময়ে তিনি ও আমি শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম। তিনি গিয়েছিলেন দর্শকরূপে, আমি গিয়েছিলাম ছাত্ররূপে। এই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় তিনি এখন রবীন্দ্রবিদ্যা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীপুরুষ। তাঁর কাজের সহায়তার জন্য বিশ্বভারতী নিজের খরচে ২ জন সহায়ক তাঁকে দিয়েছেন। এই সময়ে শান্তিনিকেতনে ছাত্রসংখ্যা ১০০ অতিক্রম করেছে। এই কথাটা আমার মনে করার কারণ হচ্ছে আমার নম্বর ছিল ১১১। ওখানে প্রত্যেক ছাত্রকেই এরকম একটা নম্বর দেওয়া হতো। প্রয়োজন বোধ করলে হীরালালবাবু কম্বু-কণ্ঠে হাঁক দিতেন ১১১ বলে। তাতেই আমরা শুনতে পেতাম। এ থেকে বুঝতে পারা যাবে, সে-সময়ে শান্তিনিকেতনে বসবাসের পরিধি কত সংকীর্ণ ছিল।

ওখানকার ছাত্ররা ম্যাট্রিকুলেশান পাস করবে (তখনকার দিনের এনট্রান্স), এমন ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের ছিল না। তারা কী করবে, কেন আসবে, তাদের পারণাম কী হবে—এসব অবান্তর কথা তাঁর মাথায় আসেনি। কেউ চেপে ধরলে, কিংবা নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলতেন, প্রাচীন গুরুগৃহে যেমন ছাত্ররা অধ্যয়ন করতো এরাও তেমনি করবে। কিন্তু এইখানে তিনি একটা অনভিজ্ঞতাজনিত ভ্রম করলেন। প্রাচীন গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য পাস বলে কোনো পরীক্ষা ছিল না। আর ছাত্ররা বনান্তর থেকে সমিধ বহন ও কুশ কর্তন করে নিয়ে এসে গুরুর পায়ের কাছে রাখতেন। তিনি সমিধের ভার ও কুশের গুচ্ছ দেখে

খুশী হয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে হয়তো বলতেন, 'ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কৃত্য তোমার শেষ হয়েছে। এখন যাও গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ কর অর্থাৎ চরে খাও গিয়ে।' আর ইতিমধ্যে যদি গুরু দেহরক্ষা করতেন, তবে উপযুক্ত শিষ্যগণ কয়েকটি হোমধেনু তাড়িয়ে নিয়ে বাড়ির দিকে যাত্রা করতো এবং নিতান্ত অসম্ভব না হলে দু-একটি অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকেও। মহাকবি কালিদাস শকুন্তলা বিদায়ের পরে ওদের কথা বিস্তারিত বলেননি। তার কারণ বিস্তারিত বলবার উপায় ছিল না। তখন তারা গুরুভ্রাতাদের পিছু পিছু সমিধের বোঝাটি মাথায় বহন করে গুটিগুটি আশ্রম পরিত্যাগ করতো। শকুন্তলার নিতান্ত সৌভাগ্য ছিল বলেই ভারতেশ্বর দুষ্মন্তের চোখে পড়েছিল। যাক, আমার এসব কথার কোনো প্রমাণ নেই তবে ব্যাপারটা কতকটা এইরকম হতো বলে মনে করাটা অসঙ্গত হবে না। তবে আমার এই অনুমানজনিত গবেষণার পক্ষে একটি প্রমাণ, সেকালের গুরুগৃহের আজ কোথাও কোনো চিহ্নমাত্র নেই কেন। আর কিছু নয়, গুরুর দেহান্তে তাঁর আশ্রমের অন্ত হয়ে যেত। যেসব ছাত্র ব্রহ্মচর্য পাস করে গুরুকে খুশী করতে পারেনি, তারা, যার যতগুলি সাধ্য হোমধেনু তাড়িয়ে নিয়ে নিকটবর্তী আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হতো যেমন আজকালকার ছাত্ররা এক কলেজ ছেড়ে আর এক কলেজে গিয়ে ভর্তি হয়।

একালে তো তেমন চলবে না। অভিভাবক ছাত্রকে পাঠায় দু-একটা পাস করে উপার্জনশীল হতে, নতুবা কষ্ট করে পড়তে যাবে কেন। অবশেষে এই সমস্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হলো রবীন্দ্রনাথকে। তাই তিনি নেপালবাবুকে পাকড়াও করবার সময় বলেছিলেন যে, আপনাকে বেশী দিন আটকাবো না। অজিত ফিরে এলেই আপনাকে ছুটি দেবো। ২টি ছাত্রকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য তৈরী করছি। দেখা যাচ্ছে তখনই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার দিগন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমরা যে সময়ে ছাত্র হিসাবে ঢুকেছিলাম তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হাউসের চূড়াটিও দেখা যেত না।

এবারে সে-সময়কার কথা বলা যাক।

আজকালকার পঠন-পাঠনে নানারকম নূতন নূতন মেথডের নাম শোনা যায়। তার মধ্যে একটি হলো work-education (কর্মশিক্ষা)।

তবে এর একটি উপকারিতা আছে। শুধু ছাত্রটির নয়, তার পিতা-মাতারও শিক্ষা হয়ে যায়। ফুল-ফল, গাছপালা প্রভৃতি বস্তুগুলির নাম-উল্লেখ যথেষ্ট নয়। তাদেব ছবিও আঁকতে হবে ফলে অনেক জননী পুত্রকে Art স্কুলে ভর্তি করে দেয়। এর উপরে আবার আছে hometask বলে একটি বোঝা। ছাত্রদের পক্ষে খেলাধূলার আমোদ-আহ্লাদ যে অবশ্যকবণীয় সে কথাটা ভুলেই গিয়েছেন প্রশ্নকর্তাব দল। কিছুদিন আগে প্রধান মন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন, hometask এত ভারী হয়, সেই বোঝাব ভাব ছাত্রদের পক্ষে ভীতিকব। আজকের এই পঠন-পাঠন ব্যবস্থাব মধ্যে আনন্দের স্থান নেই। আজকের যুগের ছাত্রদেব সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করি না।

এবারে আমাদেব আমলের শান্তিনিকেতনে শিক্ষাবস্থার একটা চিত্র দেওয়া যাক। কোনো একটা উপলক্ষ্য পেলেই রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের শুনিয়ে দিতেন যে তোমরা পরীক্ষা পাস করবাব জন্য এখানে আসোনি। তার জন্য দেশে শত শত বিদ্যালয় আছে। তবে কখনো তাঁব মুখের উপব প্রশ্ন করিনি—পরীক্ষায় পাস করবার জন্য আসিনি বটে, তবে কী জন্য এসেছি? আমরা নিজেরাই মনের মধ্যে উত্তরটা তৈবী করে নিতাম। মনে পড়তো রবীন্দ্রনাথের একটা গান

"মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ
জানিসনে কী ভাই,
তাই মোরা কাজকে কভু না ডরাই।"

আজকের work in education-এব উত্তর তিনি দিয়েছিলেন joy in education। আনন্দহীন শিক্ষা নিষ্কাষিত-রস-ইক্ষুদণ্ড-চর্বণ।

সিলেবাস (syllabus) বলে আমাদের কিছু ছিল না। ববীন্দ্রনাথের তিনখানা নাটককে আমরা syllabus বলে গ্রহণ কবেছিলাম। "শারদোৎসব" "অচলায়তন" আর "ফাল্গুনী"। "ফাল্গুনী" নাটকটির বচনাকালে নাম ছিল বসন্তোৎসব। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত নাটকগুলিকে বিভিন্ন ঋতুর বার্তাবহরূপে ব্যাখ্যা করা চলে, যেমন অচলায়তন গ্রীষ্মের বার্তাবহ। ডাকঘর হেমন্তের বার্তাবহ আর রক্তকরবী শীতের বার্তাবহ। লক্ষ্য করবার মতো, শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার আগে যেসব নাটক লিখেছিলেন, তাদের এভাবে ব্যাখ্যা করা চলে না। তখন বিদ্যালয় হয়নি বলে syllabus-এর প্রয়োজনও

হয়নি। পূর্বোক্ত নাটকগুলির সমস্তই শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার ফল ও ফলশ্রুতি।

এর মধ্যে শারদোৎসব, অচলায়তন ও ফাল্গুনী নাটক তিনখানাকে আদর্শরূপে ধরে আমাদের মনের উপরে কীভাবে syllabus-এর অভাব পূর্ণ করতো তা ব্যাখ্যা করতে পারি। গোড়াতেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নাটক তিনখানি রিহার্সেলের সময় আমাদের ছুটি হয়ে যেত। কবি ইচ্ছে করেছিলেন যে আমরা সবাই নাটক-খানার রিহার্সেল দেখি ও যার যেমন সাধ্য, ওদের থেকে রস আদায় করে নিই। তবে এ তিনখানার মধ্যে একটু প্রভেদ ছিল। প্রভেদ ছিল এই যে 'শারদোৎসব' ছিল পূজার ছুটির syllabus, আর 'ফাল্গুনী' ছিল বসন্তের (গ্রীষ্মের) ছুটি। আজকালকার ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকগণ আমার এই ব্যাখ্যা শুনে বিস্মিত হয়ে যাবেন। এই বিস্ময়ের প্রথম কারণ নাটকের রিহার্সাল দেখবার জন্য ছুটি হয়ে যায়, এ কেমন বিদ্যালয়? বিস্ময়ের দ্বিতীয় কারণ, যখন তাদের মনে পড়তো যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে স্কুলে পড়েননি, কাজেই ইস্কুলের মর্যাদা ও নর্ম বুঝবেন কী করে! এ যে পড়াশোনার নামে ছেলেখেলা। তখন তাদের মনে করিয়ে দিতে চাই—পড়াশোনাকে তারা কাজ মনে করে না।

"মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ
জানিসনে কি ভাই",
তাই মোরা কাজকে কভু না ডরাই।"

যদি তারা কাজ মনে করে, তবে এহেন syllabus-কে মনে করতে হবে joy in education. রবীন্দ্রনাথের কাছে জ্ঞানের চেয়ে আনন্দের মূল্য বেশী ছিল। সেই জন্য তিনি চেয়েছিলেন আমাদের দেশের কচি ছেলেগুলোকে অবাধ আনন্দের মধ্যে ছেড়ে দিতে।

গানে ও আনন্দে রসিয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার syllabus। জ্ঞানের পাল্লায় যদি কিছু কমতি হয় তাতে তিনি ভীত হতেন না, ভীত হতেন আনন্দের পাল্লা হাল্কা হয়ে গেলে। সে আমলের শান্তিনিকেতনের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, এই অভাবিত দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যেতেন তাঁরা। এখন অবশ্য বিস্ময়ের আর কিছু নেই। কারণ সে ঢিলেঢালা জীবনচিত্রের গঠন অনেকটা আলগা হয়ে গিয়েছে।

নাটকের রিহার্সাল দেখার জন্য ছুটির অনুরূপ আর একটা দৃষ্টান্ত আছে। 'আশ্রম সম্মিলনী' বলে একটা সংস্থা ছিল। তাতে ছাত্র শিক্ষক সকলেরই ছিল অবাধ প্রবেশ। রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকলে তিনি হতেন সভাপতি। এই সম্মিলনীর দুটি অধিবেশন হতো। একটি অমাবস্যায় আর একটি পূর্ণিমাতে।

অমাবস্যার সম্মিলনীতে কিছু কাজের কথা, কিছু অভাব-অভিযোগের কথা বলতো ছেলেবা। আর পূর্ণিমার সম্মিলনীতে নিছক আনন্দের বিতরণ। গান, ছোটোখাটো নাটক—তার আবার অনেকগুলি ছাত্রদের রচিত। অবশ্য গানটা নয়, গানের উপরে কাউকে হাত দিতে দিতেন না তিনি। তবে গাইবাব ভার ছিল ছাত্রদের। পূর্ণিমার আলোয় যখন আকাশ উথলে পড়ছে, ফুলের গন্ধে বাতাস মাতাল হয়ে উঠেছে, তখন কি কাজের কথা বলবার উপযুক্ত সময়? শান্তিনিকেতনের সেই আনন্দময় চিত্র যাঁরা না দেখেছেন, তাঁরা দেখেননি শান্তিনিকেতনকে। তখন গানের বৈতালিক সুরে ছাত্রদের হতো উদ্বোধন, আবার রাত্রে আহারান্তে সেই বৈতালিকের দল ধরতো সুষুপ্তির গান। এ ছাড়া যে কোনো উপলক্ষ্য আসুক না কেন, গান অপরিহার্য ছিল। পরবর্তীকালে সেই গানের প্রদীপগুলি নিভে গিয়েছে। তাই আদি আমলের সঙ্গীতশিক্ষক পণ্ডিতজী অনেকদিন পর আশ্রমে ফিরে এসে যখন দেখলেন যে গান নিভে গিয়েছে, তিনি বিস্মিত ভাবে তাঁর প্রিয় ছাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "অমিতা, গান গেল কোথায়?" তাঁর খেয়াল হলে বুঝতে পারতেন, রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের সঙ্গে গানের উৎস শুকিয়ে গিয়েছে।

এই আবহাওয়াব মধ্যে আমরা শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলাম। শিক্ষায় যে ত্রুটি হয়নি তার কারণ আর দশটা বিদ্যালয়ের ছাত্ররা যে হারে পরীক্ষায় পাস হয়, আমরাও সেই হারে পরীক্ষায় পাস হয়েছি। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে বাপু হে, এই যে গানের মধ্যে হাবুডুবু খেয়েছ, রিহার্সাল শুনে পড়া হোল ভেবে মনে সান্ত্বনা পেয়েছ, গান গাইতে গাইতে চলেছ,

"পারুল দিদির বনে মোরা চলব নিমন্ত্রণে
চাঁপাভায়ের শাখার ছায়ের তলে
মোরা সবাই জুটেছি।"

প্রশ্নটা হচ্ছে, কিন্তু ততঃ কিম্? তোমাদের মধ্যে কেউ বৈজ্ঞানিক সত্যেন বোস হওনি, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার হওনি, আবার ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের মতো কবিও হও নি, তবে কীভাবে তোমরা লাভবান হলে? শুধুই পরীক্ষা পাস—সে তো অন্য দশটা বিদ্যালয়ের ছেলেরাও পাস হয়। তফাৎটা কোথায়? এ এমন বস্তু নয় যা তৌল করে দেখানো যায়; গজদরে, মণদরে কোনো রকমেই এর মীমাংসা হয় না। তবে এই আনন্দে যাদের অভিষেক হয়েছে তারা ধন্য হয়ে গিয়েছে। এই যে পুরানো সেই দিনের কথা লিখছি, তার মধ্যে কি আনন্দের সেই ছিটেফোঁটা নেই? শারদোৎসব নাটকের গানে যখন শুনি

"ঝরা মালতীর ফুলে
আসন বিছানো নিভৃত কুঞ্জে
ভরা গঙ্গার কুলে
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে
তোমার চরণমূলে।"

এই সিক্ত স্নিগ্ধ শুভ্র চিত্রটি তুলির টানের পরে টানে একটি পরিপূর্ণ শরৎ-প্রভাতের জগৎ মনের মধ্যে সৃষ্টি করে তোলে না কি! তা যদি তোলে, এমন আর কোন্ syllabus আছে যাতে দ্রষ্টা ও দৃশ্যকে একাত্ম করে তুলতে পারে!

আর শারদোৎসবে উপানন্দ সেই ছাত্র যার জ্ঞানের পাল্লা যত ভারী হচ্ছে, আনন্দের পাল্লায়ও ততই হচ্ছে কমতি। অচলায়তনের পঞ্চক হচ্ছে বিদ্রোহী তরুণ, তার মুখে সর্বদা গান

"হারে রে রে রে আমায় ছেড়ে দে রে দে রে,
যেমন ছাড়া বনের পাখী মনের আনন্দে রে।"

আর ফাল্গুনীর দাদা যিনি মুদির দোকানে বসে যদৃষ্টং উল্লিখিতং করেন, তিনি হচ্ছেন—যাকে আমরা বলি আদর্শ শিক্ষক। তিনি কালভ্রষ্ট হয়ে এযুগে জন্মগ্রহণ করলে যে কোনও মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষক হতে পারতেন এবং হয়তো রাষ্ট্রপতির পদকও পেয়ে যেতেন। Work-education তাঁর কাছে আদর্শ শিক্ষা-পদ্ধতি। তিনি চৌপদী লিখে বোঝাতে চেষ্টা করেন:

"সময় কাজেরই বিত্ত, খেলা তাহে চুরি
সিঁদ কেটে দণ্ড পল লহ ভূরি ভূরি

কিন্তু চোরাধন নিয়ে নাহি হয় কাজ
তাই তো খেলারে বিজ্ঞ দেয় এত লাজ।”

খেলাটা তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। এরকম ‘আদর্শ শিক্ষক’ শান্তিনিকেতনে কখনো যে না এসে জুটেছেন তা নয়, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শান্তিনিকেতনে তৎকালীন শিক্ষার আদর্শকে টলাতে পারেননি।

এখানে আমি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে বসিনি। লিখতে বসেছি শিক্ষাপদ্ধতির বহিরঙ্গের চিত্র। তাকে আর বেশী দূর টেনে নেওয়া উচিত হবে না। আমরা খেলতে খেলতে, নাটকের রিহার্সাল দেখতে দেখতে আর নাটকের গান শুনতে শুনতে কখন যে পরীক্ষা পাস করে গিয়েছি তা মনেও পড়ে না। হয়তো জ্ঞানের দিকে পাল্লায় কিছু ঘাটতি হয়েছে। তবে আনন্দের দিকের পাল্লায় যে কমতি পড়েনি তা নিশ্চয় করে বলতে পারি।

॥ ১২ ॥

সাহেব

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পরে মাসখানেকের মধ্যে শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া সম্পূর্ণ বদলে গেল। বাংলাদেশের এক প্রান্তে যা ছিল এক নগণ্য বিদ্যালয়, তা হয়ে দাঁড়ালো সব বিদ্যালয়ের অগ্রগণ্য। ভারতের সব প্রান্ত থেকে আসতে লাগল দর্শক, আসতে লাগলো ছাত্র, আসতে লাগলো কৌতূহলী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র জনপদ কাজে কাজেই বৃহৎ আকার ধারণ করলো। নূতন নূতন ঘর ও ইষ্টকালয় উঠতে লাগলো। বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয় ভারতের সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান-রূপ ধারণ করলো। এইসব নবাগতদের মধ্যে বিদেশীর সংখ্যাও কম নয়। বিদেশ থেকেই এসেছে তাঁর সর্বজনবাঞ্ছিত সম্মান। ফলে কৌতূহলী বিদেশীগণ যে আসবে তাতে আর অসম্ভবটা কী?

ভারতের বৃটিশ শাসকগণও শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে নূতন ধারণা পোষণ করতে শুরু করলো। আগে যারা সন্দেহের চোখ নিয়ে আসতো এখন তারাই সম্মানের চোখ নিয়ে আসতে শুরু করলো। তখন ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ। লোকটি শিক্ষিত এবং গুণগ্রাহী। শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহকে উস্কে দেবার মূলে ছিলেন তাঁর বন্ধু রেভারেণ্ড সি এফ এণ্ড্রুজ। বস্তুত এই অধ্যায়টি সি. এফ. এণ্ড্রুজের শান্তিনিকেতনী জীবনের বিবরণ। কথিত আছে যে, লর্ড হার্ডিঞ্জ রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত করতে ইচ্ছা করেছিলেন। তাকে নাকি তৎকালীন বাংলাদেশের গভর্নমেণ্ট জানিয়েছিল আপত্তি। লর্ড হার্ডিঞ্জ বললেন, বাংলা গবর্ণমেণ্ট কবির সম্বন্ধে যে ধারণাই পোষণ করুক, আমি তাঁকে 'রাজকবি' নামেই ভূষিত করবো। শোনা যায় এর মূলেও ছিলেন সি. এফ. এণ্ড্রুজ। এণ্ড্রুজ সম্বন্ধে অনেক কথাই আজ সুবিদিত, অবিবৃত অংশ এখানে বললে অন্যায় হবে না। এণ্ড্রুজ ছিলেন খৃষ্টীয় পাদ্রী। এসেছিলেন অধ্যাপকরূপে St Stephen College-এ। এ ১৯০৪ সালের কথা। তখন থেকেই প্রধানতঃ 'মডার্ন রিভিউ' মাসিক-পত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাদি পড়ে তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নূতন ভাবে

চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু তার অনেক পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর চাক্ষুষ পরিচয় ঘটলো।

১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন বিলেত যান, তখনই বিলেতের গুণগ্রাহী ব্যক্তি ও কবিরা তাঁকে যেন একেবারে লুফে নিল। বিলেতের প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী রদেনস্টাইন হলেন রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহীদের মধ্যে প্রধান। তৎকালীন শিক্ষিত ও সাহিত্যিকদের উপরে তাঁর ছিল অসামান্য প্রভাব। তাঁর প্রস্তাবেই তৎকালীন ইংরেজ কবিদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ইয়েটস্ ইংরাজী গীতাঞ্জলির ভূমিকা লিখতে সম্মত হয়েছিলেন। রদেনস্টাইনের বাড়িতে ইংরেজ কবিদের একটি মজলিস হলো। তাতে ইয়েটস্ রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা পাঠ করলেন। শ্রোতাদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন, যাঁদের নাম করে গুণগান করবাব প্রয়োজন নেই। তাঁরা তখনই নিজগুণে প্রাধান্য লাভ করেছেন। সেই শ্রোতাদের মধ্যে একজন ছিলেন সি. এফ. এণ্ড্রুজ। তিনি কবিতাগুলি শুনে মুগ্ধ হলেন, বিচলিত হলেন এবং নিজের অগোচবে রবীন্দ্রনাথের পার্ষদ হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতা নিজে লিখে গিযেছেন। সভা ভেঙে যাবার পরে তিনি নীরবে বেবিয়ে পড়ে লণ্ডনের পথে পথে অবিস্মরণীয় একটি ছত্র আবৃত্তি করে ঘুরতে লাগলেন। "On the see-shore of the world children play ; জগৎ-পারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা।" কতক্ষণ তাঁর এই তন্ময় ভাব ছিল বলা যায় না। যখন তাঁর চোখে পড়লো রাস্তার একটা ঘড়ি, দেখলেন রাত তিনটে। সেটা জুন মাস। রাত তিনটে মানে মধ্যরাত। এই অভিজ্ঞতা বর্ণনা উপলক্ষে তিনি কীট্‌সের একটি Sonnet-এর Chapman অনূদিত Homer-এর একটি ছত্র প্রায়ই বলতেন। সেই অনুবাদ পড়ে Keats-এর মনে হয়েছিল যেন তিনি একটি নূতন জ্যোতিষ্ক আবিষ্কার করলেন। তারপরে যথাসময়ে ইংরাজী গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হলো। ইংরাজ সাহিত্যসমাজ রবীন্দ্রনাথকে, তখন তিনি একজন বিদেশী অজ্ঞাতপূর্ব কবি মাত্র, সসম্মানে এবং সমাদরে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করলেন। যাঁরা গ্রহণ করলেন এণ্ড্রুজ তাঁদের অন্যতম। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁদের অনেকের সম্মানের আবেগ মন্দীভূত হয়নি। এণ্ড্রুজেরও হয়নি, বরঞ্চ বেড়েছে। তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা আমার পরোক্ষ জ্ঞান নয়,

একেবারে প্রত্যক্ষ। আমাদের ইংরাজী পড়াবার সময় একাধিকবার তাঁর প্রথম রবীন্দ্রকাব্য শ্রবণের অভিজ্ঞতা শুনিয়েছেন। যখন তিনি লণ্ডনের মধ্যরাত্রে পথে On the seashore of the world আবৃত্তি করতে করতে ঘুরছিলেন, তখন কি তিনি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন যে, একদিন যে সমুদ্রতীরে শিশুরা খেলা করে, সেইরকম একটা সমুদ্রতীরে তাঁকে এসে স্থায়ী বাসা বাঁধতে হবে।

আগেই বলেছি যে, Nobel পুরস্কার প্রাপ্তির পরে সরকারী-বেসরকারী অনেক সাহেব শান্তিনিকেতনে আসতেন। বাংলার লাটদের ওখানে আসা একটা নিয়মিত রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে এণ্ড্রুজকে মিলিয়ে ফেললে চলবে না। তৎসত্ত্বেও শান্তিনিকেতনের অধিবাসীদের কাছে এণ্ড্রুজই ছিলেন একমাত্র সাহেব। সাহেব বলতে এণ্ড্রুজ ছাড়া আর কাউকে বোঝাত না। এণ্ড্রুজের সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর বন্ধু পিয়ার্সন সাহেব। লোকে তাঁর উল্লেখ করতো পিয়ার্সন বলে। কিন্তু সাহেব বললেই লোকে বুঝতো এণ্ড্রুজকে। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে ওখানকার নিম্নতম ভৃত্যটি পর্যন্ত সাহেব বললেই এণ্ড্রুজকে বুঝতো। রবীন্দ্রনাথকে স্বকর্ণে বলতে শুনেছি, দেখ তো হঠাৎ সাহেব এসে উপস্থিত হলো, তাকে কোথায় বা থাকতে দি, কি-ই বা খেতে দি, এদিকে বৌমা কলকাতায় গিয়ে বসে আছেন। বড়বাবু (রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ অগ্রজ) তাঁর সেবক মুনীশ্বর বা গোষ্ঠকে বলছেন, ওরে, যা যা, শীগ্‌গির গিয়ে সাহেবকে ডেকে নিয়ে আয়। তারা জানতো কোন্ লোকটিকে ডেকে আনতে হবে। শান্তিনিকেতনে একাধিক শাস্ত্রী ছিলেন কিন্তু 'শাস্ত্রীমশাই' বলতে যেমন বিশিষ্ট একজনকেই বোঝাত, সাহেব বলতেও সেইরকম একজনকেই। রবীন্দ্রনাথ আবার অনেক সময় স্নেহ করে বলতেন, পাগলটাকে নিয়ে আর পারি না। এই পাগলের কাহিনী শান্তিনিকেতনের খাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে, আপাতত এখানে কালির অক্ষরে।

একদিন আমবাগানে এক সভা হলো। উপলক্ষ এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সনের দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা। উদ্দেশ্য মিস্টার গান্ধীকে (তখনো তিনি মহাত্মা হননি) সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সাহায্য করা। গোখলের পরামর্শে এণ্ড্রুজ দক্ষিণ আফ্রিকায় চলেছেন। সঙ্গে তাঁর

অবিচ্ছেদ্য বন্ধু পিয়ার্সন। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীতে যোগাযোগ ঘটলো। ঘটালেন এণ্ড্রুজ। তার ফলে তিনে-এক একে-তিন হয়ে দাঁড়ালো। একজনের কথা বলতে গেলেই আর দুজনের কথা আপনিই এসে পড়ে। কিছুকাল পরে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে যখন এণ্ড্রুজরা ফিরলেন, তখন পায়ের আঘাতে তিনি অনেকটা পঙ্গু। ওখানে কাউকে সম্বর্ধিত করতে গেলে মাটিতে আসন দেওয়া হতো। বসতে কষ্ট নেই, কিন্তু উঠে দাঁড়াতে কষ্ট। রবীন্দ্রনাথ পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে এক হাতে এণ্ড্রুজের আড়াই-মণি দেহটাকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তখন ঘটনাচক্রে দেখলাম রবীন্দ্রনাথের কী বিরাট পালোয়ানী দেহ। বাল্যকালে কানা পালোয়ানের কাছে শিক্ষা বিফলে যায়নি। শান্তিনিকেতনে কোনো নবাগত অতিথি গেলে হয়তো প্রথমেই তাঁর চোখে পড়তে পারতো, এক বৃদ্ধকে রিকশায় করে টেনে নিয়ে চলেছেন এক সাহেব। পরনে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির আবার সবগুলো বোতাম আটকানো নেই। এই সাহেব এণ্ড্রুজ, আরোহী বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ। তখন তাঁর চলাফেরা করতে অসুবিধা হয়। এই রিকশাচালক আর রেভারেণ্ড নন, নিছক এণ্ড্রুজ সাহেব। এণ্ড্রুজের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আরো বলতে হবে। আপাতত এইটুকু।

না, এখানেই পোশাক-পরিচ্ছদের বিষয়টা সেরে নেওয়া যাক। কারণ বিজ্ঞজনের মতে শরীরের চেয়ে পোশাক-পরিচ্ছদের মূল্য বেশী। ওগুলো ঝুলিয়ে রাখবার জন্যই দেহটার দরকার। দেহটা না থাকলে ওগুলো ভাঁজ করে আলমারিতে তুলে রাখতে হতো। এণ্ড্রুজ এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন। পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব অমনোযোগী হওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল। আমার এক বন্ধুর কাছে শুনেছি একদিন নিতান্ত জীর্ণ এক কোট গায়ে দিয়ে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। কথাবার্তা ও চা-পানের পরে বন্ধু বললেন, আমার একটা ফালতু নূতন কোট আছে, সেটা তুমি ব্যবহার করতে পারো। সাহেব বললেন, 'দাও না', বলে কোটটা ভাঁজ করে নিয়ে চলে গেলেন। কয়েকদিন পরে আবার বন্ধুর সঙ্গে তাঁর দেখা হলে বিস্মিত বন্ধু সেই জীর্ণ কোটের অভ্যন্তরে এণ্ড্রুজের দেহটাকে দেখে শুধোলেন, সেই কোটটা কী হলো? গায়ে দাওনি কেন? এণ্ড্রুজ অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে

বললেন, কী হয়েছে জানো? আমি একটা লোককে দেখলাম, তার গায়ের কোটটা অত্যন্ত জীর্ণ। তাকে তোমার কোটটা দিয়ে দিলাম। সে খুশী হয়ে নিয়ে প্রস্থান করলো।

আমার বন্ধু তো নির্বাক। আর দেবার মতো নূতন কোট তাঁর ছিল না।

এণ্ড্রুজ দিল্লী যাবেন, একটা কম্বলের দরকার। সুধাকান্তদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি অতিরিক্ত একটা কম্বল হবে? দিল্লীতে খুব শীত। জানো সে কথা?

সুধাকান্ত যেন তা জানতেন না। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর একমাত্র কম্বল এণ্ড্রুজের হাতে সমর্পণ করলেন। কয়েকদিন পরে এণ্ড্রুজ এসে একটা কম্বল সুধাকান্তদাকে দিয়ে বললেন, এই নাও তোমার কম্বল।

সুধাকান্তদা কম্বলটি দেখে বললেন, এ কি করছো সাহেব? এ যে খুব দামী জিনিস, এ তো আমার কম্বল নয়।

সাহেব নির্বিকার ভাবে বললেন, বোধ হয় বদল হয়ে গিয়েছে, তা হোক, এতেই তোমার শীত নিবারণ হবে, এটা রাখো।

আর একটা ঘটনা শুনেছি। সাহেব রেল স্টেশনে যাবার সময় হাতের কাছে যে কোটটা পেলেন, সেইটা গায়ে চড়িয়ে রওনা হলেন। চলন্ত রেল গাড়িতে উঠে দেখলেন কোটের পকেটে টিকিট নেই। বলা বাহুল্য যার বাড়িতে তিনি অতিথি হয়ে ছিলেন সটিকিট সেই কোট তখনো আলনায় ঝুলে আছে। কীভাবে টিকিটের সমস্যার সমাধান হলো সেটা আর জানি না। আরো একটা কম্বলরহস্য জানি। রবীন্দ্রনাথের কোনো চিঠিপত্রে পড়েছি যে বাড়িতে তিনি উঠেছিলেন তাদের গোটা দুই কম্বল চেয়ে নিয়ে সাহেব তো শুয়ে পড়লেন। কিন্তু মাঝরাতে দারুণ শীতে তাঁর মনে হলো, আমি তো বেশ আরামে ঘুমোচ্ছি। যাঁদের কম্বল নিয়েছিলাম তাঁরা নিশ্চয় শীতে কষ্ট পাচ্ছে। তখন তিনি যে উপায়টি আবিষ্কার করলেন সেটা বোধ করি খৃষ্টীয় সমাধান। কিন্তু আর কোনো উপায়ে ব্যাখ্যা করা চলে না। তিনি কম্বল দুটো গুটিয়ে নিয়ে বাইরের ঘোরতর শীতে বসে রাত কাটিয়ে দিলেন। ভোরবেলায় রবীন্দ্রনাথ ব্যাপারটা জানতে পেরে বললেন, এ কী হলো, তুমি খামোকা শীত ভোগ করলে, আবার যাদের কম্বল

নিয়েছিলে, তাদেরও শীত নিবারণ হলো না।

সাহেব অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বললেন, কী করবো, তাদের ঘরে জানালা-দরজা বন্ধ। বিশেষ স্বামী-স্ত্রীতে শুয়ে আছেন। দরজা খোলা পেলেও ঢোকা উচিত হত না। আপাতত এইটুকুই যথেষ্ট, পবে আরো বলবার সুযোগ পাবো।

শান্তিনিকেতনে এণ্ড্রুজ কোনো বিশেষ পদাধিকারী ছিলেন না। সুতরাং তাঁর কাজের অভাব হতো না। পায়খানাগুলো নিয়মিত পরিষ্কার হচ্ছে কি না, হাসপাতালে রোগীরা যথাসময়ে পথ্য পাচ্ছে কি না, ছাত্রদের শোবার ঘরে জল পড়ে কি না, এমন কত আর বলবো!

একবার একটা অদ্ভুত কাজের দায়িত্ব তাঁব উপর এসে পড়লো। ছাত্রদের অনেকের বেতন বাকী। চিঠি লিখে বেতন পাওয়া দূরে থাক, ডাকমাশুলের খরচটাই বৃথা যায়। তখন একজন প্রবীণ অধ্যাপকেব মাথায় বুদ্ধির বিদ্যুৎ চমকে গেল। তিনি ভাবলেন সাহেবকে দিয়ে তাগিদ দেওয়া যাক। সাহেবের স্বাক্ষর দেখলে পরাধীন দেশের অভিভাবকদের মনে বেতনটা যে অবশ্য দেওয়া আবশ্যক এই সদ্‌বুদ্ধি জাগ্রত হতে পারে। সাহেব তো কাজ চান। সারা দুপুর বসে অজস্র তাগিদপত্র লিখলেন। কিন্তু আশানুরূপ ফল ফললো না। অভিভাবকদের অনেকে শান্তিনিকেতনে এসে সাহেবকে দেখে গিয়েছে। যখন অভিভাবকরা টাকার থলি খুলছে, তখন পূর্বোক্ত সকলে বললো, আরে এ সাহেব সে সাহেব নয়। এ খদ্দরের ধুতি পরে, খালি পায়ে চলে, আবার দেখা হলে হেসে কথা বলে। এই কথা শুনে টাকার থলির মুখ বন্ধ হয়ে গেল। প্রবীণ অধ্যাপকের বুদ্ধির বিদ্যুৎচমক ফলপ্রদ হলো না।

এখানে শান্তিনিকেতনে বেতন আদান-প্রদানের বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। নিয়ম ছিল অভিভাবকরা সরাসরি অফিসে বেতনাদি পাঠাবে। ছাত্রদের সঙ্গে এই আদান-প্রদানের কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিছুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে অভিভাবকরা বুঝলো, বেতন না দিলেও চলে। কারণ এ তো আর দেশের আট-দশটা হাই স্কুলের মতো নয়। এ প্রাচীনকালের আশ্রম, যেখানে গুরুগৃহে বাস করে ছাত্ররা বিনামূল্যে শিক্ষা ও খাদ্য পেতো। এও তো গুরুগৃহ। কারণ

সকলের মুখেই গুরুদেব শব্দটা শুনতে পাওয়া যায়। আর যাদের তাঁকে দেখবার সুযোগ হয়েছে, তারা বুঝে নিয়েছে ইনি প্রাচীনকালের গুরুদেরই একজন। তবে নিতান্ত একটা বেতন ধার্য না করলে সরকারে আপত্তি করতে পারে। তাগিদ আসছে, আসুক। টাকা পাঠানোটা প্রাচীন গুরুগৃহে ঐতিহ্যের প্রতি অবমাননা। আর আগেই তো বলেছি অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানালো, এ সাহেব সে সাহেব নয়।

একবার কোনোরকমে ভর্তি হতে পারলে বিদ্যাভারে বোঝাই না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রদের নিয়ে আসা কিছু নয়। একবার একটি ঘটনা যা স্বচক্ষে দেখেছি বর্ণনা করছি। ছাত্রটির বাড়ি বর্ধমানে। ইস্কুল খোলবার কয়েকদিন আগে তার দারুণ ম্যালেরিয়া জ্বর হলো। বন্ধুগণ এসে পরামর্শ দিলো, চিকিৎসা যা করছো করাও কিন্তু কোনোরকমে একবার আশ্রমের হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে একটা বিছানায় শুইয়ে দিতে পারলে তুমি দায়মুক্ত হলে, ওরা কর্তব্যের দায়ে তোমার পুত্রকে সুস্থ করে তুলতে বাধ্য হবে। এমন কত হয়েছে বলে দু-দশটা নামের উল্লেখ করলেন। যাদের অনেকেই অজাত ও মৃত।

এদিকে আবার ছাত্রটির অনেক কয় মাসের বেতন বাকী। তারপর পিতা দেখলো এহেন উৎকট সমস্যার এমন সরল সমাধান আশার অতীত। ছাত্রটিকে রেলগাড়িতে চাপিয়ে বোলপুর স্টেশনে নামানো হলো। তখন সে ১০৪°-১০৫° জ্বরে হি হি করে কাঁপছে। বন্ধুরা সতর্ক করে দিয়েছিল, দেখো, হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে একটা বিছানায় শুইয়ে দেবার আগে যেন কোনো অধ্যাপকের চোখে না পড়ে। ওটা প্রাচীন গুরুগৃহ হলেও দু-একজন বেয়াড়া মাস্টার আছে, যারা প্রাচীনও নয় আবার গুরুগৃহোচিতও নয়। রুগ্ন ছাত্রটির পিতা জিজ্ঞাসা করলো, তাদের চিনবো কী করে, উত্তর শুনলো, তারাই তোমাকে চিনে নেবে। ওইটুকু সাবধান হতে হবে। চিনবার আগে তাঁর ছেলেকে হাসপাতালশায়ী করে ফেলতে হবে। রুগ্ন ছাত্রটির পিতা দেখলো, একে গরুরগাড়ি করে নেওয়ার চেয়ে কোনো বলবান কুলীর পিঠে করে নিয়ে যাওয়া অনেক সুবিধে। গরুর বুদ্ধির চেয়ে মানুষের বুদ্ধি বেশী এরকম একটি সংস্কার লোকটির মনে ছিল। কুলীকে বুঝিয়ে দিল, দেখো একে সোজা হাসপাতালে নিয়ে একটা খালি বিছানায় শুইয়ে দিতে হবে। যাতে কোনো মাস্টারের চোখে

না পড়ে যায়।

কুলীটি অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সে আগেও হয়ত এই কাজ করেছে। বলল, বাবু আমাকে আর বলতে হবে না। যত ভয় ঐ গজদা-নন্দবাবুকে, (ওটা জগদানন্দ শব্দের কৌলিক রূপ)। রোগীর ভারে পিঠ-বাঁকা কুলী চলেছে। আর নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে পিছনে চলেছে তার পিতা। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত হয়—এ কেবল প্রবাদ নয়। হাসপাতালে ঢোকবার কিছু আগেই স-কুলী পুত্রটি পড়বি তো পড় জগদানন্দবাবুর চোখেই পড়লো। তিনি অমনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, এর তো অনেক ক'মাসের মাইনে বাকী। আবার পিঠে করে এনেছো কেন?

কুলী ভয়ে ভয়ে বললো, বাবু জ্বরে একেবারে বেহুঁশ।

পিছনে থেকে এই দৃশ্য ও কথাবার্তা শুনে বেহুঁশ পুত্রের হুঁশিয়ার পিতা সরে পড়েছে। জগদানন্দবাবু কুলীকে হুকুম করলেন, যাও এখান থেকে পালাও।

কুলী সবিনয়ে বললো, হুজুর, আমার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে এখানে বিছানায় এনে শুইয়ে দিলে পাঁচ টাকা পাবো। সেটা কে দেবে? উত্তর শুনলো, যার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে।

কুলী—হুজুর, আমি রুগী ফেরত নিয়ে যাচ্ছি। টাকাটা আপনারা দিলেই ভালো হতো, কারণ ও বাবুকে আমরা চিনি। অনেকবার চুক্তি করে ঠকেছি।

এ ঘটনা জনশ্রুতি বা কিংবদন্তী নয়। অনেকটাই আমার চোখে দেখা। এই ছিল তখন শান্তিনিকেতনের বেতন আদান-প্রদানের প্রণালী।

শান্তিনিকেতনে সাহেবের কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। তার প্রধান কারণ তাঁর বাসের কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না। আজ দক্ষিণ আফ্রিকা, কাল ফিজি, পরশু অস্ট্রেলিয়া, পরদিন ইংল্যাণ্ড, হঠাৎ একদিন এসে উপস্থিত হলেন ভারতে। এদেশে তাঁর দুটি আশ্রয় ছিল, একটি শান্তিনিকেতন আর একটি সাবরমতী। শান্তিনিকেতনে এসে উঠলেন বেণুকুঞ্জে, কিংবা দ্বারিকের একতলায়, কিংবা রতনকুটিতে। তবে তাঁর নির্দিষ্ট বাসস্থান না থাকুক, নির্দিষ্ট ছিল একটি বাহন, নাম তার জহুরা। সে একাধারে বাবুর্চি, খানসামা—সাহেবের অভিভাবক।

লোকটাকে সর্বাঙ্গসম্পন্ন বলতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু তা বলতে পারি না। তার একটা চোখ কানা ছিল। আর গায়ের কোটটার বয়স এবং লোকটার বয়স সমান ছিল বলেই মনে হয়। বেণুকুঞ্জে আমরা সাহেবের কাছে যখন ইংরাজী পড়তে যেতাম, সেই বেলা তিনটের সময় কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়ে প্রবিষ্ট হতো জহুরী—Tray-র উপরে পাঁউরুটি, পলসন বাটারের কৌটো, একটা আপেল আর একপট চা। তাছাড়া একখানা ছুরিও থাকতো। নিঃশব্দে সাহেবের কাছে নামিয়ে দিয়ে তেমনি নিঃশব্দে হতো তার অন্তর্ধান। সাহেব খেতে খেতে আমাদের পড়াতেন। আমরা পড়ায় নিমগ্ন আছি, ইতিমধ্যে কখন জহুরী এসে ভুক্তাবশেষ শুদ্ধ tray-খানা নিয়ে প্রস্থান করেছে। এই জহুরীর সেবাতে সাহেবের শান্তিনিকেতন বাস অনেকটা সুসহ হয়েছিল। কিন্তু যার ভাগ্যে সুখ নেই, তার কপালে এমন প্রভু-বৎসল সেবক স্থায়ী হতে পারে না। স্থায়ী হবে কি করে? জহুরীকে কখনো কথা বলতে শুনিনি, না আমাদের সঙ্গে, না সাহেবের সঙ্গে। তবে অন্তিমকালে যে কথাটা সে বলেছিল, তা অবিস্মরণীয়।

রতনকুঠির পাশে একখানা নড়বড়ে খড়ের ঘরে জহুরী থাকতো, আর সেখানেই সাহেবের খানা পাকাতো। একদিন খানা পাকাচ্ছে, এমন সময়ে কালবৈশাখীর ঝড় এসে ঘরখানা পড়ে গেল, জহুরী যে চাপা পড়লো—সাহেব জানলো অনেক পরে ফিরে এসে। ঘরটাকে ভূপাতিত দেখে জহুরীর কি হলো জানবার উদ্দেশ্যে সাহেব কোনো-মতে সে-ঘরের মধ্যে ঢুকলো। দেখলো পাচ্যমান খানা আগলিয়ে পড়ে আছে জহুরীর দেহটা। জহুরী, তুম্ ক্যায়সা হ্যায়?

নেহী সাব, হম্‌কো তো বিলকুল কোপতা বনা দিয়া।

সাহেব তাকে তুলে বাইরে নিয়ে এলো। কোপতা আর কথা বলবে কি? সাহেব অনেকক্ষণ তাকে নিরীক্ষণ করে দেখলো। তার গায়ের অর্ধদগ্ধ কোটের বোতাম দেখে চিনতে পারলো, এ সেই কোট যা আমার বন্ধু সাহেবকে ব্যবহার করবার জন্য দিয়েছিল।

জহুরীকে নিয়ে ছাত্রমহলে অনেক গল্প প্রচলিত ছিল। সাহেব যখন বেণুকুঞ্জে থাকতেন, সেই ঘরে ছোট একটি কামরায় খানা পাকাতো জহুরী। স্বভাবতই খানার সুগন্ধে আকৃষ্ট হতো অদূরবর্তী ঘরের ছেলেরা। তারা খানার উপরে খানাতল্লাসী করতে গিয়ে বাধা

পেতো জহুরীর কাছে। এমন দু-চারদিন বাধা পেয়ে ছেলেরা হঠাৎ আবিষ্কার করলো ওর বাঁ চোখটা কানা। তখন আক্রমণটা শুরু হলো সেই দিক থেকে। বেচারী দেখতে পেতো না কেন এমন হচ্ছে! কেবল সাহেবের টেবিলে খানা দেবার সময় দেখতো দু-একটা পদ কম। সাহেবের তো সেদিকে হুঁশ নেই। ওদিকে আবার জহুরীও অপ্রস্তুতের একশেষ। সে যখন বুঝলো যে, ব্যাপারটা নিতান্তই লৌকিক, তখন ছেলেদের সঙ্গে আপোসরফা করে ফেললো। তখন থেকে আর সাহেবের খানায় পদ-সংখ্যার কমতি ঘটতো না। এহেন প্রভুবৎসল সেবকের অভাবে সাহেব কিছুদিন বিব্রত ছিল। নূতন লোকের সন্ধান চলছে, এমন সময় সাহেব একদিন কলকাতা থেকে এসে উপস্থিত। আমাদের এক বন্ধু এসে খবর দিল, ওহে সাহেব তো কাল রাতে এসে পৌঁছেছেন, এদিকে জহুরীর বিকল্প তো এখনো পাওয়া যায়নি। কোথায় খাবেন, কখন খাবেন, এসব বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্বিকার হয়ে তিনি চিঠি লিখে চলেছেন। আমরা বুঝলাম চিঠি লেখা শেষ হলেও কেউ তাঁর খানা নিয়ে উপস্থিত হবে না। কাজেই ও ব্যাপারটার সমাধান আমাদেরই করতে হবে। সমাধান কী ভাবে হলো তা জানাবার আগে সমাধানের পথে বিঘ্নগুলি বিবৃত করা দরকার।

আশ্রমে তখন গ্রীষ্মের ছুটি চলছে। ছাত্রদের পাকশালা বন্ধ। রবীন্দ্রনাথ শিলংয়ে। রথীবাবুরাও কলকাতায় বা কালিম্পঙয়ে। কাজেই তাঁদের পাকশালাও বন্ধ। বুঝলাম সাহেবের ভাগ্যে বিশুদ্ধ জল-হাওয়া ছাড়া আর কিছু জুটবে না। জলটা অতিরিক্ত বললাম। কারণ জল গড়িয়ে দেবার লোক তো কোপতা বনে পরলোকে প্রস্থান করেছে। আমি গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমাকে দেখবামাত্র তিনি স্নানাহারের মতো তুচ্ছ বিষয়ে অনবহিত হয়ে ফিজিবাসী ভারতীয়দের দুর্দশা সম্বন্ধে বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ শুনবার পরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সাহেব, দুপুরবেলার খানার কী করছো?

কেন, general kitchen আছে।

আশ্রমে এখন ছুটি চলছে, General kitchen-এ রান্না হয় না।

কেন, রথীবাবুরা আছেন?

তাঁরা সম্প্রতি অনুপস্থিত।

তোমরা তো আছো দেখছি।

স্বীকার করতে হলো আমরা আছি।

তোমাদের সঙ্গেই খাবো।—আমি ভাবলাম এইবার পথে এসো।

কী ভাবে তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে?

জানালাম যে আমরা ৩।৪ বন্ধু আছি। নিজেদের ব্যবস্থা করে নিয়েছি।

তোমরা যখন খাবে জানিও, আমি গিয়ে উপস্থিত হবো।

আমি দেখলাম এ আর এক সংকট। আমরা তো খাই ডাল ভাত চচ্চড়ি। সাহেবকে তো তা দেওয়া চলে না।

. তোমরা কী খাও?

ভাবলাম যা বলবো সবই সমান সত্য। বললাম, পরোটা, চাপাটি, পায়েস—এরকম আরো কত কি।

উত্তরে শুনলাম, হ্যাঁ ভালো করে খাবে, নইলে শরীর টিকবে কেন?

তা তোমাকে কি দেব বলো? আমাদের কিছুতে অসুবিধে নেই।

খানকতক পরোটা, কিছু তরকারি আর পায়েস দিও। তবে তোমাদের কম্‌তি যেন না হয়। কটার সময় তোমরা খাও?

সময়টা একটু পিছিয়ে দিলাম। তবু ভয় ছিল মনে। সাহেব বুঝি বা এসে পড়ে।

ফিরে এসে বন্ধুদের সুসংবাদ দিলাম। দেখলাম তারা সত্যিই আনন্দিত হয়েছে। নির্বোধ আর কাকে বলে। যাই হোক্, খানকতক পরোটা, কিছু তরকারি, পায়েস তৈরী করা হলো। এবং যথাসময়ে সাহেবের কাছে এই খানা নিয়ে উপস্থিত হলাম।

এইভাবে কিছুদিন চললো, মনে ভরসা ছিল যে, সাহেব দু-চার দিনের মধ্যেই চলে যাবে।

কিন্তু তার আসা-যাওয়া দুই-ই অনিশ্চিত। অতএব নিজেরা অর্ধাশনে থেকে সাহেবকে ভুরিভোজন করাতে লাগলাম। বিকেলবেলা তিনটের সময় কি খেতো তা স্বচক্ষেই দেখেছি, রাতের বেলাতে থাকতো পায়েসের বদলে মাংস। হঠাৎ একদিন সাহেবের কাছ থেকে লোক এসে জানালো যে সে চলে যাচ্ছে। আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। কারণ ভয় ছিল, এই কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তিটি হয়তো একদিন আমাদের খাবার সময় এসে সমস্ত রহস্য ভেদ করে ফেলবে। যাই

হোক্, অর্ধাশনে থেকে সাহেবের সেবা করে যেমন আনন্দ পেয়েছিলাম তার তুলনা হয় না। অনুরূপ আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল সাহেবের জীবনে। তা অনেক দিন পরে এবং লণ্ডনে। সাহেব তো একদিন আঁটোসাঁটো একটি ক্লাবে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দেখা করতে চান সেক্রেটারীর সঙ্গে। সেক্রেটারীর একান্তসচিব তো অবাক। এরকম জীর্ণ পরিচ্ছদ পরিহিত ব্যক্তি কখনো ঢোকেনি সেই ক্লাবে, যার দরজা হবু লাটবেলাটের জন্যই উন্মুক্ত। লোকটি সাহেবকে বসিয়ে রেখে সেক্রেটারীকে খবর দিতে গেল। সেক্রেটারীর ব্যবহার দেখে একান্তসচিব একান্ত বিস্মিত হল। কোনও সাধুসন্ত উপস্থিত হলে এরকম অভ্যর্থনা পেতো না। সাহেব তো লাঞ্চ খেয়ে বিদায় হল। সেক্রেটারী তার ঘনিষ্ঠ কোনও বন্ধুকে বললো, আজ আমার প্রভুকে (The Lord) ভোজনে আপ্যায়িত করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ওদেশে ধনী ব্যবসায়ীদেব মধ্যে এণ্ড্রুজের পরম ভক্তের অভাব ছিল না। এণ্ড্রুজ ছিলেন স্কচ্‌ম্যান। ইংল্যাণ্ডের অধিকাংশ জাহাজের মালিক স্কটল্যাণ্ডের লোক। জাহাজগুলোর উপর ওদের নির্দেশ ছিল যে, এণ্ড্রুজ বা তাঁর চিহ্নিত যে কোনও ব্যক্তি পৃথিবীর যে কোনও দেশে যেতে চাইবে, তাদের নিখরচায় নিয়ে যেতে হবে। স্কচ্‌দের দুর্নাম আছে, তারা বড় কৃপণ। কৃপণ হলেও ভক্ত হতে বাধা নেই। এণ্ড্রুজ ওদেশে শিক্ষিত সমাজে বিশেষ ভক্তির পাত্র ছিলেন।

তাঁর পক্ষে যথার্থই সত্য ছিল "তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু বিঘার পরিবর্তে।"

আগেই বলেছি বিদেশ থেকে ফিরে যখন তিনি ভারতবর্ষে আসতেন, তখন তাঁর আশ্রয় ছিল, শান্তিনিকেতন ও সাবরমতী। এসেই তাঁর প্রথম কাজ হতো নিজের পকেট থেকে যাবতীয় টাকা-পয়সা ও চেক্ আশ্রয়দাতার কাছে সমর্পণ করা। আর বলতেন, যাক্, এতক্ষণে সব ভারমুক্ত হলাম।

এরকম ভার-মোচনের দৃষ্টান্ত আরও বেশী হলে সমাজের ভার অনেক লঘু হতো। একবারের কথা বলি। সাবরমতীতে এসে পৌঁছে ভার মোচন প্রয়াস করছেন, এমন সময়ে শুনলেন যে গান্ধীজীর সঙ্গে যে লোকটির কথা হচ্ছে সে দক্ষিণ ভারতের কোনও এক জেলার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। লোকটি গান্ধীজীকে বোঝাতে চেষ্টা

করছে, যখন সে জেলে গিয়েছিল, তখন তার অনুপস্থিতির সুযোগে কংগ্রেস তহবিলে তছরুপ হয়েছে। এজন্য তাকে দায়ী করা চলে না। ব্যাপারটা খুব সরল, তবে গান্ধীজী সরল কথাটা কিছুতেই বুঝতে পারছেন না, বলছেন—জেলে যাবার আগে তোমার সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, তুমি তা হওনি, কাজেই দায়িত্ব অবশ্যই তোমার। এটি তোমার পয়লা নম্বর দোষ। দ্বিতীয় নম্বর দোষ, তুমি চাইছ আমি তোমার এই গুরুতর দোষ মাপ করবার জন্য সুপারিশ করে চিঠি দিই।

—তাহলে আমি এখন কি করবো?

—দেশে ফিরে যাও। এবং তোমার বিষয়সম্পত্তি যা আছে, তা বেচে কংগ্রেস তহবিলের ঘাটতি পূরণ করে দাও।

—তাহলে আমার পরিবারের চলবে কি করে?

—সে কথাও ভেবেছি, তখন তুমি আমার কাছে চলে এসো, ব্যবস্থা করবো।

—দেশে ফিরে যাবার মত রেলভাড়াও তো আমার নেই।

—তা বেশ, হেঁটেই চলে যাও।

—সে যে অনেক দূর।

গান্ধীজী নীরব হলেন। লোকটি হতাশ হয়ে সাবরমতী আশ্রম ত্যাগ করে স্টেশনের দিকে রওনা হল।

এণ্ড্রুজ এতক্ষণ বসে সমস্ত দেখছিলেন। লোকটি রওনা হতে তিনিও পিছু পিছু রওনা হলেন। এবং সদর রাস্তার উপর গিয়ে তাকে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কত?

—একুশ টাকা।

—এই নাও—বলে পকেট থেকে টাকা বের করে তার হাতে দিলেন। বললেন, আর পিছু তাকিয়ো না। সোজা রেল স্টেশনের দিকে চলে যাও।

ভাগ্যিস তখনও তিনি সম্পূর্ণ ভারমুক্ত হননি, কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাই লোকটির এ-যাত্রা পাথেয় জুটলো। এণ্ড্রুজ ফিরে এসে গান্ধীজীকে জানালেন তিনি ভাড়া দিয়ে লোকটিকে বিদায় করে দিয়েছেন। গান্ধীজী বললেন—যখন তুমি ওর পিছু পিছু চললে, বুঝলাম যে তোমার একটা পিছু mischief করবার মতলব আছে।

আবার যখন তিনি ফিরে শান্তিনিকেতনে আসতেন, তখনও পকেটের ভার মোচনের বিলম্ব করতেন না।

এইরকম ভার মোচনের দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনে অবিরল।

এণ্ড্রুজ লিখিত "What I owe to Christ" বইটি বিক্রী হয়ে প্রচুর টাকা পেয়েছিলেন।

সে টাকার ভারও তাঁকে বেশী দিন বহন করতে হয়নি। আমাদের পরিচিত এক বন্ধুর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়বার খরচ যোগাতেই সে টাকার ভার থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন।

এণ্ড্রুজের জীবন এরকম ভার মোচনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আগে বলেছি শান্তিনিকেতনে এণ্ড্রুজের কোনো নির্দিষ্ট কাজ ছিল না, তবে এর দুটি ব্যতিক্রম ছিল। সকালবেলায় নীচু বাংলায় গিয়ে বড়বাবুকে সংবাদপত্রে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য খবরগুলি শুনিয়ে আসতেন। এ একরকম সঞ্জয়বৃত্তি। আর রাত্রিবেলা শুতে যাবার আগে রবীন্দ্রনাথকে শোনাতেন আশ্রমের খুঁটিনাটি ছোট বড় সংবাদগুলো। এইভাবে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের সঞ্জয়বৃত্তি করে তাঁর দিবসের আরম্ভ ও শেষ ঘটতো। একদিন রাত ১০টা নাগাদ রবীন্দ্রনাথের কাছে আমার ডাক পড়লো। শান্তিনিকেতনের সময়সূচী অনুসারে ১০টা গভীর রাত্রি। তারপরে সেটা ছিল আবার শীতকাল। আমি তো যুগপৎ ভয়ে ও শীতে কাঁপতে কাঁপতে রওনা হলাম রবীন্দ্রনাথের সাময়িক বাসগৃহে। সাময়িক এই জন্যে, উত্তরায়ণ তৈরী হওয়ার আগে তাঁর কোনো স্থায়ী আবাস ছিল না। যখন যে বাড়িতে সুবিধা হতো থাকতেন। তখন ছিলেন সেই খড়ো ঘরের বাড়িটাতে, যেটা ছাতিমতলার ঠিক মুখোমুখি। কালে কালে ওখানে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি বাস করেছেন। স্টেনকোনো, অধ্যাপক কলিন্স, অধ্যাপক বেনোয়া এবং সবশেষে ভকিল দম্পতি। সবশেষে এইজন্য বললাম, তারপর আমি শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে এসেছিলাম। এই সব বাড়িঘরের বিশিষ্ট নাম থাকলে, আর বর্ণনা দিয়ে বোঝাতে হতো না।

রাতটা আলো-আঁধারি ছিল। তার মধ্যেই চোখে পড়লো পূর্বদিকের বারান্দায় একটি দীর্ঘায়ত মূর্তি পায়চারি করছেন। বুঝলাম স্বয়ং তিনি। আমি কাছে যেতেই বললেন, ওরে, সাহেব এসে শুনিয়ে গেল তুই একটা কী লিখেছিলি। তার মধ্যে একটাই শব্দ ছিল

'taxi-তে'! ও তো বাংলা বোঝে না। আমি শুনবার পর থেকে ভাবছি বাংলা নাটকের মধ্যে 'taxi' ঢুকলো কী করে?

তখন আমার মনে পড়লো, ওটা একটা ছত্রের শেষের শব্দ। আগের ছত্রের মিলটা ছিল 'এক শীতে'। কাজেই 'taxi'টা ওখানে না আনলে মিল পেতাম কোথায়?

শুনে তিনি হেসে উঠলেন, বললেন, দেখো একবার পাগলের কাণ্ড। শুনবার পর থেকে আমি মিল খুঁজে মরছি। কিছু না পেয়ে অবশেষে তোকে এত রাত্রে ডেকে পাঠালাম। তারপরে আবার হেসে বললেন, পাগলটা কিছুতে বাংলা শিখলো না, বাংলা না বুঝবার ফলে এইরকম বিভ্রাট ঘটেছে। যা, তুই শুতে যা।

আমি মনে মনে ভাবতে ভাবতে ফিরে এলাম। সবাই বুঝলে আমাকে রাত ১০টার শীতভোগ করতে হতো না। পরে আমার অনেক সময় মনে হয়েছে শান্তিনিকেতনে এমন একজনও লোক ছিল না, যিনি শতকরা ১০০ ভাগ প্রকৃতিস্থ। এ নিয়ম উচ্চতম থেকে নিম্নতম সকলের সম্বন্ধে খাটে। সত্যি কথা বলতে কি, ও জায়গাটি প্রকৃতিস্থ লোকের জন্য নয়।

এণ্ড্রুজ অন্তিমরোগে আক্রান্ত হয়ে পি. জি. হসপিটালে আছেন। ইচ্ছে করলেই তিনি সম্পূর্ণ আলাদা কেবিনে আরামে থাকতে পারতেন। কিন্তু, না। তিনি থাকবেন দীন-দরিদ্ররা যে free bed-এ থাকে, সেইখানে। এ-ও সেই অপ্রকৃতিস্থতার একটা উদাহরণ। কিন্তু এ আবদার তাঁর বেশী দিন চললো না। বিধানবাবু জানতে পেরে তাঁর জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করে দিলেন। তবে সেটা বিধানবাবু করেছিলেন, কিংবা গান্ধীজী করিয়েছিলেন, ঠিক বলতে পারবো না। সেটা ১৯৪০ সাল। গান্ধীজী এসেছেন এণ্ড্রুজকে দেখতে। এণ্ড্রুজের একমাত্র ভয় পাছে রবীন্দ্রনাথ গুরুতর অসুস্থ অবস্থাতে তাঁকে দেখতে আসেন। গান্ধীজীকে বিশেষ করে অনুরোধ জানালেন, গুরুদেব যেন কলকাতায় না আসেন। কয়েকদিন পরে এণ্ড্রুজের মর্ত্যজীবনের অবসান ঘটলো।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী এই দুজন তাঁর সবচেয়ে আপনজন ছিলেন। তবে এই দুজন সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব কিঞ্চিৎ ভিন্নরকম ছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব ছিল ভীতিমিশ্রিত বিস্ময়—

ইংরেজীতে যাকে awe বলে। আর গান্ধীজীকে দেখতেন ভাইয়ের মতো। এণ্ড্রুজের শেষ উক্তি, "I see Mohan Swaraj is coming."

শান্তিনিকেতনে উপরমহলে রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ ও এণ্ড্রুজকে নিয়ে একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল। একজন God the Father, আর একজন God the Son আর একজন God the Holy Ghost.

সংস্কৃতে যে শ্রেণীর ব্যক্তিকে পুণ্যশ্লোক বলে, এণ্ড্রুজ সেই শ্রেণীর অন্তর্গত।

॥ ১৩ ॥

শাস্ত্রীমশায়

মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী, শান্তিনিকেতনের পরিভাষায় শাস্ত্রীমশায়। শাস্ত্রীমশায় নামে তাঁর পরিচয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ থেকে ছাত্র, শিক্ষক, ভৃত্যাদি জানতো সেই মানুষটিকে। যাঁর বর্ণ গৌর, দেহ নাতিখর্ব, নাতিকৃশ। ছোট করে ছাঁটা চুলে সূক্ষ্ম শিখা। পায়ে তালতলার চটি, গায়ে মোটা চাদর। শীতকালে তার উপর একখানি কম্বল জড়ানো। সকলের জন্য তার মুখে অনাবিল মৃদু হাস্য। এই বেশেই তিনি সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। রবীন্দ্রনাথের সান্ধ্য আসর থেকে হাসপাতালের রোগশয্যা।

মধ্য বয়সে তাঁর পত্নী উৎকট রোগে আক্রান্ত হ'লেন, কলকাতায় নিয়ে গেলেন চিকিৎসার জন্য। ফিরে এলেন একা। সেই থেকে তিনি স্বপাকে আহার করেন। রাত্রি বেলা সামান্য দুধ। বলতে গেলে তাঁকে একাহারী বলা উচিত। পান ভোজন সম্বন্ধে তিনি শাস্ত্রীয় আচার মেনে চলেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু কিন্তু কোন মতেই তাঁকে গোঁড়া বলা চলে না। তিনি সাহেবকে, শান্তিনিকেতনে সাহেব বলতে একজনকেই বোঝাতো--তাঁর নাম সি. এফ. এণ্ড্রুজ, নত হয়ে প্রণাম করতেন।

শান্তিনিকেতনে সাহেব-সুবোর অভাব ছিল না, তাদের যাতায়াতেরও অভাব ছিল না, তৎসত্ত্বেও সাহেব বলতে এণ্ড্রুজকেই বোঝাতো। উত্তরায়ণে গেলে শোনা যেতো, 'ওরে কাল মাঝরাতে হঠাৎ সাহেব এসে পড়েছেন। তখন শুতেই বা দিই কোথায়, খেতেই বা দিই কি! বৌমা তো কলকাতায়।' তখন আবার নিচু বাংলায় গেলে শুনতে পেতাম বড়বাবু, এখানেও বড়বাবু মানে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ, কোনও হোমরা-চোমরা অফিসার জাতীয় লোক নন, তাঁর অনুচর মুনীশ্বরকে ডেকে বলছেন, 'শীগ্‌গির যা, সাহেবকে ডেকে নিয়ে আয়।' শান্তিনিকেতনে শাস্ত্রী অনেক ছিলেন, ছিলেন ভীমরাও শাস্ত্রী, ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী, কিন্তু শাস্ত্রী বা শাস্ত্রীমশায় বলতে ঐ একটি লোককেই বোঝাতো। যাঁর বর্ণনা একটু আগেই বলেছি।

শাস্ত্রীমশায়ের বাড়ি মালদা জেলায়। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা ৺কাশীধামে। টোলে পড়ে শাস্ত্রী পদবী পেয়েছেন। তবে ৺কাশীর টোল বলেই তাঁর বিদ্যায় টোল পড়েনি, এমন নিটোল জ্ঞানের মানুষ অল্পই দেখা যায়। শান্তিনিকেতনে এসে পড়লে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি পড়বার জন্য উৎসাহিত করলেন। তাঁর অভিপ্রায় ছিল, হিন্দু ধর্ম তো জানেনই, এবাবে বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে যেন প্রবেশ করতে পারেন। এমন টুলো পণ্ডিতের শান্তিনিকেতনে আসবার কথা নয়। আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হ'তে পারে না, তবে পরোক্ষে যা শুনেছি চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় তাঁকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। সে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শাস্ত্রীমশায় শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। বত্রিশ বছর কাল শান্তিনিকেতনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য যোগ হওয়া সত্ত্বেও সে যোগ ছিন্ন হ'ল কেন, তা বিস্ময়ের ও পবিতাপের বিষয়। কাউকে তিনি সে কথা বলেন নি। আমি জিজ্ঞাসা কবেছিলাম, উত্তর পেয়েছিলাম, ওটা জিজ্ঞেস করিসনে, আমি নিজের কাছে শপথ করেছি, ও কথা কাউকে বলবো না। তবে কানাকানিতে কিছু বটে গিয়েছিল, তার মধ্যে কতখানি দুধ কতখানি জল, জানি না। আমিও না হয় নাই বললাম। তবে এই তাঁর প্রথম শান্তিনিকেতন পবিত্যাগ নয়। মাঝে একবার বলে-কয়েই স্বগ্রাম হরিশ্চন্দ্রপুরে গিয়ে বাড়িতে ছাত্র রেখে টোল খুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এই বলে ফিরিয়ে আনেন যে, ওখানে আপনি শিক্ষাদানে যে আদর্শ অনুসরণ করেছেন তার বিশদ ব্যবস্থা আমি শান্তিনিকেতনেই করে দেব। আপনি শান্তিনিকেতনে ফিরে আসুন। শাস্ত্রীমহাশয় পুনরায় শান্তিনিকেতনে এসে যোগ দিলেন। এখানে প্রসঙ্গত বলে রাখা যেতে পারে, শান্তিনিকেতনের অনেক অধ্যাপক মাঝখানে একবার শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, আবার তাঁদের ফিরে আসতে হয়েছে। কয়েকজনের নামের এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। হরিচরণ পণ্ডিত মশায়, রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে বাংলা অভিধান লিখতে শুরু করেছিলেন, মাঝখানে অর্থাভাববশতঃ তাঁকে সিটি কলেজে যোগদান করতে হয়েছে। কিন্তু সেখানে তাঁর স্থায়ী হওয়া চলেনি। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁকে মাসিক ৫০ টাকা বৃত্তি দিতে স্বীকার করলে,

তিনি আবার শান্তিনিকেতনে যোগ দেন। প্রমদারঞ্জন ঘোষ ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও মাঝখানে শান্তিনিকেতন ছেড়ে গিয়েছিলেন। আবার ফিরে আসতে হয়েছিল তাঁদের। আপাততঃ এই কটি নাম মনে পড়ছে। ওখানকার একটি মোহিনী আকর্ষণী শক্তি আছে, যার মধ্যে গিয়ে পড়লে, স্থায়ী ভাবে মায়া কাটানো সম্ভব হয় না। তবে ভাবছি-- সেটা ওখানকার আকর্ষণীয় শক্তি, না রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথের বলেই মনে হয়। কারণ রবীন্দ্র-হীন শান্তিনিকেতনে এমনভাবে কেউ আবার ফিরে এসেছেন শুনলে বিস্মিত হবো।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে প্রথম আমলে যে সব অধ্যাপককে নির্বাচন করেছেন, তাঁদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে নিজ নিজ গবেষণার ফলে সুবিখ্যাত হয়েছেন। অনেকেই ভারত-বিখ্যাত। জগদানন্দ রায় ছিলেন ঠাকুর এস্টেটে জমিদারী সেরেস্তার কর্মচারী। তাঁর লিখিত ২/৩টি প্রবন্ধ সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হ'লে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হন, এবং তাঁকে শান্তিনিকেতনে গণিত শিক্ষক রূপে নিযুক্ত করেন। আপন অধ্যবসায়ের ফলে জগদানন্দ বাবু সহজবোধ্য ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখে খ্যাতি লাভ করেছেন।

হরিচরণ পণ্ডিত মহাশয় রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে যে অভিধান রচনা করতে আরম্ভ করেছিলেন, দীর্ঘকাল পরে বঙ্গীয় শব্দকোষ নামে তা প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, একাজ শেষ না হ'লে তোমার মৃত্যু হবে না। পণ্ডিত মশায়ের জীবিত কালে এ বই ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। কেবল, তাঁর দুঃখ এই যে, মুদ্রিত বই রবীন্দ্রনাথের হাতে দিতে পারলেন না। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কিশোর বয়সে শান্তিনিকেতনে এসে, রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যে গবেষণা আরম্ভ করেন, তা রবীন্দ্র-জীবনী নামে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গবেষকদের এই বই অপরিহার্য। এখন ৯১ বছর বয়সে বিছানায় শুয়ে সহায়কদের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে গবেষণা করে চলেছেন, তার মূল্য অপরিসীম। অন্যদের কথা ছেড়ে দিয়ে শাস্ত্রীমশায়ের কথাই ধরা যাক। তিনি রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে, আগ্রহে ও অর্থব্যয়ে চীনা ভাষা, তিব্বতী ভাষা ও ভারততত্ত্বে প্রথম সারির একজন গবেষক রূপে ভারত বিখ্যাত। এই কথা নিশ্চিত রূপে বলা যায়, শান্তিনিকেতনে না এলে তিনি সংস্কৃত ভাষার

গণ্ডী অতিক্রম করতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

শাস্ত্রী মশায়কে অবলম্বন করে বিশ্বভারতীর প্রথম পদক্ষেপ। এতদিন যা ছিল শব্দের বস্তু এবারে তাকে বাস্তবে পেলেন। তারই সন্ধানে গিয়েছিলেন স্বগ্রাম হরিশচন্দ্রপুরে। শাস্ত্রীমশায় বুঝবার আগেই রবীন্দ্রনাথ হয়তো তাঁর মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন। শান্তি-নিকেতনে ফিরে এসে শাস্ত্রীমশায় দেখলেন, বাঃ, একেই তো আমি সন্ধান করে মরছিলাম। তাঁর সেদিনকার আনন্দ কল্পনায় অনুভব করতে পারি। অবশ্য ছাত্র জুটতে বিলম্ব হ'ল না। কতক ছাত্র শান্তিনিকেতনেরই লোক, কতক এলো কলকাতা থেকেও। আরও পরবর্তী কালে ছাত্র আসতে লাগলো ভারতের নানা প্রান্ত থেকে। শাস্ত্রীমশায়ের মুখে চোখে কি স্বর্গীয় আনন্দ।

আমি পরবর্তীকালে শাস্ত্রীমশায়ের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি। মনে হয়েছে তিনি হিসাবের ভুলে সেকালের মানুষ একালে জন্মগ্রহণ করেছেন। একদিকে নিষ্ঠাবান হিন্দু, আহারে বিহারে শাস্ত্রীয় আচার পালন করে চলেছেন, অন্যদিকে সাহেবকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছেন। মৌলানা সৌকত আলিকে সকলের সঙ্গে এক পংক্তিতে আহারের জন্য রান্নাঘরে নিয়ে চলেছেন সেকাল ও একালের মিশ্রণের জন্য ঘটেছে এরকম স্বতোবিরুদ্ধতা। এবারে দু'একটি উদাহরণ না দিলে ব্যাপারটা ফাঁকা ঠেক্‌বে। উদাহরণ স্বরূপ নিজেকেই গ্রহণ করা যাক্।

এখানে বলা আবশ্যক যে ঠিক এই বিষয় নিয়ে 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' নামে আমার একখানা বই আছে, বইখানা ৪০ বছরের উপর বাজারে আছে, শুনেছি কারো কারো ভাল লাগে। পাছে সেই বইএর অনুবর্তন ঘটে, তাই যতদূর সম্ভব সেই বইএর বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে চলতে চেষ্টা করবো। বিশ্বভারতী আনুষ্ঠানিক ভাবে স্থাপিত হবার আগে আমরা দু'জন ছাত্র রূপে জুটে গেলাম। আমি ও অন্ধ্রদেশীয় এক যুবক নাম 'চলময়'। এখানে আমরা দু'জন খাতায় নাম লেখানো ছাত্র, আর সকলে ছাত্র তবে তারা নাম লেখানো নয়, বেতনও দিতে হয় না।

এমন সময় রবীন্দ্রনাথের মাথায় চাপলো যে, প্রত্যেক বাঙ্গালীর সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়া উচিত। তাও আবার খোদ পাণিনির ব্যাকরণ।

এই ব্যাকরণ না পড়বার ফলেই বাঙ্গালী ভাবালু হয়ে পড়ছে। অতএব তিনি ফরমান জারী করলেন যে প্রত্যেক শিক্ষক ও ছাত্রকে পাণিনির ব্যাকরণ পড়তে হবে। আমাদের ভরসা ছিল, হয়তো পাণিনির ব্যাকরণ পাওয়া যাবে না। নয়তো পাণিনির শিক্ষাদানের শিক্ষক। শাস্ত্রীমশায়ের আগ্রহাতিশয্যে ও আমাদের দুর্ভাগ্যের ফলে দুইই জুটে গেল। কয়েকমাস পাণিনি পড়বার পরে কিভাবে এই দায় থেকে রক্ষা পেলাম, আগের বইখানাতে তার বর্ণনা করেছি। এখন তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

শাস্ত্রীমশায়কে আচার পালন করতে গিয়ে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হতো, যেমন, পত্নীর মৃত্যুর পর স্ব-পাকে রন্ধন। ছাত্রদের রান্নাঘরের একজন চাকর এসে বাসন মেজে উনুন ধরিয়ে তরকারী কুটে দিয়ে যেত, এইমাত্র। আর একটি কষ্টের বিবরণ দিচ্ছি। ছুটিতে কাশীতে রওনা হবেন, সেখানে থাকেন তাঁর জননী। শান্তিনিকেতন থেকে সে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার পথ। তিনি আশ্রমের শান্তিনিকেতন স্থানটিকে আমরা তখন আশ্রম বলতাম; এখনও হয়ত মনের ভুলে কেউ কেউ বলে থাকেন ভাঁড়ার থেকে কিছু মিছরী গুঁড়ো করে আনিয়ে কাগজে মুড়ে চাদরের প্রান্তে বেঁধে নিলেন। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, ও কি হবে?

বললেন, কোন একটা বড় স্টেশনে নেমে জল দিয়ে সরবত করে খাবো।

পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ সরবত খেয়েই চব্বিশ ঘণ্টা চলবে?

তিনি বৈদিক যুগের একটি হাসি হেসে বললেন, বুড়ো মানুষের আবার কি লাগে!

তখন আমার মনে এলো আশ্রমের কোনো কোনো বুড়োর কথা, ভূরিভোজনের জন্য যাঁদের প্রসিদ্ধি ছিল। শাস্ত্রীমশায় অত্যন্ত নির্লোভ ছিলেন। কলকাতায় যাচ্ছি শুনে বললেন, আমার জন্য একটা খদ্দরের চাদর আনিস।

সেই উড়ুনীখানা তাঁর কাছে নিয়ে উপস্থিত হলে বললেন, কত লেগেছে বল।

লেগেছিল পাঁচ সিকে পয়সা। আমার ইচ্ছে ছিল না যে ঐ দামটা তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করি। আমার ভাবগতিক দেখে

তিনি বুঝতে পারলেন। বললেন, না, না, তা হবে না, তুই দামটা নিয়ে যা। এর পরে দেবার সুযোগ অনেক পাবি।

গুরুবাক্য অন্তত একবার নিষ্ফল হলো। আর কখনো সুযোগ আসে নি।

শাস্ত্রীমশায়ের মনে মনে বোধ করি আক্ষেপ ছিল, কোন সভায় তিনি প্রবন্ধ পাঠ করলে শ্রোতার সংখ্যা দশ পনেরো জন ছাড়িয়ে ওঠে না। আমাকে বললেন, হাঁরে, তোরা সভায় কিছু পড়লে ঘরে লোক ধরে না, আমার বেলায় এমন কেন হয়?

আমি তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে বললাম, ঘর ভরা শ্রোতা চান?

আমাকে দেখে তাঁর মনে প্রাচীন কালের আদর্শ ছাত্র উতঙ্ক আরুণির কথা মনে পড়লো মুখ খুলতেই যাঁরা গুরুর মনোভাব বুঝতে পারতেন। আবার একটু বৈদিক আমলের হাসি হেসে বললেন, তুই ঠিক বুঝেছিস।

তা আপনার পাঠ্য প্রবন্ধের নাম কি বলুন? আজ ঘর ভরা শ্রোতা পাবেন।

তিনি আগ্রহের সঙ্গে বললেন, ক্ষুদ্রের খেলা।

আমি আব কিছু জিজ্ঞাসা না করে তখনি নারদের নিমন্ত্রণে বেব হয়ে পড়লাম। বিশ্বভারতীর বয়স্ক ছাত্রদের গিয়ে জানালাম যে আজ সন্ধ্যাবেলায় শাস্ত্রীমশায় 'ক্ষুদ্রের খেলা' নামে একটি বৈদিক আমলের নাটক পাঠ করবেন। সকলে ত অবাক। শাস্ত্রীমশায় নাটক পাঠ করবেন! এ এক নূতন কথা।

কোথায়?

দ্বারিক বাড়ীর দোতলার হল ঘরটিতে।

সন্ধ্যের আগেই সমস্ত হলঘর শ্রোতাতে পূর্ণ হয়ে গেল। দিনুবাবু আমাকে সভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ ব্লাকবোর্ড ও খড়িমাটি কেন?

বললাম, বৈদিক আমলের রঙ্গমঞ্চের একটা নক্‌শা আঁকবেন বলে।

সকলে আশ্বস্ত হলো। এমন সময়ে শাস্ত্রীমশায় ঘরে ঢুকে শ্রোতার সংখ্যা দেখে আমার দিকে আশীর্বাদপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

বুঝলাম যে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। আমি এক ফাঁকে সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে এসে নিষ্ক্রমণের একটি মাত্র দরজায় কুলুপ

তুলে দিয়ে প্রস্থান করলাম।

তারপর দোতলায় 'ক্ষুদ্রের খেলা' আরম্ভ হলো। বিষয়টি আর কিছুই নয়! ক্ষুদ্র শব্দটি বৈদিক আমল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রূপান্তর গ্রহণ করেছে, তারই বিশদ বিবরণ।

পরদিন শ্রোতারা আমাকে পাকড়াও করলেন, এ কি করেছিলি তুই?

বিনীতভাবে বললাম, ভালো কাজই করেছি। আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধিতে সাহায্য করেছি।

তারপরে কিছুদিনের মধ্যে আর শাস্ত্রীমশায়ের কাছে ভিড়িনি।

শাস্ত্রীমশায়ের মনে মনে বাসনা ছিল যে আমাকে পণ্ডিত করে তুলবেন। একদিন একগোছা সাইজ করে কাটা কাগজ দিয়ে বললেন, এগুলো রাখ। একসময় বুঝিয়ে দেব কী ভাবে মহাভারতের Concordance তৈরী করতে হয়। বোধ করি বুঝিয়েও দিয়েছিলেন।

অনেকদিন পরে বললেন, কী রে, কাগজগুলো সব লেখা হয়েছে? নিয়ে আয় দেখি।

সে কাগজের গোছা নিয়ে উপস্থিত হতে তিনি দেখলেন সমস্ত লেখা হয়েছে। তবে বেদব্যাস লিখিত কাব্যে নয়, অত্যন্ত আধুনিক কালের কোনো কবির কবিতায়। সমস্ত দেখেশুনে একটি প্রমাণ সাইজের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, এ কাজটা করলেই দেশের একজন প্রধান পণ্ডিত হতে পারতিস।

আমিও একটি প্রমাণ সাইজের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললাম, অদৃষ্টে না থাকলে আর কী করে হবে।

তারপরে একদিন রবীন্দ্রনাথকে নিভৃতে পেয়ে নিবেদন করলাম, শাস্ত্রীমশায় আমাকে পণ্ডিত করে তুলতে চান।

তিনি বললেন, পণ্ডিত হবি কেন? বিদ্বান হবি।

পণ্ডিত ও বিদ্বানে কি প্রভেদ—দুয়ের স্বরূপ কী তারপর থেকেই চিন্তা করেছি। কিন্তু পঞ্চাশ বছর পরেও সম্যক বুঝতে পারিনি। ফলে পণ্ডিত ও বিদ্বান—কিছুই হতে পারলাম না।

শাস্ত্রীমশায়ের প্রাত্যহিক কতকগুলি বাঁধা কাজ ছিল। সকাল-বেলায় উঠে স্নানাদি শেষ করে যেতেন হাসপাতালে রুগীদের দেখতে।

প্রত্যেককে দেখে তাদের বিষয়ে ডাক্তার বা কম্পাউণ্ডারকে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে নিশ্চিন্ত হতেন। হাসপাতাল বলতে যে, ভয়াবহ একটা ব্যাপার সাধারণত বোঝায় আশ্রমের হাসপাতাল সে রকম কিছু ছিল না। রুগী পরিদর্শন হয়ে গেলে তিনি নিজের লেখাপড়ার স্থানে গিয়ে বসতেন। সেটা ছিল তখনকার লাইব্রেরীর পিছনেব একটি ঘব। তারপরে নিজের জন্য স্বহস্তে পাক করতেন। খাওয়ার পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা। অবশেষে সন্ধ্যার আগে বেড়াতে বের হতেন। বের হওয়ার মুখে দিনুবাবুব চায়ের আড্ডায় একবার দেখা দিয়ে যেতেন। তিনি চা পান করতেন না। তাই বলে সতীর্থদের চা পানে আনন্দ অনুভব করবেন না এমন কথা নেই। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে বলতেন, আপনাবা আনন্দ করুন। এই বলে চলে যেতেন। আবার বেড়িয়ে ফিরবাব মুখে উত্তবায়ণে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের আসরে একবাব উপস্থিত হতেন। তখনকার উত্তরায়ণ এখনকার প্রাসাদ নয়। বর্তমানে সেটির নাম কোণার্ক। আসর তখন সবে বসেছে। অনেকেই এসেছেন। কিন্তু র্যাব আগমনে বোঝা যেত যে আসরেব শেষ সভ্যটি এসেছেন তিনি তখনো আসেন নি। নেপালবাবুর কথা বলছি। এমন সময় হয়তো নেপালবাবু এসে উপস্থিত হলেন। শাস্ত্রীমশায় বললেন, তবে এবাবে আমি যাই। হরণে পূরণে আসর সমান থাকতো।

রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকলে বুধবারে সকালবেলা মন্দিরে উপদেশ তিনিই দিতেন। নতুবা শাস্ত্রীমশায় বা অন্য কোন প্রবীণ অধ্যাপক ঐ কাজটি করতেন। শাস্ত্রীমশায় উপাসনা করবেন জানলে ছাত্ররা ভীত হয়ে পড়তো। প্রথম কাবণ, তাঁর উপদেশ কিছু দীর্ঘকাল ব্যাপী হবে। তার উপরে আবার মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক ব্যবহার করতেন। আরো আছে। সকালবেলার জল খাওয়াটা উপাসনার আগে হতে পারতো না। এই তিনটির যে কোনো একটি ছাত্রদের পক্ষে ভয়ের যথেষ্ট কারণ। ত্র্যহস্পর্শ ঘটলে তো কথাই নেই।

এতক্ষণ যা বললাম তাতে শাস্ত্রীমশায়ের আসল পরিচয় দেওয়া হলো না। তিনি প্রবীণ ও পুরাতন অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর বিদ্যার খ্যাতিও তখন দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এসব ছাড়াও তিনি আরো কিছু ছিলেন। শান্তিনিকেতনের যে কয়জন প্রধান

অধ্যাপককে Big Five বলা হতো, সেই জগদানন্দবাবু, ক্ষিতিমোহন-বাবু, নেপালবাবু, Andrews সাহেব প্রভৃতিদের অন্যতম ছিলেন তিনি। তাঁর নৈতিক প্রভাব পদাধিকারকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আশ্রমের সীমানার মধ্যে তখন মাছ মাংস খাওয়া চলতো না। তাই মাঝে মাঝে কোপাই নদীর ধারে গিয়ে বনভোজন উপলক্ষে মাংস খাওয়া একটা রীতি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। একবার এই ব্যাপার নিয়ে আমি দায়ে ঠেকে গিয়েছিলাম! সমস্ত তৈরী! এমন সময় আমার ডাক পড়লো তাঁর কাছে।

'কি রে, আজ নাকি তোদের বনভোজন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। কোপাই নদীর ধারে।'

'তা শুনলাম নাকি মাংস খাবি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ও জায়গাটা তো আশ্রমের সীমানার বাইরে।'

'আশ্রমের সীমানাটাকে আর একটু বাড়িয়ে দে না। এতদিন এখানে থেকে আশ্রমকে এত ছোট করে দেখছিস কেন?'

'ছেলেরা প্রত্যাশা করে আছে।'

'যদি বুঝিয়ে বলিস, তুই বললেই শুনবে।'

আমি বললাম, 'আপনার নাম করেই না হয় বলবো।'

'আচ্ছা, তাই বলিস।'

আমার বিমর্ষভাব দেখে তিনি বললেন, 'আহা দেখ তো তিনটে সহায় জীব বেঁচে গেল। জীবহত্যা হলে কি ভালো হতো? তোর মনে নিশ্চয়ই আনন্দ হচ্ছে?'

বলা বাহুল্য, সদ্য জীবহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হওয়ায় মনে যতটা আনন্দ হওয়া উচিত, তেমন তো কিছুই অনুভব করলাম না। হয়তো আমার হয়েই তিনি অনুভব করছিলেন আনন্দ।

এহেন শাস্ত্রীমশায়, যিনি শান্তিনিকেতনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিলেন, যাঁকে উপলক্ষ্য করে বড়বাবু লিখেছিলেন,—'যেথায় বিধু রবি না জানি অস্ত জাগি' থাকি' জাগান লোক'—সেই শাস্ত্রীমশায়কে একদিন শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় নিতে হলো।

বারে বারেই দেখেছি এমন অনেক সমর্পিতপ্রাণ ব্যক্তিকে শান্তিনিকেতন থেকে অপ্রকট কারণে বিদায় নিতে হয়েছে। এটি শান্তিনিকেতনের একটি দুর্ভাগ্য। এই সব দুর্ভাগ্যের সমাহৃত পাপে

শান্তিনিকেতন আজকে যা তাই হয়েছে।

এবারে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক হয়ে যোগ দিলেন, তবে এখানেও আমার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিন্ন হলো না। আমিও আছি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখতে পেতাম এম-এ, পঞ্চম বর্ষের অকালপক্ক ছাত্রেরা শাস্ত্রীমশাই না বলে, তাঁকে বলতো বিধু বাবু। তাদের কথা শুনে মনটা এক এক সময় বিদ্রোহ করে উঠতো। শাস্ত্রীমশায়, যিনি কিনা পঞ্চ প্রধানদের একজন ছিলেন, স্বয়ং বড়বাবু একসঙ্গে রবি বিধু বলে কবিতা লিখেছিলেন, এখানে এসে তিনি হলেন বিধু বাবু। কিন্তু একটা দৃশ্য দেখে আমার মনের বিদ্রোহভাব শমিত হয়ে গেল। শ্যামাপ্রসাদ বাবুর বৈঠকখানা ছিল একটি মহাশ্মশান বিশেষ। ছোট বড় জ্ঞানী গুণী, বৈজ্ঞানিক রমণ দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণ এমন আর কত নাম করবো। আমিও মাঝে মাঝে যেতাম। একদিন দেখলাম একজন মহামহোপাধ্যায় ঘরে প্রবেশ করলেন, শ্যামাপ্রসাদ বাবু চেয়ারে বসেই 'আসুন' বলে অভ্যর্থনা করলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রবেশ করলেন শাস্ত্রীমশায়। তাঁকে দেখবামাত্র শ্যামাপ্রসাদবাবু উঠে গিয়ে নত হয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিলেন। শাস্ত্রীমশায় অভ্যস্ত ভাবে বললেন, আহা আহা কি করেন। বুঝলাম ওজনে ঠিক আছে। অকালপক্করা যতই 'বিধুবাবু' বলুক না কেন শ্যামাপ্রসাদবাবু জানতেন তিনি রবীন্দ্রনাথের পার্ষদ। আমার মনের বিদ্রোহ ভাব শান্ত হয়ে গেল।

একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শাস্ত্রীমশায় আমাকে বললেন, 'চলরে দিনু-বাবুর সাথে দেখা করে আসি। শুনেছি তিনি শান্তিনিকেতন থেকে চলে এসেছেন।' কথাটা আমার কানেও এসেছিল। তিনি বললেন, 'আমি কলকাতার পথঘাট চিনিনে, তুই নিশ্চয় জোড়াসাঁকোর বাড়ী জানিস।' শাস্ত্রীমশায়কে নিয়ে জোড়াসাঁকোতে পৌঁছে দেখি বিচিত্রার লালবাড়ীটার দোতলায় বড় একখানা আরাম চেয়ারে দিনু-বাবু উপবিষ্ট। শাস্ত্রীমশায়কে দেখে হেসে উঠে এসে প্রণাম করলেন। শাস্ত্রীমশায় তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। দিনুবাবু বললেন, দুজনেরই এক দশা। ঐ একটি ছোট্ট বাক্যের মধ্যে কি অতলস্পর্শ বেদনা ছিল, বুঝতে আমার অসুবিধা হলো না। তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে

বললেন, তুই আগেই এসেছিস, ভাল করেছিস। দিনুবাবুর সেই চিরপ্রসন্ন মুখ আজ চিরবিষণ্ণ। হাসির ছটাতেও আগের প্রসাদ আর ফিরে এলো না।

শাস্ত্রীমশায়কে শেষের দিকে দেখতে পেতাম সন্ধ্যাবেলা রবীন্দ্র-সরোবরের ধারে বেড়াতে বেড়িয়েছেন, পিছনের দিকে এক ভৃত্য; প্রণাম করলে মাথায় হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, কেমন আছিস? কলকাতার সাউথ এণ্ড পার্ক নামে দক্ষিণে পল্লীতে বাড়ী তৈরী করে বাস করতেন। ঘর জোড়া ফরাসের মত বিছানা পাতা। সেখানেই বিশ্রাম, শয়ন ও অধ্যয়ন। ঘরের চারদিকে আলমারী ভরা গ্রন্থ। আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন—'বইগুলো কি করবো বলতে পারিস?'

আমি বললাম, 'কেন? শান্তিনিকেতনে দেবেন।'

তিনি সে কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুই যে একদিন বলেছিলি, হরিশ্চন্দ্রপুর হয়ে কাটিহার গিয়েছিলি?'

বললাম—'নামিনি, রেলগাড়ী থেকে দেখেছি রেল স্টেশন।'

'আর কি দেখেছিস?'

'দেখেছি গঙ্গার ওপারে সাহেবগঞ্জের পাহাড়গুলো।'

তিনি যেন আপন মনেই বার দুই বললেন—'হরিশ্চন্দ্রপুর, হরিশ্চন্দ্রপুর।'

বুঝলাম, অনেক কথা তাঁর মনে পড়ে গিয়েছে। ৺কাশী, হরিশ্চন্দ্রপুর, শান্তিনিকেতন, সাউথ এণ্ড পার্ক—আমি আর প্রসঙ্গটাকে টানলাম না। কারণ, বুঝলাম, ওগুলো তাঁর বড় বেদনার স্থান।

ঘর ভরা গ্রন্থরাশির মধ্যেও তিনি একা। মানুষ কত অসহায়।

ছাত্ররা ভাবলো তবু ভালো, শরৎবাবুকে জানাতে হবে না। শরৎবাবু পাকশালাব অধ্যক্ষ। তাঁর কড়া শাসন সম্বন্ধে নানারকম পীড়াদায়ক কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। পরবর্তী একাদশীতে দেখা গেল খান দশেক পাতে লুচি পড়েছে। তখন অন্য ছাত্ররা এসে বললো, তোমরা লুচি খাচ্ছ কী করে?

উত্তরে শুনতে পেলো, আমরা যে একাদশী করেছি।

—আমরাও করবো।

—কিন্তু ভাই, দুপুববেলায় কিছু খেতে পাবে না।

—তা হোক্। দুপুরবেলায় কোনো রকমে পেটে বালিশ দিয়ে শুয়ে থাকবো। লুচির লোভে সবই পারা যায়। একজন বললো, বালিশেও যদি না কুলোয় তবে সবাই মিলে গুরুদেবের সেই গানটা গাইবো 'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমাব নিমন্ত্রণ।'

এইভাবে পর পর কয়েকটি একাদশী গেলে দেখা গেল যে, পাকশালার সবগুলি পংক্তির ছাত্রদের পাতে লুচি। একজন গায়ক ছাত্র বলে উঠলো, আহা, গুরুদেব কী গানই না লিখেছেন, জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।

এই রকম সর্বজনীন একাদশী বোধ হয় দু-তিন পক্ষকাল চললো। কিন্তু এমন সময় রসভঙ্গ ঘটালো একদিন ক্ষিতিমোহন সেনের উপস্থিতি। তিনি ছিলেন ওখানকার সর্বাধ্যক্ষ। সর্বাধ্যক্ষ শব্দটির প্রকৃত অর্থ যাই হোক ক্ষিতিমোহনবাবুব কৃত ব্যুৎপত্তি হচ্ছে, যিনি সব্বার ধাক্কা খান। কিন্তু দেখা গেল শুধু ধাক্কাই খান না, ধাক্কা দিতেও পারেন।

একদিন তিনি সান্ধ্য ভ্রমণের পরে রান্নাঘরের পাশ দিয়ে বাড়ী ফিরছিলেন। ছেলেরা কী খায় দেখার জন্য উঁকি মারতেই দেখলেন "আনন্দ নিমন্ত্রণই" বটে। তিনি অবাক হয়ে দাঁড়ালেন। সম্বিৎ ফিরে পেলে জিজ্ঞাসা করলেন, হ, তোরা লুচি খাস্ যে! আজকে তোদের ফিষ্টি নাকি?

ক্ষিতিমোহনবাবুকে দেখা মাত্র অধিকাংশ ছাত্রের হাতের লুচি আর মুখে উঠলো না। অনেকের মুখের গ্রাস অচর্বিত রয়ে গেল।

—কথা বলস না যে?

কথা আর বলবে কি করে? কতক মুখের লুচি ও কতক পরিণামের ভয় তাদের নির্বাক করে দিয়েছে।

—সকলেরই পাতে যে লুচি দেখি!

তখন একজন সাহস সঞ্চয় করে বললো, আজ আমাদের একাদশী।

—এ যে সর্বজনীন একাদশী দেখছি। খা, খা। বলে তিনি চলে গেলেন। ছাত্রদের মধ্যে যারা পুরাতন ও বোদ্ধা, তারা বুঝল এখানেই সর্বজনীন একাদশীর শেষ। তার পরের একাদশীতে দেখা গেল সেই দুটি ব্রাহ্মণ বটুর পাতে লুচি, আর সবাই ডাল ভাত খাচ্ছে।

ক্ষিতিমোহনবাবুর বাড়ী ঢাকা জেলার সোনারঙ গ্রামে। তবে বাল্যকালেই তিনি শিক্ষার্থে কাশীধামে নীত হয়েছিলেন। সেখানেই এম, এ, পর্যন্ত পাঠ সমাধা হয়। তারপরে কাংড়াতে চাম্বা নামে এক পাহাড়ী রাজ্যে টোল ইন্সপেক্টার রূপে চাকরী করতে যান। তারপরে আগমন শান্তিনিকেতনে। শাস্ত্রী মশাই ও ক্ষিতিমোহনবাবু কাশীতে সহপাঠী ছিলেন। শাস্ত্রীমশাই-সূত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথা জানতে পেয়ে তাঁকে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকরূপে আহ্বান করে আনেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে জন্ম-সূত্র ছাড়া সোনারঙের সঙ্গে তাঁর যোগ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। কিন্তু হলে কী হয়। সোনারঙ ছেড়েছিলেন বটে; সোনারঙের ঢাকাই কথা ছাড়তে পারেন নি। তারই কিছু পরিচয় উপরে পাওয়া গেল।

ক্ষিতিমোহনবাবু শান্তিনিকেতনে যোগ দেওয়াতে রবীন্দ্রনাথের শক্তি অনেক বেড়ে গেল। আগেই বেড়েছিল শাস্ত্রী মশায়ের যোগ-দানে। এঁরা দুইজন রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ ও বামহস্ত হয়ে দাঁড়ালেন। শাস্ত্রীমশাই হলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে বৈদিক যুগের আর ক্ষিতিমোহন-বাবু ভারতের মধ্যযুগের প্রতিনিধি। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীতে এরা দুইজনে প্রাণ ও নূতন শক্তি সঞ্চার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে শাস্ত্রীমশাই বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সাহিত্য আয়ত্ত করে নিলেন আর ক্ষিতিমোহনবাবু মধ্যযুগের সাধু-সন্তদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথের। তৎপূর্বে কবীর, দাদু, রজ্জব প্রভৃতি নামে মাত্র পরিচিত ছিলেন বাংলা দেশে। রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে ও ক্ষিতিমোহনবাবুর অধ্যবসায়ে এদের সকলের সঙ্গে বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ক্ষিতিমোহনবাবুর সংগ্রহ থেকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী-কালে 'Hundred Poems of Kabir' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত

করেছিলেন। ইংরাজী পাঠকেরা কবীরের পরিচয় পেল।

ক্ষিতিমোহনবাবু ছাত্রদের বাংলা সংস্কৃত ও ইতিহাস পড়াতেন। তৎকালে ছোট ছেলেদের পাঠ্য ভারতীয় ইতিহাসের কোনো বাংলা বই ছিল না। ক্ষিতিমোহনবাবু মুখে মুখে ভারতের ইতিহাস বলতেন। পৌরাণিক যুগ থেকে হাল আমল পর্যন্ত তাঁর পড়াবার রীতি কিছু বিচিত্র ছিল। সংস্কৃত লিখতে গিয়ে কোনো ছাত্র ভুল করলে সেই ভুলের সংশোধিত রূপ পাঁচবার লিখে আনতে হতো পর দিনে। সেদিন লিখতে ভুলে গেলে ঐ পাঁচটি হয়ে যেত দশ। এইভাবে সংশোধিত রূপ ও তার বানান ছাত্রদের মনে গেঁথে বসে যেত। ইতিহাসের ঐ একটি মাত্র ক্লাস ছিল, ছাত্রসংখ্যা ৭০।৮০ জন হবে। ক্ষিতিমোহনবাবুর বর্ণনা কৌশলে সকলে নিঃশব্দে শুনতো। তবে ঐ ভুল সংশোধনের জটিল হিসাব রক্ষার জন্য একজন ছাত্রকে তিনি কেরাণীপদ দিয়েছিলেন। ক্লাস বসামাত্র সেই কেরাণী (পেশকার) ভুলের খতিয়ান দাখিল করতো। এইভাবে কিছু কষ্ট স্বীকার করে যারা শিখেছিল, তাদের বনিয়াদ বেশ পোক্ত হয়েছিল। আমার বড় ভুল হতো না। তাই কেরাণীর খাতায় আমার নামও ওঠেনি। ফলে আমার শিক্ষার বনিয়াদ কাঁচা থেকে গিয়েছে। কিছু শিখিনি; না বাংলা, না সংস্কৃত, না ইতিহাস। কিন্তু ক্ষিতিমোহনবাবুর এসব পরিচয় গৌণ। তাঁর মতো সুরসিক পণ্ডিত ও সভামোহন ব্যক্তি অল্পই দেখেছি। রসের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের এমন হরগৌরীর সমন্বয় আমার আর চোখে পড়েনি। কোনো সভাকে মুগ্ধ করে রাখবার তাঁর ক্ষমতা ছিল। সে সভা হয়তো মিশ্র বয়সের সভা—বৃদ্ধ, যুবক, বালক এবং নারী সকলের উপযোগী করে তিনি বলতে পারতেন। আর মাঝে মাঝে রসিকতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে সকলকে চমকিত ও দুর্গম পথকে আলোকিত করে তোলা তাঁর পক্ষে একান্ত সহজ ছিল। ইংরেজীতে যাকে Pun বলে, (বাংলায় কী বলে জানি না) সে শক্তিতে তিনি অতুলনীয় ছিলেন।

বিদ্যালয়ের দীর্ঘ ছুটির সময় তিনি উত্তর প্রদেশ ও গুজরাটে গ্রামে গ্রামে পদব্রজে ঘুরে সাধু সন্তদের বাণী সংগ্রহ করতেন। ফলে তাঁর ঐ সব অঞ্চলের লৌকিক ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল। লোকেও এই সন্ধানী পুরুষকে ভুলতে পারেন নি। আমি যখন বিশ্বভারতীর ছাত্র তখন নগেন পারিখ বলে এক যুবক এসেছিল

বিশ্বভারতীতে। সে এখন গুজরাটে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। এই সেদিন Tagore Research Institute-এর আমন্ত্রণে শ্রীযুত পারিখ এসেছিলেন। আর তিনি বাংলা ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে সকলকে বিস্মিত করে দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরো দুজন গুজরাটী লেখক এসেছিলেন। তাঁদের সকলেরই মুখ্য আলোচ্য বিষয় ক্ষিতিমোহনবাবুর গ্রাম সংক্রমণের বিবরণ। সেই গুজরাটী ব্যক্তিরা বললেন, গুজরাটের গ্রামাঞ্চলে তিনি বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলের চেয়ে বেশী পরিচিত। নগেন পারিখ সেকালের আশ্রমের অত্যন্ত তুচ্ছ বিষয়ও ভোলেন নি। এবং অতি সামান্য লোকের কথাও এমন কি আমার নামও তাঁর মনে ছিল।

ক্ষিতিমোহনবাবুর আসল শক্তির নাম কথকতাশক্তি। আরো কিছুকাল আগে জন্মালে তিনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে কথকতা করে বেড়াতে পারতেন। আমার কল্পনা করতে ইচ্ছা করে যে, সেই যুগের গ্রামে বুড়ো বটগাছটির তলে বাঁধানো বেদীতে তিনি কথকতা করতে বসেছেন; আর গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁকে ঘিরে চিত্রার্পিতবৎ বসে শুনছে তাঁর মধুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর। যেমন বাচনভঙ্গী তেমনি ব্যাখ্যার নিপুণতা, তেমনি বর্ণনার চাতুর্য। সেই মুগ্ধ জনতা কখনো হাসছে, কখনো অশ্রু মোচন করছে। মাঝে মাঝে যথাস্থানে হরিধ্বনি করে উঠছে। এরকম চলছে প্রহরকাল। আসর যখন ভঙ্গ হলো, তখন তিনি বললেন, আগামী কাল হবে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা। আজ হচ্ছিল রামের বনগমন বৃত্তান্ত। এইভাবে তিনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পুরাণ কথার বারি সিঞ্চন করে ঘুরতেন। তাঁর সে কণ্ঠস্বরের জাদু আমার এই সাদামাঠা ভাষায় বর্ণনা করে বোঝাতে পারবো না। আর সে কালের পল্লীসমাজের কথাই বা কেন বলি। একালের কলকাতার Sophisticated আসরে যেখানে নূতনত্বের নামে প্রাচীনত্ব উপেক্ষিত, সেই সব আধুনিক বাবুদের আসরকেও নিস্তব্ধ করে ফেলতে পারে তাঁর কণ্ঠস্বরের যাদুতে। আর শান্তিনিকেতনের তো কথাই নেই। সেখানে কী মন্দিরে উপদেশ দান, কী সাহিত্যসভায় ভাষণ দান, সেই স্বরগ্রামের মাধুর্য অতুলনীয় হয়ে ওঠে।

ক্ষিতিমোহনবাবু স্বভাবত গম্ভীর প্রকৃতির লোক। কিন্তু বরাবর লক্ষ্য করেছি গাম্ভীর্যের সঙ্গে রসিকতার জাত-শত্রুতা নেই; বরঞ্চ

পিঠোপিঠি দুই ভাইয়ের মতো এদের সঙ্গে সম্বন্ধ। মাঝে মাঝে আড়াআড়ি হয়, তবে তারা সহোদর বই নয়। দুয়েরই জন্ম গভীরতার জঠরে। যথার্থ হাস্যরসের মধ্যে একপ্রকার গভীরতা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত একাধারে হাস্যরসিক ও দার্শনিক। আবার রাজশেখর বসু এতই স্বভাবগম্ভীর মেজাজ যে, অনেকে তাঁর মধ্যে পরশুরামকে খুঁজতে গিয়ে হতাশ হয়েছেন। এই ছিলেন আমাদের ক্ষিতিমোহনবাবু। তিনি একদিকে ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী এম. এ, আবার সমবয়স্কদের কাছে ঠাকুর্দা। রবীন্দ্রনাথের নাটকে ঠাকুর্দা নামক ব্যক্তিরা এই বিষম উপাদানে গঠিত।

যাই হোক্, তিনি শান্তিনিকেতনে আসবার অচিরকাল মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পার্ষদ হয়ে দাঁড়ালেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যে সব বক্তৃতা করেছেন, আলোচনা করেছেন, তার আদ্যন্ত নোট নেওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল। সেই নোটের সামান্য একাংশ 'বলাকা কাব্য পরিক্রমা' নামে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বহুলাংশ গেল কোথায়? ক্ষিতিমোহনবাবু তার মূল্য বুঝতেন। আর অবহেলায় সেগুলি নষ্ট করবার লোকও তিনি ছিলেন না। কাবো না কারো কাছে সেই গুপ্তধন নিশ্চয়ই সঞ্চিত আছে। তার আশুকর্তব্য, উই, ইঁদুর আর জলহাওয়ার প্রকোপ থেকে তাদের রক্ষা করে যথাযথভাবে প্রকাশ করা। তাতে রবীন্দ্রনাথের মনীষার যে প্রকাশ হবে তা অদ্যাপি অজ্ঞাত। আবার ক্ষিতিমোহনবাবু চায়ের আসরে বা পথে-ঘাটে চলতে চলতে সঙ্গীদের সঙ্গে যেসব কথাবার্তা বলেছেন তারো কেউ 'নোট' রাখেন নি। ফলে আমরা তার একাংশ-মাত্র জানি। বিদ্যাসাগর আশ্চর্য বাক্-কুশলী ছিলেন। তার কতটুকুই বা আমরা জানি! আমরা জাত হিসেবে এসব বিষয়ে উদাসীন। শ্রীম মদি 'কথামৃত' না লিখে যেতেন, তাহলে 'পরমহংসদেব'কে এত কাছের মানুষরূপে আমরা কি পেতাম?

॥ ১৫ ॥

সতীশচন্দ্র রায়

অনেক দিন আগে একখানি ফটোগ্রাফে একটি ছাতার তলে তিনজন যুবকের ছবি দেখেছিলাম। এমন তো কতই দেখি। কিন্তু যে কারণে কথাটা মনে আছে তা হলো এই তিন যুবক পরবর্তী জীবনে অল্পবিস্তর খ্যাতি লাভ করেছিলেন। একজন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত আর একজন অজিতকুমার চক্রবর্তী, তৃতীয়জন সতীশচন্দ্র রায়। এই পরিচ্ছেদের নায়ক এই তৃতীয় ব্যক্তি। এঁরা তিনজনেই রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দুজন আদিম কালের শান্তিনিকেতনে এসে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। আরো ১টি বিষয়ে এই তিনজনের মধ্যে মিল ছিল। তিনজনেই ছিলেন স্বল্পায়ু। অজিতবাবু ৩২ বছর বয়সে ১৯১৮ সালের ভারতব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে মারা গিয়েছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মারা গিয়েছিলেন ৪০ বছর বয়সে, তবে একে বেশী বয়স বলা চলে না, আর এই পরিচ্ছেদের নায়ক সতীশচন্দ্র রায় ২২ বছর বয়সে মারা গিয়েছেন। এই ২২ বৎসরে অকালপ্রয়াত যুবককে নিয়ে যে লিখতে বসেছি তার কারণ তাঁকে নিয়ে এখনো যথেষ্ট আলোচনা হয়নি। অথচ তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিত আকারে গদ্যে ও পদ্যে যে সব মন্তব্য করে গিয়েছেন, তাতে মনে হয় তিনি বিশেষ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সতীশবাবুর সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করবার আগে সংক্ষেপে তাঁর জীবনকথা সেরে নেওয়া যেতে পারে।

বরিশাল জেলার উজীরপুর গ্রামের একটি পড়ন্ত জমিদার বংশের সন্তান ছিলেন তিনি। বি. এ. পড়তে এসেছিলেন কোলকাতায়। তখন জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তার আগে রবীন্দ্রনাথের কবিতার তিনি ভক্ত ছিলেন। এখন সেই ভক্তির সঙ্গে যুক্ত হলো সদ্য-প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে আকর্ষণ। বি. এ. পরীক্ষা না দিয়েই তিনি শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেওয়া স্থির করলেন। এ যে কত বড় ত্যাগ স্বীকার এবং সংকটের ঝুঁকি নেওয়া বন্ধুরা তা বুঝিয়ে বলা সত্ত্বেও এ আদর্শবাদী যুবক কিছুতেই নিরস্ত হলেন না। যোগ দিলেন শান্তিনিকেতনের কাজে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ

হয়ে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিয়েছেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা খুব অল্প নয়। তাঁদের মধ্যে দেশী ও বিদেশী সব দেশের মানুষই আছে। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ এবং পিয়ার্সনের নাম সকলের মনে পড়বে। কিন্তু তাঁরা পড়াশোনা চুকিয়ে দিয়ে এসে যোগ দিয়েছিলেন। আর তাঁদের বয়সও কিছু বেশী ছিল। আর তা ছাড়া তাঁদের উপর পারিবারিক দায়িত্ব ছিল না। সব দিক দিয়ে বিচার করলে সতীশবাবুর আত্ম-ত্যাগের মূল্য অনেক বেশী। মনে হয় বিদেশী দুইজনের চেয়েও। এটা খুব উচ্চ দাবী করা হলো সতীশবাবুর অনুকূলে। তবে এ দাবীর পক্ষে এক রবীন্দ্রনাথের লিখিত উক্তি ছাড়া আর তাঁর নিজের মুষ্টিমেয় রচনা ছাড়া বিশেষ কিছু বলবার নেই। কিন্তু যখন মনে হয় এই প্রতিভাবান আদর্শনিষ্ঠ যুবক মাত্র ২২ বৎসব বয়সে মারা গেলেন, তার সঙ্গে যদি পরবর্তী সম্ভাবিত বয়সটা মিলিয়ে নেওয়া যায় তবে এ দাবীকে অযৌক্তিক মনে হয় না। যা তিনি করে গিয়েছেন তার পাশে এসে দাঁড়ায় যা তিনি করতে পাবতেন। আর এই দুইয়ে মিলে তাঁর দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলে। এবারে সম্ভাবনার ক্ষেত্র থেকে সম্ভাবিতের ক্ষেত্রে পদার্পণ করা যেতে পারে।

তখন শান্তিনিকেতন সদ্য প্রতিষ্ঠিত। একটি প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে গোটা দুই পাকা বাড়ি আব কিছু খড়ের ছাউনি মাটির ঘর—এই ছিল তখন শান্তিনিকেতনের বহিরবয়ব। জনসংখ্যা খুব বেশি তো ৫০ জনের মতো। দেশেব অন্যান্য বিদ্যালয়ে শিক্ষার ছকের মতো এখানে কিছুই সুনির্দিষ্ট ছিল না। এমন কি পরবর্তীকালে যে সঙ্গীত শান্তিনিকেতনের পরিচয় স্বরূপ হয়ে উঠেছিল, তাও ছিল না। কারণ তখনো সকল গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এসে যোগ দেননি। এই সময়কার শান্তিনিকেতনী বিবরণ কিছু কিছু পাওয়া যাবে সতীশবাবুর লিখিত ডায়েরী থেকে। আর পাওয়া যাবে তৎকালে যাঁরা সতীশ-বাবুকে দেখেছিলেন তাঁদের মুখ থেকে। আমি যখন প্রথম শান্তি-নিকেতনে যাই, তখনও তাঁর স্মৃতি সজীব ছিল। একদিন কালিদাস-বাবুর সঙ্গে, এঁর কথা আবার পরে আসবে, পারুলডাঙায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। তিনি একটি বড় গাছ দেখিয়ে বললেন, কি গাছ এত দিন পরে মনে নেই, এই গাছের উপরে উঠে বসে সতীশবাবু গুরুদক্ষিণা বইটি লিখেছিলেন। গুরুদক্ষিণা বইটি আমাদের পাঠ্য ছিল। আমরা

পাস করে বেরোবার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত বইখানা পাঠ্যশ্রেণী-ভুক্ত ছিল। ঐ বই বিক্রীর লভ্যাংশ সতীশবাবুর পরিবারকে পাঠিয়ে দেওয়া হতো।

তার পরেই নূতন লোক সব এলেন, তাঁদের কাছে সতীশবাবু একটি উপচ্ছায়া মাত্র, আর গুরুদক্ষিণা বইখানার মূল্য বুঝবার শক্তি বোধ হয় তাঁদের ছিল না। যে কারণেই হোক বইখানার আর পাঠ্য-শ্রেণীভুক্ত রইলো না। এই বইখানা সম্বন্ধে বিস্তারিত করে বলছি এই জন্য যে তার ভূমিকায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এর চেয়ে বিস্তারিত যে মন্তব্য করেছেন, তার মূল্য এতটুকুও হ্রাস পায়নি। যেসব প্রকাশক ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ ছাপিয়ে অর্থ উপার্জন করেন, তাঁদের দৃষ্টি অত্যন্ত সীমা-বদ্ধ বলে গুরুদক্ষিণা বইটা তাঁদের চোখে পড়েনি। ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ-প্রকাশকদের দৃষ্টি এক বিচিত্র ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে সতীশবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু অজিত চক্রবর্তীর "রবীন্দ্রনাথ" এবং "কাব্য পরিক্রমা" নামে যে দুখানা রবীন্দ্র সমালোচনা বিষয়ক পুস্তক পরবর্তী সমস্ত রবীন্দ্র সমালোচনা ধারার ভগীরথ স্বরূপ, দীর্ঘকাল বই দুখানা ছাপা ছিল না, আর অজিতবাবুরও মৃত্যুর পরে পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে, তবুও কোনও প্রকাশকের দৃষ্টি বই দুখানার উপরে পড়েনি। ওঁরা লেখকের প্রাপ্য রয়্যালটি দেবার ভয়ে সর্বদা সঙ্কুচিতহস্ত। এক্ষেত্রে রয়্যালটির সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে বই দুখানা। তবু তাঁদের দৃষ্টি এদিকে পড়েনি। এমন কি আমি বই দুখানা হাতে তুলে দেওয়া সত্ত্বেও অনেকদিন তাদের হিমঘরে মজুত অবস্থায় ছিল। তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করেছি, কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে রবীন্দ্রসাহিত্য পড়বার পক্ষে বই দুখানা অপরিহার্য। সুখের বিষয়, কোনও উৎসাহী প্রকাশকের দৃষ্টি এতদিন পরে বই দুখানার দিকে পড়ায় তারা অখণ্ড আকারে মুদ্রিত হয়েছে। কিছুদিন পরেই তাঁরা বুঝতে পারবেন, রবীন্দ্রসাহিত্যের ছাত্রছাত্রীর কি উপকার তাঁরা করলেন। এবং তাঁদের নিজেদেরও কোনও ক্ষতি হবে না। যাই হোক্ গুরুদক্ষিণা বইটি যে মহীরুহের ডালে বসে লিখিত হয়েছিল, সে প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি।

এই তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের মনে যে গভীর ছাপ ফেলেছেন. এই বয়সের আর কোনো বাঙালী কবি তেমন ফেলেছেন বলে জানি না।

নানা স্থানে নানা প্রসঙ্গে তিনি সতীশচন্দ্রের কবিত্বের ও মনস্বিতার প্রশংসা করেছেন। 'গুরুদক্ষিণা' গ্রন্থের ভূমিকায় এবং 'বন্ধুস্মৃতি' নামে প্রবন্ধে সতীশচন্দ্রের প্রতিভার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে। আর শেষ বয়সে তিনি 'বনবাণী' নামে যে কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন তার 'শাল' শীর্ষক কবিতায় সতীশচন্দ্রের আভাসে উল্লেখ আছে। সে আজ কতদিনকার কথা। সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে পঞ্চাশ বছরের বেশী অতিক্রান্ত হয়েছে। তবু তাঁর কথা ভুলতে পারেননি। কাজেই বুঝতে পারা যাবে কী গভীর ছাপ সতীশচন্দ্র ফেলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মনের উপরে। আমি আগে উল্লেখ করেছি যে, কোনো ষোলআনা প্রকৃতিস্থ মানুষ শান্তিনিকেতনে যেত না, আর গেলেও দীর্ঘকাল থাকতে পারতো না। সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে একথা যেমন সত্য তেমনি বুঝি আর কারো সম্বন্ধে নয়।

একদিন গ্রীষ্মের দুপুরে কয়েকজন অধ্যাপক মিলে গান ও গল্পের দ্বারা সেকালের শান্তিনিকেতনে দাবদাহে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছিলেন। এমন সময়ে দেখতে পেলেন সতীশচন্দ্র কোথায় সরে পড়েছেন। কোথায় গেলেন খোঁজ করতে বাইরে বেরিয়ে দেখতে পেলেন ভীষণ ধুলো-ঝড় উঠেছে। আর সেই ঝড়ের মধ্যে দূরে সতীশচন্দ্রের আবছায়া মূর্তি দেখা যাচ্ছে। এ কী প্রকৃতিস্থ মানুষের ব্যবহার! আর ওই যে আগে বলেছি পারুলডাঙাতে একটা বড় গাছের উপরে উপবিষ্ট হয়ে 'গুরুদক্ষিণা' বইখানা লিখেছিলেন, সেটাও নিশ্চয় প্রকৃতিস্থ-জনোচিত ব্যবহার নয়।

এই সময়ে একবার ছুটিতে সতীশবাবু, দিনুবাবু ও আরো দু-একজন মিলে পশ্চিমে বেড়াতে গেলেন। কতদূর গিয়েছিলেন জানি না, তবে আগ্রা পর্যন্ত যে গিয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কারণ তাজমহল দর্শন সম্বন্ধে তাঁর একটি কবিতা পাওয়া যায়।

শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে কিছুদিন পরে সতীশবাবু বসন্তরোগে আক্রান্ত হলেন। তখনকার জনবিরল শান্তিনিকেতন ছুটি উপলক্ষ্যে জনশূন্য। পীড়িত কবি আশ্রয় নিলেন লাইব্রেরীর পশ্চিম'দকের ঘরটিতে। এই মহাসংক্রামক রোগে তাঁকে দেখাশোনা করতেন রাজেনবাবু আর কোদো নামে দুম্‌কাবাসী একজন আদিবাসী লোক। বসন্তরোগে তখন কোনো চিকিৎসা ছিল না। এখনো নেই। কেবল

ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা। রোগের জ্বালায় সতীশবাবু মাঝে মাঝে মাঠের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে যেতেন। খুঁজে ধরে নিয়ে আসতো ঐ কোদো নামে লোকটি। এমন সময়ে একজন বসন্ত-চিকিৎসক জুটে গেল। তারা 'গুণী' নামে পরিচিত। রাজেনবাবু তাকে যত্ন করে নিয়ে এসে রোগীটিকে দেখালেন। তখন সতীশবাবু পূর্বোক্ত ঘরটিতে শুয়ে ছিলেন। রাজেনবাবুরা ছিলেন বাইরে।

কিছুক্ষণ পরে সেই চিকিৎসক বেরিয়ে এসে রাজেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, "রোগী আপনাদের কে হয়?"

রাজেনবাবু বললেন, "কেউ নয়, এই স্কুলটির একজন শিক্ষক।"

তখন বিস্মিত সেই 'গুণী' বললো, "তবে কী সাহসে আপনারা এখানে আছেন?"

"কেন?"

"কেন কি মশায়, এখনি পালান। আর কালবিলম্ব করবেন না। আমি অনেক বসন্তরোগীর চিকিৎসা করেছি, কিন্তু এমন গুরুতর রোগ, এমন বড় বড় গুটি আগে কখনো দেখিনি।"

রাজেনবাবুরা বুঝলেন চিকিৎসক ভীষণ ভীত হয়ে গিয়েছে। তাকে দিয়ে আর কোনো কাজ হবে না। বললেন, "আচ্ছা, আপনি তবে আসুন।"

গুণী বলে উঠলো, "এখনো বলছি আপনাবা সবে পড়ুন, ও রোগী তো বাঁচবেই না, মাঝে থেকে আপনারাও প্রাণে মারা পড়বেন।" এই বলে নিজেই দৃষ্টান্ত স্থাপনে পুঁটলিপোঁটলা নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো। রাজেনবাবু ও কোদো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িযে বইলেন। রাজেনবাবু ভাবছিলেন এখন কি কবা যায়! রবীন্দ্রনাথ তখন ছিলেন শিলাইদহে। একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি সে আমলে শান্তিনিকেতনে তিনবার ছুটি হতো। গ্রীষ্মে, পূজোয় আর শীতে। তখন মাঘ মাস। শীতের ছুটি চলছে রবীন্দ্রনাথ আগেই জেনেছিলেন যে সতীশবাবু বসন্ত-রোগে আক্রান্ত তিনি রাজেনবাবুকে জানিয়েছিলেন, ছাত্রদের যেন জানানো হয় শীতের ছুটির পরে সবাই শান্তিনিকেতনে না গিয়ে শিলাইদহে যেন আসে।

সেদিন মাঘী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় আকাশ কানায় কানায় ভরে গিয়েছে। আর একবিন্দু বাড়লেই আকাশ উপচে পড়বে। সেই

মাঘী বসন্তের রাতে গুণীর কথা সত্য হয়ে দেখা দিল। রোগের নিদারুণ জ্বালায় রোগী ঘর ছেড়ে ছুটে পালালো। অনেক খুঁজে তাকে পাওয়া গেল নীচু বাংলার কাছে একটি ডোবার জলের মধ্যে। সেই দুর্দান্ত সাহসী কোদো নামে ভৃত্যটি সেই রোগীকে কাঁধে করে নিয়ে এলো সেই ঘরে। কিন্তু সেই ঘরে আর বেশীক্ষণ থাকতে হলো না সতীশবাবুকে। মাঘী পূর্ণিমার চন্দ্র অস্ত যাওয়ার মুখে এই প্রতিভাবান তরুণ কবি-জীবন অস্ত গেল।

এসব কথা বাজেনবাবুর মুখে আমার শোনা। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর সৎকারের কী ব্যবস্থা হলো?

তিনি বললেন, বসন্তরোগীকে তো দাহ করে না। আবার সমাধি দেওয়াও আমাদের সংস্কারবিরুদ্ধ। তাই কোদো তাকে কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে পুবদিকে ঐ পাহাড়টার উপরে ফেলে দিল।

তখন শান্তিনিকেতনের চৌহদ্দী এত সংকীর্ণ ছিল যে, পাহাড়টা অনেক দূরের বলে গণ্য হতো। পাহাড়টা এত দূরের বলে গণ্য হতো যে সেখানে বসন্তরোগীর দেহ ফেলে দিলেও এই ক্ষুদ্র পল্লীর অধিবাসীদের বিপদের আশঙ্কা আছে বলে কেউ মনে করতো না। এইভাবে অকালে আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে এই প্রতিভাবান তরুণ কবির জীবনের অবসান ঘটে গেল।

॥ ১৬ ॥

উৎসবরাজ দিনেন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের সকল গানের ভাণ্ডারী সকল নাটের কাণ্ডারী শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথ, সাধারণভাবে শান্তিনিকেতনিকগণের দিনুবাবু, বন্ধুগণের দিনুসাহেব, গানের প্রিয় ছাত্রদের দিনদা—শান্তিনিকেতনের প্রায় প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই আশ্রমটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে দীর্ঘদিন তিনি ছিলেন অনাগারিক, অর্থাৎ নির্দিষ্ট বাস-স্থানহীন। একেবারে প্রথম আমলে যখন এখানে আসতেন, থাকতেন নীচু বাংলায় পিতামহ দ্বিজেন্দ্রনাথের বাসস্থানে। তারপরে তাঁকে সাময়িক ভাবে থাকতে দেখেছি নূতন বাড়ির বড় হল ঘরটায়।

আমার আবাস ছিল বীথিকাগৃহে, নূতন বাড়িথেকে বিশগজ দূরে। এখনো বেশ মনে পড়ে সন্ধ্যাবেলা যখন তিনি ফিরে আসতেন তখন তাঁর "নীলমণি" রামপ্রসাদ একখানা কাঠের চেয়ারে তাঁকে বসিয়ে পা ধুইয়ে দিত। দিনুবাবু অবশ্য তাকে "নীলমণি" বলে ডাকতেন না। কিন্তু ঐ পা ধোয়াবার সুবাদে 'রামপ্রসাদ' 'আরামপ্রসাদ' বলে অভিহিত হলে কেউ বিস্মিত হত না। তারপরে তিনি উঠে এলেন দেহলী বাড়িতে, রইলেন দীর্ঘকাল। বস্তুত যে-দুটি বাড়ির সঙ্গে তাঁর স্মৃতি বিশেষভাবে জড়িত তার একটি দেহলী। এখানেই বারে বারে রবীন্দ্রনাথকে ছুটে আসতে দেখা যেত ভুলে যাওয়ার আগে নতুন গানের কুঁড়িগুলি দিনুর হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে। তারপরে এল বিশেষভাবে তাঁর জন্যেই তৈরি "বেণুকুঞ্জ" নামে গৃহটি। 'বেণুকুঞ্জ' নামটি দ্ব্যর্থক। ঐ বাড়িটির কাছ বরাবর ছিল এক সার বাঁশ গাছ, দ্বিতীয় অর্থটা মনে করিয়ে দেয় সকল গানের ভাণ্ডারীকে। আর শান্তিনিকেতনের ভূমিতে তাঁর শেষ নিবাস সুরপুরী নামে বিখ্যাত। বাড়িটি তৈরি করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারপরে ঘুরে ফিরে এল সকল গানের ভাণ্ডারীর হাতে, এটিই তাঁর শান্তিনিকেতনের শেষ গৃহ।

এইসব গৃহে দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় তাঁদের কাছে তিনি দিনুবাবু কিম্বা দিনু। তবে তাঁকে দিনুসাহেব বলত কারা?

আশ্রম বাসকালের একেবারে প্রথম আমলের বন্ধুদের কাছে তিনি ছিলেন দিনুসাহেব। কিন্তু একজন ছাড়া তাঁদের স্মৃতি আমার কাছে কালের পক্ষাঘাতে ঝাপ্‌সা। যাঁর স্মৃতি ঝাপ্‌সা হয়নি তিনি প্রথম আমলের লোক হলেও পরিণত বয়সে শিক্ষক হয়ে আবার ফিরে এলেন। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য চন্দননগরের উপকণ্ঠস্থ খলিসানির বাসিন্দা। চন্দননগরের ছাত্রদেব কাছে তিনি মাস্টারমশায়। শুধু তাই নয়, সেকালের চন্দননগর আর মাস্টারমশায়দেব অনেক গুণ তাঁর ছিল। ছাত্রদের তিনি বিপ্লবের কানমন্ত্র দিতেন। অর্থাৎ সবাসরি বিপ্লবের শিক্ষাগুরু না হয়েও ছিলেন বিপ্লবের প্রাইভেট টিউটর। সেকালের শান্তিনিকেতনের পুরাতন পরিচয় আবার নূতন ভাবে ঝালাই হল। নরেনবাবুব মুখেই শুনলাম দিনুসাহেব শব্দটা। দুই পুরাতন বন্ধু বিকালবেলায় সুরপুরীর দোতলায় বসে ঘোলের সরবৎ পান করতে করতে পুরানো সেই দিনের কথাকে মনের মধ্যে ওলট-পালট করতেন।

আর তাঁকে দিন্‌দা নামে অভিহিত হতে শুনেছি তাঁর গানের প্রিয় ছাত্র অনাদি দস্তিদারের মুখে। অনাদি আমার বাল্যবন্ধু। সে যে দিনু-বাবুকে দিন্‌দা বলবে এটা এমন বিস্ময়ের নয়—গানের ছাত্ররা অনেকেই বলত দিন্‌দা। অনাদির দিন্‌দা উল্লেখে কিছু বিশেষ ছিল। তখন অনাদি দুরারোগ্য রোগেব কবলমুক্ত হয়ে উঠেছে বৎসরকালব্যাপী ভোগের পরে। তখন সে প্রাণটা ফিবে পেয়েছে পায়নি একালের স্ফূর্তি, মনের মধ্যে জড়িয়ে আছে চৈতন্যের আলো-আঁধারি ভাব, সেই আলো-আঁধারির মধ্যে একটি শিখা ছিল রবীন্দ্রনাথের 'সকল গানের ভাণ্ডারীর'—অনাদির সঙ্গীত-শিক্ষাগুরুর মধুর স্মৃতি। তাই সে বাড়ির লোকজনার উদ্দেশ্যে বলত, "তাড়াতাড়ি ভাত দাও দিন্‌দা বসে আছেন।" কিম্বা বলত "দেবি হলে দিন্‌দা রাগ করবেন"। অনাদির এইসব উক্তি লোকমুখে যখন আমার কানে আসত ভাবতাম সে কী রকম গুরু, সে কা রকম ছাত্র, মৃত্যুর গুহার মধ্যে যার হাত প্রবেশ করেছে। এতে পাওয়া যায় ছাত্রদের উপরে দিনুবাবুর প্রভাব।

এইসব দুজনেরই স্মৃতি ছড়িয়ে আছে, গুরুর ও শিষ্যের। দিনুবাবুর গানের ভাণ্ডারে আমার প্রবেশের অধিকার ছিল না তবে যেখানে তিনি ছিলেন সকল নাটের কাণ্ডারী সেখানে কিছু কিঞ্চিৎ প্রবেশ ছিল, অনেকেই বলত অনধিকারে। তবে সেকথা এখন থাক্‌,

যথাসময়ে আসবে। তবে এখনো মনে তাঁর একটা স্মৃতি আছে। তিনি আমাদের পড়িয়েছিলেন কীট্‌সের কাব্য। Endymion আর Ode বা স্তবগাথাগুলো। Endymion কীটসের শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যে নয়, কিন্তু দিনুবাবুর পড়াবার জাদুতে Endymion-এর সুন্দর বনে আমি প্রবেশাধিকার পেয়েছিলাম আর এখনো তা আমার কাছে শ্রেষ্ঠ কবিতা হয়ে আছে। আর দুটি Ode-এর মধ্যে Grecian urn এবং নাইটিংগেল পাখির উপরে লিখিত কবিতা দুটি। আজ ষাট বছর পরেও তাদের জাদু ক্রিয়ার অবসান ঘটেনি। বিশেষভাবে নাইটিংগেল পাখির উপরে লিখিত কবিতাটি পঠিত দেশী-বিদেশী যাবতীয় কবিতার মধ্যে আজও শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। ঐ কবিতাটির স্বর্ণ কুঞ্চিকায় আমার কাছে খুলে দিয়েছিল কবিতার স্বর্ণভাণ্ডার। এখনো আজ ষাট বছর পরেও কারণে অকারণে ঐ কবিতাটির ছত্র-বিশেষ মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। সে কি কেবল কীটসের প্রতিভায়! কীটসেব প্রতিভার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল দিনুবাবুর কণ্ঠের জাদু। একথা সত্য যে তাঁব গানেব ভাণ্ডাবে আমি প্রবেশ করতে পারিনি, তবে জানলা দিয়ে উঁকি মেবে ভিতরের রহস্যের কিছু স্বাদ গন্ধ পেয়েছি। আমার মতো অ-সুবের পক্ষে যদি দিনুবাবুর কণ্ঠের এমন জাদু হয় তবে অনাদির মতো সুরলোকের অধিবাসীর পক্ষে চৈতন্যের আলো-আঁধারিতে দিনুবাবু যে দিন্‌দা রূপে প্রতিভাত হবেন তাতে আব বিস্ময়ের কি আছে?

সমস্ত ভ্রাতুষ্পৌত্রদের মধ্যে দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সব-চেয়ে প্রিয়। শেষ বয়সে একবার রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং-এ গিয়ে আসানটুলি নামে একটি বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন। ঘটনাচক্রে আমি তখন দার্জিলিংয়ে ছিলাম, যাতায়াত ছিল আমার রবীন্দ্রনাথের কাছে। সেখানে গিয়ে তাঁর মনে পড়ল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি জিনিস সঙ্গে আনতে ভুলে গিয়েছেন, সেটি আর কিছুই না—দিনেন্দ্র-নাথ। তিনি তাঁকে লিখে পাঠালেন—"রবিদাদা কহে কৈসে গোঙায়বি দিনু বিনে দিন রাতিয়া।" অবিলম্বে ফলোদয় স্বরূপ দিনেন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হলেন। তিনি কখনো তাঁকে হাতছাড়া করতেন না। জোড়াসাঁকোয়, শান্তিনিকেতনে, শিলাইদহে, রামগড়ের পর্বত শিখরে, যেখানে রবি সেখানে দিন। বস্তুত তাঁদের তিন পুরুষ শান্তিনিকেতনের

অধিবাসী ছিলেন। নীচু বাংলায় রাজর্ষি দ্বিজেন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতনের আদি অট্টালিকায় দ্বিপেন্দ্রনাথ,—যাঁকে এণ্ড্রুজ সাহেব বলতেন মহারাজ আর শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন গৃহে উৎসবরাজ দিনেন্দ্রনাথ, যাঁকে নিয়ে আমাদের এই পরিচ্ছেদ। রবীন্দ্রনাথ তথা এই সব ব্যক্তির সেবক হওয়া একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের সেবক তিনজন রবীন্দ্রসাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে, দ্বিজেন্দ্রনাথের সেবক মুনীশ্বর স্থান পেয়েছে শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে। দিনেন্দ্রনাথের তেমন সেবক-সৌভাগ্য ছিল না। একজনের নাম ছিল রামপ্রসাদ, অপরজনের নাম কেদার, নিকটবর্তী ভুবনডাঙা গ্রামের অধিবাসী। লোকটি ছিল ভাঁড়ুদত্তের পাল্টা সংস্করণ। বাহারে এবং ব্যবহারে দুই রকমেই। তাকে সন্দেশ আনতে দিলে সেগুলো আকারে ছোট হয়ে যেত। জিজ্ঞাসিত হলে বলত, মা কি আর বলব চিনির যা দাম।

দিনুবাবুর স্ত্রী বলতেন, তা বটে, কিন্তু ক্রমেই যে ছোট হয়ে যাচ্ছে।

—চিনির দাম যে ক্রমেই বাড়ছে মা।

—তবে সন্দেশ থাক, কাল থেকে রসগোল্লা আনবে।

—বেশ মা তাই হবে।

তখন সে টেকনিক বদলাল। রসগোল্লাগুলো তুলে নিয়ে চুষে রস আকর্ষণ করত, তারপরে আবার রসের মধ্যে ছেড়ে দিলেই সরস হয়ে যেত। এইভাবে কিছুদিন চল্‌ল। কিন্তু সংসারে অজেয় কে? রসগোল্লা তখনও অখণ্ড মণ্ডলাকারং থাকত কিন্তু একদিন বোধ করি রসে চাপ বেশি দিয়েছিল। ভিজে গিয়েছিল তার কাঁধের গামছাখানা। বেচারীর চাকরিটা গেল।

এখানে সংক্ষেপে দিনুবাবুর পিতা ও পিতামহের বর্ণনা সেরে নেওয়া যেতে পারে। সৌজন্য গুণটা মজ্জাগত ব্যাপার। দ্বিজেন্দ্রনাথের দর্শনাভিলাষী কোনো ব্যক্তি তাঁর কাছে গেলে তিনি বলতেন, 'বসুন আপনারা।' তারা উপবিষ্ট হলে বলতেন,'আপনাদের স্নানাহার হয়েছে তো?' রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলে প্রথমেই তিনি বলতেন 'বসুন' বা ব্যক্তিভেদে 'বোস্'। তাঁর ঘরে কয়েকটি বাড়্‌তি মোড়া থাকত, তারই একটির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করতেন। আমার মতো খুচরো ও নিত্য ব্যক্তির প্রতিও এই নির্দেশ ছিল। একটি মোড়া অধিকার করে বসলে তবে পরে অন্যকথা। আর কোনোরকমে রবীন্দ্রনাথের

অনুকরণ করতে না পেরে (চেষ্টা করেছি কিন্তু কাজটা সহজ নয়) কয়েকটি মোড়া সংগ্রহ করেছি। খুচরো বা পাইকারি কোনো ব্যক্তি দেখা করতে এলে আগে বলি 'বসুন'। বা 'বোসো'। এই হিসাবে আমি অবশ্য রবীন্দ্রানুসারী বা রবীন্দ্রানুকারী। আর দ্বিপেন্দ্রনাথের বর্ণনায় কিছু বেশি স্থান আবশ্যক। তবে তা গ্রন্থান্তরে সেরে নিয়েছি। এখানে বাকি অংশ বলা যেতে পারে। তিনি বাড়িটার উত্তর দিকের বারান্দায় সকাল বেলাতেই দরবার জমিয়ে বসতেন। দরবারিরও অভাব হত না। কারণ রাতের গাড়িতে কলকাতা থেকে নিত্য আসত নানারকম উপাদেয় ভোজ্য। সে খবর কে না রাখত। তাঁর রাজকীয় বেশভূষা চেহারা ও উদারতা দেখে এণ্ড্রুজ তাঁকে মহারাজা বলে ডাকতেন।

কিছুদিন এণ্ড্রুজ বাড়িটার দোতলায় থাকতেন, সারাদিন বসে বসে তিনি দেশ-দেশান্তরে লিখতেন চিঠিপত্র। বারে বারে তাঁকে যেতে হত নিকটস্থ ডাকঘরে। তাঁর এই অভ্যাস লক্ষ্য করে দ্বিপুবাবু বলতেন, তুমি কেন বারে বারে ডাকঘরে যাও। ডাকঘরে আমার হিসাবে কিছু টাকা জমা দেওয়া আছে, তোমার চিঠিপত্র পাঠিয়ে দিলেই চলবে, তোমাকে কষ্ট করে ডাকটিকিট সংগ্রহ করতে হবে না।

মাসান্তে ডাক-বাবু করজোড়ে দ্বিপুবাবুর কাছে নিবেদন করলে, আপনার হিসাবে আর কিছু টাকা জমা দিলে ভালো হয়।

—কেন, কত ছিল ?

—আজ্ঞে, ষাট টাকা।

এক মাসে এণ্ড্রুজের ডাক-খরচ ষাট টাকা শুনে তাঁর বড় বড় চোখ দুটি বিস্ফারিত হল, কিন্তু সঙ্কুচিত হল না তাঁর রাজকীয় উদারতা। এমন ব্যক্তিকে মহারাজা সম্বোধন ভাষার অপব্যবহার বলা চলে না।

আর উৎসবরাজ দিনেন্দ্রনাথের বিবরণ এত সংক্ষেপে দেওয়া চলে না, কারণ এঁদের সকলের চেয়ে বেশিদিন আশ্রমে বাস করেছেন তিনি। শুধু তাই কি, কালক্রমে আশ্রমের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সকল গানের ভাণ্ডারী সকল নাটের কাণ্ডারী বলেছেন, বাড়িয়ে বলেন নি। তিনি নাটক শিখিয়েছেন, গান শিখিয়েছেন, মাত্র কি এই ! ছেলেদের ইংরাজী বাংলা ক্লাস নিয়েছেন, ছাত্রদের খেলার মাঠে ফুটবলের প্রতিযোগিতা চলছে সেখানে তিনি,

ছেলেরা বনভোজনে চলল তিনি চললেন সঙ্গে, ছাত্রদের ভ্রমণের তিনি সঙ্গী, কেঁদুলীর মেলায়, নানুরের মেলায় সঙ্গে আছেন দিনুবাবু। আশ্রমের অঙ্গীভূত হওয়া আর কাকে বলে। আর সমস্তই বিনা পয়সায়।

শুধু শান্তিনিকেতনের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে একাঙ্গতা নয়—রবীন্দ্রনাথের নাট্যধারার উপরেও তাঁর প্রভাব অসীম। শারদোৎসব থেকে শুরু করে পরবর্তী সমস্ত নাটক দিনেন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে কল্পনা করা যায় না। এইসব নাটকের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে এদের গীতিবহুলতা, এদের গানের দলের বালক এবং ঠাকুরদা বা দাদাঠাকুর নামধারী গীতিপরিচালক সমস্তই দিনুবাবুর লক্ষণাক্রান্ত। তিনি এঁদের নাটকে একাধারে সকল গানের ভাণ্ডারী, সকল নাটের কাণ্ডারী আর সেই বালকদলের ঠাকুর্দা বা দাদাঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনের শুরু থেকেই নাট্যধারা বর্তমান কিন্তু তাতে পূর্বোক্ত লক্ষণগুলি নাই ; এইসব লক্ষণের সূত্রপাত শারদোৎসব নাটক থেকে আর তা চলে এসেছে শেষ পর্যন্ত, মাঝখানে ব্যতিক্রম ডাকঘর প্রভৃতি দু-তিনখানা নাটক। এর কারণ কি? প্রথম ও প্রধান কারণ দিনেন্দ্রনাথ ও আশ্রমের বালকগণ, কিন্তু তারপরে যখন আশ্রমে বালিকাদের ভর্তি করা হল তখন সম্ভব হল নটীর পূজা, শ্যামা, চণ্ডালিকা প্রভৃতি নাটক রচনা। দিনেন্দ্রনাথ তথা আশ্রমের গঠন রবীন্দ্রনাট্যধারার একটি উৎসারক। তাই দিনেন্দ্রনাথ তথা আশ্রমের বালক-বালিকাগণকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাট্যধারার বিবর্তন কল্পনা করা সম্ভব নয়। তাঁর নাট্যধারার মধ্যে আশ্রমের অধ্যাপকগণের স্বভাবতই স্থান ছিল কিন্তু তাঁদের সঙ্গে দিনেন্দ্রনাথের প্রভেদ এই যে তাঁরা ছিলেন উৎসবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কিন্তু দিনুবাবু ছিলেন স্বয়ং উৎসবরাজ। এখন এই উৎসবের মধ্যে এবং উৎসবরাজের সঙ্গে আমি কি করে ভিড়ে পড়লাম সেই কথা বলব।

ছেলেবেলায় দোলের সময়ে আমাদের বাড়িতে যাত্রাপালা হত, আবার উপলক্ষ্য বিশেষে বাড়ির বারোয়ারীতলাতেও যাত্রাগান হত কিন্তু আমরা সে-সব দেখি কর্তাদের তা অভিপ্রেত ছিল না। তাই আমাদের দেখাটা অনেকটা ডুব দিয়ে জল খাওয়ার মতো লুকোচুরি ব্যাপার ছিল। কিন্তু বিধির দুর্জ্ঞেয় বিধানে এমন এক বিদ্যালয়ে

প্রেরিত হলাম, যেখানে নাটক দেখা দূরে থাক নাটকে যোগ দেওয়াটাই বিধান ছিল। এমন কি নাটকের রিহার্সাল দেখবার জন্যে ক্লাস বন্ধ থাকত। রবীন্দ্রনাথের মতে এটাও শিক্ষার অঙ্গ।

যতদূর মনে পড়ে শারদোৎসব নাটকে লক্ষেশ্বরের বালক পুত্ররূপে আর অচলায়তনে সুভদ্র রূপে রঙ্গমঞ্চে আমার প্রথম অবতরণ, কে আমাকে নির্বাচন করল, কোন গুণ দেখে নির্বাচন হল, সে কথা মনে পড়ে না। ও দুটো ভূমিকাই নিতান্ত minor ব্যাপার ছিল। কিন্তু তার আগে মুকুট নাটকে ঈশা খাঁর ভূমিকা নিয়েছিলাম। সেটা নিতান্ত minor ব্যাপার ছিল না। অনেকের মতে, বিশেষ আমার ইংরাজী পরীক্ষার খাতা পরীক্ষা করে যিনি হতাশ হয়েছিলেন সেই নেপালবাবুর মতে তেমন ঈশা খাঁ নাকি আর হয়নি। এমন কি মূল ঈশা খাঁ কিছু শিখতে পারত আমার ভূমিকা দেখে। দিনুবাবু হাতে কলমে এসব কিছুই শেখান নি আমাদের, তাঁর অভিনয় দেখে আমরা কতক গুণ আত্মস্থ করে নিয়েছিলাম।

ঘুরে ফিরে দু'খানা নাটক বারে বারে অভিনীত হত। অচলায়তন আর বিসর্জনের নারী বিবর্জিত সংস্করণ। এ দু'খানা করবার একটা সুবিধা ছিল এই যে মেয়েদের ভূমিকা এসব নাটকে ছিল না। তারপরে এল কৈশোরের মেঘদূতরূপে ফাল্গুনী নাটকখানা। একবার বিসর্জন নাটক করবার দিন স্থির হয়ে গিয়েছে। এসব দিনক্ষণ ধার্য করবার ভার ছিল প্রজিতের ওপর, প্রজিত তখন বয়স্কের দলে। এদিকে আশ্রমের ছেলেমেয়েদের অনেকে গিয়েছে জোড়াসাঁকোতে কি একটা অভিনয় হবে। তাদের ইচ্ছা আশ্রমে এসে বিসর্জন নাটকটা দেখে। কিন্তু প্রজিতের বিধান অমোঘ। কিছুতেই দিন বদল হবে না বলে সে ঘোষণা করেছে– এমন সময় হঠাৎ সে ঘোষণা করল নাটকটির অভিনয় হবে পরবর্তী দিন। সকলেই বিস্মিত, আমিও। গিয়ে ধরলাম প্রজিতকে, কি হে ব্যাপার কি? সে আমাকে একদিকে টেনে নিয়ে গিয়ে ছোট একখানা কাগজের টুকরো দেখাল। তাতে দুটি ছত্র লিখিত আছে: "এখানের ছেলে-মেয়েরা বিসর্জন নাটক দেখতে চায়, দিন বদলে দেবেন। অতসী।"

প্রজিত বলল, আর কাউকে বলো না, তুমি অনেক কথাই জানো তাই তোমাকে বললাম।

আমি বললাম, মা ভৈঃ, এরপরে আর কথা নেই।

দিন বদল হল।

আর একবার বিসর্জন নাটকে ভূমিকার বদল হল। রঘুপতির ভূমিকা আমার বাঁধা ছিল। সেবারে আমাকে সাজতে হল জয়সিংহ, আর রঘুপতি দিনুবাবু।

অভিনয়ের পরে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি বললেন, 'দিনু যখন তোর বুকের উপরে পড়ে গেল, ভাবলাম তোর মরতে যদি কিছু বাকি থাকে তবে দিনুর চাপেই তা সুসম্পন্ন হবে।'

কিন্তু সবচেয়ে জমেছিল বৈকুণ্ঠের খাতা নাটকে। আমি তিনকড়ি, দিনুবাবু বৈকুণ্ঠ। সেবার দেখেছিলাম দিনুবাবুর অভিনয়ের উৎকর্ষ। হাসিতে অশ্রুতে এমন মেশামেশি, মনে হয় যেন দিনুবাবুকে সম্মুখে রেখেই ভূমিকাটি রচিত।

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে লিখিত গীতিবহুল নাটকে আমার প্রবেশাধিকার ছিল না। কারণ আমার সুরের কণ্ঠ ছিল না। সুরের কণ্ঠ তথা বাজনার হাত কোনোটিই ছিল না। একবার ভীমরাও পণ্ডিতজীর কাছে বাজনার পরীক্ষা দিতে গেলাম। তবলায় একবার চাঁটি মারতেই তিনি বলে উঠলেন, তুই গিয়ে ক্যানেস্তারার টিন বাজা গিয়ে। এ সব তোর চলবে না।

শান্তিনিকেতনের দল মাঝে মাঝে অভিনয় করতে কলকাতায় যেত, আমি তাদের সঙ্গে কখনো যাইনি। না, একবার গিয়েছিলাম তবে শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট ভূমিকার বদলে প্রম্পটারের ভূমিকা নিতে হয়েছিল। ব্যাপারটা এই রকম। শারদোৎসবের নামান্তর 'ঋণশোধ' সন্ধ্যাবেলায় অভিনয় হবে, আলফ্রেড থিয়েটারে। টিকেট বিক্রয় হয়ে গিয়েছে। এমন সময়ে খবর এল, শান্তিনিকেতনে দ্বিপুবাবু মারা গিয়েছেন। দিনুবাবু রওনা হয়ে গেলেন। গুরুদেব তো ভেবেই অস্থির, এখন উপায়! অবনীবাবু বললেন, "কোনো চিন্তা নেই, দেখই না কি করি। আমি নেব দিনুর ভূমিকা।"

"তুমি নেবে দিনুর ভূমিকা? একটা কথাও তোমার মুখস্থ নেই?"

"মুখস্থ করবার কোনো প্রয়োজন হবে না, আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে প্রম্পটার"—এই বলে আমাকে আর বিভূতি গুপ্তকে কালো কাপড়ের ঘোমটার মতো মাথায় দিয়ে সাজিয়ে নিলেন। আমাদের

হাতে দিলেন দু'খানা music board-এর stand-এর মতো লাঠি আর তার আড়ালে থাকল দু'খানা ঋণশোধ নাটক। তখন আমরা নির্ভয়ে প্রম্পট্ করতে লাগলাম। অভিনেতারা আর আমাদের কাছছাড়া করেন না। দর্শকরা আসল রহস্য বুঝতে না পেরে ভাবল ও দুটো হয়তো কোনো কিছুর সিম্বল হবে। ব্যাপারটা বিস্তারিত বর্ণিত আছে অবনীন্দ্রনাথের ঘরোয়া বইখানাতে।

অচলায়তন অভিনীত হচ্ছে—দিনুবাবু পঞ্চক। পঞ্চক বালক কিন্তু বিশালবপু দিনুবাবুকে কিছুতেই বালক বলে চালানো অসম্ভব। তখন কে একজন বুদ্ধি দিল পঞ্চকের গায়ের আলখাল্লাটায় লম্বা করে অনেকগুলো কুঁচি দেওয়া হোক, তা হলে দর্শকের চোখ সেই দিকে পড়ে দেহের বিপুলতা প্রচ্ছন্ন করে দেবে। তাই করা হল কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কুঁচিগুলো বড় ঘন ঘন দেওয়া হয়েছিল, তার ফলে আলখাল্লা এত কুঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে সেটা পরে যখন তিনি মঞ্চস্থ হলেন মনে হল যেন একটি বিশালকায় তাকিয়া, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকিয়াটা কারো চোখে পড়ল না, পঞ্চকের কাছে তাকিয়ার হার হল। তাঁর বিশাল দেহে বিপুল শক্তি ছিল। ছেলেবেলায় গ্রীষ্মের ছুটির পরে আমরা যখন ফিবে আসতাম গৌর প্রাঙ্গণে তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বাহু ধরে শূন্যে তুলে আম্রভোজন-জনিত ওজনটা অনুমান করতেন। নাঃ খুব মুটিয়েছে—বলে ধীরে ধীরে নামিয়ে দিতেন।

তারপরে যখন আমাদের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা সমাপ্ত হলে বাড়ি ফিরবার সময় হতো তখন সকলকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে দিতেন, এটা একটা বাঁধা নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর আর একটা স্মৃতি চিরকাল মনে থাকবে, সেই স্মৃতিটা তাঁর মহত্ত্বের নিশানারূপে আজো মনে উড্ডীন আছে। একদিন বিকাল বেলায় কি একটা কাজে তাঁর সুরপুরী বাড়িতে গিয়েছি। আমি তাঁকে দেখবার আগেই আমি তাঁর চোখে পড়লাম। তিনি বারান্দায় বসে কানা উঁচু একখানা ডিশে মুড়ি খাচ্ছিলেন। আমাকে দেখবামাত্র তিনি বলে উঠলেন, কমল (তাঁর স্ত্রীর নাম), এই যে বিশী এসেছে ওর জন্যে মুড়ি পাঠিয়ে দাও। মুড়ির মত অতি সামান্য ভোজ্যকে তিনি অতিথির দিকে এগিয়ে দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। তখন বুঝতে পারলাম প্রকৃত আভিজাত্য ভোজ্যের অসামান্যতার উপরে নির্ভর করে না, করে আমন্ত্রকের উদারতার উপর।

দু'জনে গল্প করতে করতে মুড়ির বাটি শূন্য করে ফেললাম—অবশ্য মুড়ির সঙ্গে 'টুড়ি' ছিল।

অবশেষে বৎসরান্তে যথাকালে হোলির সময় এসে পড়লো। শান্তিনিকেতনে আবিরখেলা কোনো সময়েই নিষিদ্ধ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে উপস্থিত থাকলে তিনিও আবির গ্রহণ ও আবির দান করতেন। কিন্তু যে বারের কথা বলছি সেবারে তিনি উপস্থিত ছিলেন না। সেবার উপস্থিত ছিলেন একজন কট্টর ব্রাহ্ম। তাঁর ধারণা ছিল শান্তিনিকেতন একটা ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্ম প্রতিষ্ঠান। তিনি প্রায় প্রত্যেক বিষয়ে হিন্দু আর ব্রাহ্ম নিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করতেন।

আবির খেলাটাকে তিনি বিশেষভাবে হিন্দুদের ব্যাপার বলে মনে করতেন। এবারে রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতি তাঁকে জোর দিল। ক'দিন আগে থেকে তিনি বলে বেড়াতে লাগলেন, আশ্রমে আবির খেলা অসঙ্গত। ওটা ব্রাহ্মসমাজের অনুমোদিত নয়। বাকি সকলে অর্থাৎ শতকরা পঁচানব্বই জন বল্লেন, এখানে প্রতিবৎসর আবির খেলা হয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাতে যোগ দেন। স্পষ্টত কিছু না বললেও ভাবে ভঙ্গীতে তিনি প্রকাশ করলেন যে রবীন্দ্রনাথও যেন যথেষ্ট ব্রাহ্ম নন। (একসময়ে বহুতর ব্রাহ্মের ঐরূপ ধারণা ছিল) অথচ অধিকাংশ লোক আবির খেলার পক্ষে। তখন তিনি ক্ষিতিমোহন বাবুকে উকিল পাকড়াও করলেন। বললেন, আপনি তো পণ্ডিত লোক, আবিরখেলা সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের কি মত প্রকাশ করে বলুন।

উকীল নির্বাচন করতে গেলে একটু সতর্ক হওয়া দরকার একথা তিনি জানতেন না।

ক্ষিতিমোহনবাবু বললেন, বিলক্ষণ! ব্রাহ্মধর্ম পুস্তিকায় আছে আবির্ আবিরাবীর্ম এধি—

কট্টর শুধালেন, অর্থাৎ—

অর্থাৎ সরল, আবিরে আবির ময় হও।

ব্রাহ্মধর্মের বিপক্ষে রায় যাওয়াতে ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি হতাশ হয়ে সেই দিনই শান্তিনিকেতন পরিত্যাগ করলেন। তিনি স্টেশনের দিকে রওনা হলেন। এদিকে দেহলী বাড়ির কাছে (তখন দিনুবাবু থাকতেন) উৎসবরাজকে ঘিরে অসিত হালদার (নাতি) নগেন গাঙ্গুলি (জামাতা) আর আশ্রমের অধ্যাপক ও

ছাত্রছাত্রীগণ খোল-করতাল সহযোগে আবির ছড়াতে ছড়াতে শাল-বীথিকার পথে আশ্রমের দিকে যাত্রা করলেন। সকলের মধ্যস্থলে দিনেন্দ্রনাথ, সকলের উপরে দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠ, আর চারদিকে "আবিরে আবিরে ময় হয়ে" রঙীন কুজ্‌ঝটিকা সৃষ্টি করলো—আর সেই সঙ্গে গান (হায়, সেটাও আবার রবীন্দ্রনাথের রচিত)

"যা ছিল কালোধলো
তোমার রঙে রঙে রাঙা হলো
যেমন রাঙাবরণ তোমার চরণ
তার সাথে আর ভেদ না রল।
রাঙা হল বসন ভূষণ রাঙা হল
শয়ন স্বপন—
মন হল কেমন দেখ রে যেমন
রাঙা কমল টলমলো॥

॥ ১৭ ॥

গোঁসাইজি

শ্রীনিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী প্রভুপাদ অদ্বৈত আচার্যের সন্তান। এমন লোক শান্তিনিকেতনে কি ভাবে যে এসে পৌঁছালো, সে রহস্য আজও ভেদ হয় নি। তবে ঐ যে প্রাথমিক সূত্র উদ্ধার করে দিয়েছি, যাতে বলেছি শান্তিনিকেতনে কখনো কোনও সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ মানুষ আসতো না, আস্‌লেও তার স্থান হতো না, এই সূত্র অনুসারে গোঁসাইজির এখানে আগমন-রহস্য ভেদ করলেও করা যেতে পারে। তিনি প্রায়ই যে ধুতি পরতেন তার কোঁচা হাঁটুর নিচে নামতো না। জিজ্ঞাসিত হলে উত্তর দিতেন, 'আপনারা তো হাফ প্যাণ্ট পরেন, এ আমার হাফ ধুতি।' এ উত্তর প্রকৃতিস্থ মানুষের নয়। এমন অনেক অপ্রকৃতিস্থজনোচিত কথা এই নিবন্ধের মধ্যে পাওয়া যাবে। অদ্বৈত আচার্যের সন্তান, কাজেই সংস্কৃত ভাল করেই জানতেন। কিন্তু পালি প্রাকৃত শিখলেন কোথায় ও কেন? কেনটাই আসল কথা। পালি বৌদ্ধধর্মের ভাষা। বৌদ্ধরা তো এঁদের চোখে পাষণ্ডী। তবু সেটা যদি স্বীকার করে নেওয়া যায়, যে-দেশে এখনও বৌদ্ধধর্ম অবিকৃত আছে সেই সিংহলে যেতে রাজী হলেন কেন। গোঁসাইজির চরিত্রে এমন অনেক কেন পাওয়া যাবে, যার সদুত্তর নেই; একমাত্র উত্তর—প্রকৃতিস্থ মানুষের কার্য নয়। গোঁসাইজি হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তবে আরও কিছু ছিল। এরকম সুরসিক ব্যক্তি শান্তিনিকেতনেও আমার চোখে পড়েনি। এই রসিকতাগুলির জন্যই তিনি গুরুদেব থেকে আরম্ভ করে দীনতম ভৃত্য পর্যন্ত সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। আর তাঁর নামের পূর্বাংশ ভুলে গিয়ে সবারই কাছে ছিলেন গোঁসাইজ। আশ্রমে ঢুকলেই যেমন খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি এবং এক পায়ে চটি জুতো পরিহিত, এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব লক্ষ্যগোচর হতেন, তেমনি লক্ষ্যগোচর হতেন খাটোধুতি পরিহিত এবং প্রায়শ নগ্নগাত্র গোঁসাইজি।

এ্যাণ্ড্রুজ সাহেবের এক পায়ে চটিজুতোর উল্লেখ করেছি, কিন্তু কেন এ হেন দশা তা উল্লিখিত হয় নি। একবার তিনি এক পায়ে চোট

পেয়েছিলেন। সে পায়ে চটিজুতো পরা সম্ভব ছিল না। কৌতূহলীদের বোঝালেন, অন্য পা-টা তো সুস্থ আছে, কাজেই সে পায়ে জুতো পরবো কেন? স্পষ্টতঃ এ প্রকৃতিস্থের উত্তর নয়। আবার তার মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা যেতো বড়বাবুকে (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) রিকশাসুদ্ধু টেনে নিয়ে চলেছেন। এও প্রকৃতিস্থ মানুষের কর্ম নয়।

গোঁসাইজি খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে আচার মেনে চলতেন না। এ হেন গোঁসাইজির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জমে গেল। পাঠকের মনে হতে পারে, 'ওহে বাপু, তবে তুমিও তো ঠিক প্রকৃতিস্থ নও।' আমি কি অস্বীকার করেছি? তবে আমি কি ভাবে যে শান্তিনিকেতনে গেলাম এবং একাদিক্রমে সতেরো বছর টিকে রইলাম তা যথাস্থানে বললেই চলবে। একবার স্থির করলাম যে একটা যাত্রাপালা করলে কি রকম হয়। ভেবেছিলাম, গোঁসাইজির কাছে কুণ্ঠিত উত্তর পাবো, কিন্তু তার বদলে তিনি মুক্তকণ্ঠে বললেন—শান্তিনিকেতন তো যাত্রা-গানেরই আসর। একটা পালা লিখে ফেলুন।

আমি বললাম, তারপরে!

তারপরে আর কি? পাল টাঙিয়ে গৌড়প্রাঙ্গণে তান জুড়ে দিলেই হবে।

তখন গোঁসাইজিকে নিয়ে নিভৃত আলোচনায় বসলাম। বললাম —বাজনাবাদ্যি চাই তো, গায়ক চাই, অভিনেতা চাই, এসব কোথায় পাবো?

গোঁসাইজি বললেন, সমস্তই আছে, কেবল জানাজানি হয় নি। এই বলে তিনি ১০/-২ রকম বাদ্যযন্ত্রের উপরে তাঁর অধিকাব জানিয়ে দিলেন। তার মধ্যে হারমোনিয়াম, এসরাজ, বাঁশি, খঞ্জনী প্রভৃতি অনেক রকম বাদ্যযন্ত্রের নাম বললেন আর বললেন, ঐ যে শচীন কর বলে ছোকরাটি আছে, ওকে পাকড়াও করুন। ও গাইতে নাচতে শেখাতে সমস্ত পারে।

গোঁসাইজি বললেন, আর আছেন আপনি। আজ রাতের মধ্যেই একটা পালা লিখে ফেলুন।

আমি বললাম, যাত্রা হচ্ছে গীতিবহুল পালা।

তিনি বললেন—যাত্রার প্রাণ হচ্ছে গান আর লড়াই। এ দুটো যদি জমে গেল তবে আর চাই কি!

আমি বললাম—গান যেন লিখলাম, সুর দেবে কে ?

—সে ভার ঐ শচীন করের উপর। দেখুন আর একটি কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। যাত্রায় বেহালা না হলে মানায় না।

আমি বললাম, বেহালা কোথায় পাবো ?

—কিছুই খবর রাখেন না দেখছি। জগদানন্দবাবু ও তেজেশবাবুকে যদি বেহালা নিয়ে আসরে না দাঁড় করাতে পারি, তবে আমি অদ্বৈত প্রভুর সন্তান নই। আরও একটি কথা ভুলে গিয়েছি। আমাদের মন্দিরে ঐ যে গান করেন, সেই শ্যাম ভটচাজ পাখোয়াজে ওস্তাদ।

—আর লড়াই ?

—লড়াই অল্পবিস্তর সবাই করতে পারবে। তবে সরোজদা ও বিভূতিদা এরাই হবে প্রধান।

পরদিন কথাটা আশ্রমময় চালু হয়ে গেল যে এবার গরমের ছুটির আগে গোঁসাইজির যাত্রাপালা হবে। শেষ পর্যন্ত কথাটা গিয়ে গুরুদেবের কানে পৌঁছালো। আমি বিকেলবেলা দেখা করতে গেলে বললেন, তোরা নাকি এবার যাত্রাপালা করবি ?

বললাম, গোঁসাইজি তো তাই বলছিলেন।

—আর তুই বা কি কম ? একজন অদ্বৈতপ্রভুর সন্তান আর একজন খাঁটি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। দুই ব্রাহ্মণে মিলে এই পীবিলীর ভাতটা মারবি দেখছি।

আমি হেসে উঠলাম। হাসি ছাড়া আর কি বা উত্তর হতে পারে ?

সেই রাত থেকেই আমি পালা লিখতে আরম্ভ করলাম। মোটের উপর গোটাতিনেক পালা লিখেছিলাম। সেগুলো যে কোথায় গেল, থাকলে বেশ হতো। সবচেয়ে কঠিন কাজ লোক জুটিয়ে মহড়া দেওয়া। দেখতাম যে অভিনেতার চেয়ে কৌতূহলী শ্রোতার সংখ্যা বেশী। একদিনের কথা মনে আছে। ভীম অর্জুনের পালা, লড়াই চলছে। দুর্ভাগ্যবশত দুজনের হাতেই গদার বদলে কাঠের মুগুর ছিল। যুদ্ধের আবেগে সে মুগুর মোহমুদ্গর হয়ে উঠলো। হঠাৎ দেখলাম—একজনের কপাল থেকে রক্ত পড়ছে। তাড়াতাড়ি মুগুর দুটি কেড়ে নিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে হল।

আর একদিনের কথা মনে আছে—একজন অভিনেতার মুখ দিয়ে

বাঁদর শব্দটা বিশুদ্ধরূপে বেরোত না। সে বলতো বান্দর। আমরা বলতাম বান্দর না, বাঁদর। পাছে তাকে বাদ দেওয়া হয়, সে বললো বুঝছি বুঝছি, বাদর। চন্দ্রবিন্দুটা বুড়িগঙ্গায় ডুবে গেছে। অবশেষে আপোসে স্থির হল, মর্কট বললেই চলবে।

তবু মনের মধ্যে ভয় থেকে গেল, অভিনয়ের সময় কর্কট বলে না বসে।

অবশেষে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে যাত্রার দলটা গড়ে তোলা গেল। প্রধানত গোঁসাইজি, শচীন কর, বিভূতি গুপ্ত ও সরোজদার চেষ্টাতেই এমন সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য চারজন নিয়ে যাত্রাদল গড়া যায় না। অন্তত ২০/২৫জনের প্রয়োজন হয়। তাদের বলা যেতে পারে 'ওগয়রহ'। আমি ঐ ওগয়রহের মধ্যে। না জানি গান করতে, না জানি বাজাতে, একেবারেই আনাড়ি। একজন ব্যক্তি বিস্মিত হয়ে আমাকে বলেছিলেন, আপনি দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে থাকলেন, আর গান করতে পারেন না। আমি উত্তর দিয়েছিলাম, আপনি আরও দীর্ঘকাল দমদমে আছেন, তবু তো উড়তে জানেন না দেখছি।

লোকটি দমদম নিবাসী।

মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ খবর নিতেন, তোদের যাত্রাদলের খবর কি?

আমি বলতাম, গোঁসাইজি আমাদের অধিকারী।

তিনি বললেন—গোঁসাই গুণী লোক। কাজেই একরকম করে দাঁড়িয়ে যাবে। তারপরে বললেন—দেখ্, যাত্রাটা আমাদের দেশের ধাতের মধ্যে আছে, তুলনায় থিয়েটারটা অনেকটা কৃত্রিম। তার ফরমাশের অন্ত নাই। আর মাঠের মধ্যে যেখানেই হোক একটা পাল খাটিয়ে দিলেই যাত্রার আসর হয়ে গেল, গানটা ওর আসর। তাই বলে তুই যেন গান করিস না।

তখন আমি দমদমের সেই লোকটির কথা বললাম, শুনে তিনি হেসে উঠলেন, বললেন—আচ্ছা জব্দ করেছিলি তো!

বিকাল থেকেই আমাদের রিহার্সাল আরম্ভ হতো। নাচগানের উদ্দাম উল্লাসে পাড়ার কুকুরগুলো অবধি মৌন অবলম্বন করতো। আর শ্রোতার দলে আশ্রমের ছেলেরা সবাই আসতো। এমন কি আশ্রমের চাকরবাকরেরাও জুটতো। কাজকর্ম বন্ধ হয় আর কি।

রবীন্দ্রনাথের কানে সব কথাই উঠতো, বলতেন—তোদের অসাধ্য কাজ নেই। জগদানন্দ ও তেজেশকে বেহালাদার কবে দাঁড় করিয়েছিস, আর বাকি থাকলো কি!

তিনি অবশ্য বললেন, আর বাকী থাকলো কি। কিন্তু আমি দেখলাম আসল কাজটাই বাকী। অভিনেতাদের রিহার্সালের জন্য কিছুতেই একত্র করা যায় না। আবার যাত্রাদলের অভিনেতা ছোট-বড়য় মিলে ৪০/৫০জন। ঠিক রিহার্সালের সময়েই সকলেরই একটা না একটা কাজ পড়ে যায়। অনেক রকম ভীতি ও প্রলোভন দেখিয়ে অবশেষে তাদের একত্র করতে হয়। তখন আরম্ভ হতো রীতিমতো রিহার্সাল। গানের সুরে পাখোয়াজের আওয়াজে আশ্রম ধ্বনিত। যারা জানতো না, তারা পরস্পরকে শুধায়, 'ব্যাপারটা কি হচ্ছে?'

উত্তর পায়, যাত্রার রিহার্সাল। তখন বলে 'ও'। ভাবটা এই যে, যাত্রার রিহার্সালে এরকম হুল্লোড হয়েই থাকে।

আমাদের প্রথম পালাগানের নাম হচ্ছে 'বীরভূমেশ্বর পরাজয়'। রামচন্দ্রের অশ্বমেধের ঘোড়া আটক করেছে বীরভূমের কোনো রাজা। তাই নিয়ে উভয়পক্ষে অনিবার্য লড়াই। এখন রামচন্দ্র, মন্ত্রী প্রভৃতি উচ্চদরের পাত্র-পাত্রী সহজেই সংগৃহীত হলো। কিন্তু গোল বাধালো হনুমান। হনুমান সাজবার লোক পাওয়া গেল না। অবশ্য বাংলাদেশ বাদে ভারতের অন্য সমস্ত প্রদেশে হনুমান সাজবার লোকের অভাব হতো না। এখন এখানে কেউ হনুমান সাজতে রাজী নয়। অথচ হনুমানকে বাদ দিলে গল্পটা দাঁড়ায় না। তখন নন্দলালবাবু আভাসে ইঙ্গিতে পরামর্শ দিলেন, মণি গুপ্তকে বলে দেখ না।

মণি গুপ্ত বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী আর নন্দলালবাবুর প্রিয় ছাত্র। তখন শচীন করকে আমাদের দূত হিসাবে প্রস্তাবটি নিয়ে মণি গুপ্তর কাছে পাঠানো হলো। আশাতাত সাফল্য। কে জানতো যে, মণি গুপ্ত হনুমানের এত ভক্ত। প্রস্তাব শুনে আহ্লাদে বলে উঠলো, লেজ থাকবে তো!

শচীন কর বললো, লেজ না থাকলে লোকে বুঝবে কি করে যে হনুমান!

"বেশ, রাজী।"

তখন আমাদের দূত ফিরে এসে বললো, "কাজ হয়ে গিয়েছে।

এখন একটা ভালো দেখে লেজের অপেক্ষা মাত্র।"

তখন গোঁসাইজি বললেন, "কুছ পরোয়া নেই। আমি বৃন্দাবনে বাল্যকাল থেকে আছি। হনুমান সম্বন্ধে আমাকে স্পেশালিস্ট বললেই চলে। আমি দেবো তৈরি করে লেজটা।"

এই সুসংবাদে যাত্রাদলে খোল, করতাল, পাখোয়াজ সমস্ত একযোগে বেজে উঠলো। তখন আমি নিজে গিয়ে নন্দলালবাবুকে এই সংবাদটি দিলাম। এবং তাৎপরে কিছু পরামর্শ হলো।

যথা সময়ে সলাঙ্গুল হনুমান সশরীরে হুপ্ করে আসরের মধ্যে লাফিয়ে পড়লো। তখন দর্শকদের সে কি উল্লাস। হনুমান অবশ্য রামচন্দ্রের পক্ষের লোক। বীরভূমেশ্বরের সৈন্যসামন্তদের লক্ষ্য করে বলে উঠলো—[কী আশ্চর্য। আজ প্রায় ৬০ বছর পরেও হনুমানের সেই উক্তিটা মনে আছে দেখছি।]

"আমি সেই হনুমান, কচু-মান খাইরে।
শ্রীরামের জানকীর জয়গান গাইরে।
ভেঙ্গে আনি ডালপালা,
কে আছিস পালাপালা
মোর হাতে পড়িলে, রক্ষা নাইরে।"

—এই বলে দুহাতে ডালপালা ঘুরিয়ে সে কী আক্রমণ। হনুমানের লেজ সংগ্রহেই আমাদের সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল। ডালপালার কথা মনে পড়েনি। সেগুলো হনুমানের নিজের সংগৃহীত। চারদিকে দর্শকদের বিপুল করতালির মধ্যে হনুমান যখন সগর্বে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, তখন হঠাৎ আসরের মধ্যে নন্দলালবাবুকে দেখতে পেল।

নন্দলালবাবু এগিয়ে এসে বললেন, "শ্রীমান মণীন্দ্রের হনুমানের পার্ট এমন স্বাভাবিক হয়েছে, যে সেজন্য এ পদকটি দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করছি।"

আবার দর্শকগণের বিপুল করতালি। কিন্তু স্বয়ং হনুমান তখনো বুঝতে পারে নি যে 'স্বাভাবিক' শব্দটার এখানে কী বিশেষ তাৎপর্য। অবশ্য অভিনয়ের পরে পাঁচজনের টীকা-ভাষ্যের ফলে যখন সে স্বাভাবিক শব্দটার তাৎপর্য বুঝতে পারলো তখন আর কী করা। সব রাগ গিয়ে পড়লো তার ঐ সযত্নে লালিত লেজটার উপরে।

এরপরে অবশ্য আরো দুটি পালা অভিনীত হয়েছিল—ঘোষযাত্রা আর কর্ণমর্দন।

বর্তমানে যে জায়গাটাকে গৌড়-প্রাঙ্গণ বলা হয়, সেইখানে বাঁধা হতো আমাদের যাত্রার আসর। প্রকাণ্ড পাল খাটিয়ে প্রশস্ত আসরে প্রায় হাজারখানেক লোকের বসবার জায়গা হতো। নীচে সতরঞ্চি পাতা। যে যেখানে পারে বসতো। যেমন সাধারণত যাত্রার আসরে হয়ে থাকে, কেবল রবীন্দ্রনাথের জন্য নির্দিষ্ট থাকতো একখানি বেতের চেয়ারের সুখাসন। তখন দেখছি রবীন্দ্রনাথের কী অসীম ধৈর্য। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় ৩/৪ ঘণ্টা এই আসনে বসে শুনতেন। সে সব পালাগানের যেমন ভাব, তেমনি ভাষা, তেমনি গান, তেমনি অভিনয়। রচনা যখন আমার, অন্যরকম হবেই বা কী করে? তখন বুঝতে পারিনি, পরে বুঝেছি ভাল লাগতো বলে যে দেখতেন তা নয়। এই যাত্রা-পালা ব্যাপারটাকে উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যেই অসীম ধৈর্য সহকারে বসে থাকতেন।

পরদিন সকালবেলায় উত্তরায়ণে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম তিনি বললেন, আমি ভাবছি আমিও না কেন একটা যাত্রা-পালা রচনা করি। আমার প্রগলভ্ রসনা বলে ফেললো, আপনি কি এমন পালা রচনা করতে পারবেন, যা আশ্রমের চাকর-বাকর থেকে আরম্ভ করে আপনার মতো লোক পর্যন্ত নীরবে দেখে যাবে। আমার কথা শুনে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, যা তোদেরই ছেড়ে দিলাম। তারপর আমি বললাম, ইচ্ছা আছে, আপনার 'শারদোৎসব' ও 'ফাল্গুনী' নাটক দুটোকে যাত্রার আসরে অভিনয় করবো।

তিনি বললেন, তা করিস কিন্তু মনে রাখিস গানগুলো আমার লেখা, আর সুরটাও আমার দেওয়া। ··· সেদিন এই পর্যন্ত। প্রত্যেক বছর গ্রীষ্মের ছুটির আগে এই যাত্রাগানগুলো হতো। গোঁসাইজি উচ্চদরের অভিনেতা ছিলেন। বিশেষ করে কমিক অভিনয়ে তাঁর সমকক্ষ দেখিনি। প্রত্যেক পালাতেই গোঁসাইজি ও আমার জন্য কমিক পার্ট থাকতো।

যাত্রাগানের রীতি অনুসারে কোনো পালা বিয়োগান্তক হতে পারে না। রণক্ষেত্রে সবাই মরে পড়ে আছে, এমন সময় মহাদেব প্রবেশ

করলেন আর কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে দিলেন, তখন সকলে আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে বসলো। সদ্য জীবনপ্রাপ্ত গোঁসাইজি উঠে মহাদেবের দিকে তাকালেন। মহাদেব জিজ্ঞাসা করলেন, "বৎস, আমাকে চিনতে পারছো।" গোঁসাইজি বললেন, "হ্যাঁ প্রভু, পঞ্জিকার পাতায় আপনার ছবি দেখেছি।" আমি তখন দেখলাম যে রণক্ষেত্রে আমার আর কোনো প্রয়োজন নেই। সকলেই সদ্যজীবনপ্রাপ্ত। আমি তখন সানন্দে ত্রিশূলখানা উচ্চে তুলে বেরিয়ে যেত উদ্যত এমন সময়ে ত্রিশূলখানা পাশে বেধে গেল। টানাটানিতেও যখন খুললো না, "থাকুক ত্রিশূল মোর ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে ঝুলি।"

এই ছত্রটা উচ্চারণ করে সবেগে প্রস্থান করলাম। এই অংশটা তাৎক্ষণিক, অর্থাৎ মূল পালায় ছিল না।

এরপরে আরো দুটি পালা লিখেছিলাম, ঘোষযাত্রা আর কর্ণমর্দন। কর্ণমর্দনের স্থূল অর্থ হচ্ছে কর্ণ বধ। আর একটা সূক্ষ্মতর অর্থ থাকতে পারে, গোড়ায় খেয়াল ছিল না। সেই অর্থটাই অনেকে গ্রহণ করলেন। ফলে সেকালের কর্ণের যে দশাই হোক না কেন, লেখকের কর্ণ রক্তিম হয়ে উঠলো। এই যাত্রাগানের কৃপায় পালার অনেকগুলো গান তখন আশ্রমের অনেকের মুখে মুখে ফিরতো—একটি হচ্ছে,

"আমরা আর যাব না গোচারণে
যখন প্রাণের কানাই আর হেথা নাই
কি সুখ বলো বৃন্দাবনে।
পিয়ালে ডাকবে না পিক্
ভ্রমরে আর দশদিক
উতলা করবে কি আর গুঞ্জরণে।"

এ গানটার পূর্ণাংশ মনে আছে। আর সব যা মনে আছে দু'একটা ছত্র মাত্র।

শুধু গান দিয়ে তো যাত্রা জমানো যায় না। যাত্রা জমে যুযুধানদের লড়াইয়ে। বিভূতি গুপ্ত ও সরোজদার লড়াই যেমন জমতো, তেমন আর কিছুতেই নয়। দুজনের হাতে দুখানা তলোয়ার (রাংতা দিয়ে মোড়া) আসরে বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করে দর্শকদের চোখ ধাঁধিয়ে দিত। এখানে আমাদের যাত্রার পালা সঙ্গে হয়ে গেল এবং তারপরে আমি শান্তিনিকেতন পরিত্যাগ করে চলে আসি।

কিন্তু কেবল যাত্রাগানে গোঁসাইজির উদ্ভাবনী শক্তির শেষ ছিল না। এবার তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভার একটা ঘটনা বলতে যাচ্ছি যা এখন দুঃসাহসিক বলে মনে হয়। তখন স্বাভাবিক ছাড়া আর কিছু মনে হয় নি।

দিনটা ছিল পঁচিশে বৈশাখ। সকালবেলায় একদফা মন্দিরে উপদেশ ও সঙ্গীতাদি হয়ে গিয়েছিল। তারপরে হাতে ছিল খানিকটা ফালতু সময়। এই ফালতু সময়ে গোঁসাইজি যে ফসল ফলালেন, তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি অভিনব।

তিনি ২৫শে বৈশাখ সকালবেলাতে বললেন, "বিশীদা আসুন, এক কাজ করা যাক।"

গোঁসাইজি আমার চেয়ে কম করে দশ বছরের বড়। কিন্তু শান্তি-নিকেতনী রেওয়াজে বয়সের ঐ সামান্য ব্যবধানটুকু চোখে পড়তো না।

আমি বললাম, কি করতে হবে? সবাই জানতো আমি গোঁসাইজির একান্ত বশংবদ ব্যক্তি। আড়ালে আমাকে গোঁসাইজি-রূপ বজরার ডিঙিনৌকা বলতো।

গোঁসাইজি বললেন, দেখুন, এতদিন তো গুরুগৃহে আছি। কিন্তু গুরুগৃহে ভোজন করা হয় নি। আজ গুরুর জন্মদিনে সেই কাজটি করতে হবে।

আমি বললাম, "সে কি করে সম্ভব?"

"কিছুই অসম্ভব নয়। আমি যা বলি, সেই সব কথা মনে রাখবেন। তারপরে সময়মতো ভোজনের সময় গুরুগৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেই হবে।" বেলা এগারোটা আন্দাজ গোঁসাইজির শিক্ষামতো দুজনে স্নান করে দুজনে দুখানা সানকি থালা ও দু লোটা জল হাতে নিয়ে উত্তরায়ণের দিকে চললাম। উপরির মধ্যে কাঁধে উত্তরীয় আর গলায় উপবীত। গুরুদেব তখন উত্তরায়ণের পূর্বদিকের বারান্দায় বসেছিলেন। আমরা গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি আমাদের একনজরে দেখেই বুঝলেন, আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য।

আমাদের বললেন, তোমরা বসো।

একজন চাকরকে বললেন, বৌমাকে ডেকে দে তো।

প্রতিমা দেবী এসে উপস্থিত হলেন। আমরা উঠে তাঁকেও প্রণাম করলাম।

গুরুদেব বললেন, বৌমা, আজ তোমার অত্যন্ত শুভদিন। কার মুখ দেখে না-জানি আজ উঠেছিলে। এই দেখ, দুটি ব্রাহ্মণ বটু তোমার বাড়িতে আজ প্রসাদ পাবার উদ্দেশ্যে এসেছে।

তারপর গোঁসাইজিকে দেখিয়ে বললেন, ইনি অদ্বৈতপ্রভুর সন্তান। আর আমাকে দেখিয়ে বললেন, ইনি বিশুদ্ধ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সন্তান। এঁরা ধর্মের বড় ধার ধারেন না। কিন্তু লাঠালাঠি কর্মে বড়ই সিদ্ধহস্ত। কাজেই দেখতে পাচ্ছ, তোমার বাড়িতে আজ ধর্ম ও কর্ম উপযাচক হয়ে প্রসাদ পাবার আশায় এসেছে। যাও, যথোচিত ব্যবস্থা করো গিয়ে। ব্রাহ্মণ-ভোজনে যেন ত্রুটি না হয়।

প্রতিমা দেবী চলে গেলে গুরুদেব আমাদের সঙ্গে সদালাপ শুরু করলেন। অর্থাৎ সদালাপটা গোঁসাইজির সঙ্গে। আমি শ্রোতা মাত্র।

কিছুক্ষণ পরে বনমালী এসে দাঁড়াল। গুরুদেব বললেন, "চলো। ভোজনের ডাক হয়েছে।"

আমরা দুজনে গুরুদেবের পিছু পিছু উত্তরের বারান্দায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। উপস্থিত হয়ে আমাদের জন্য উদ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলাম। পাশেই মস্ত একখানা বেতের চেয়ার। গুরুদেব তাতে বসতে বসতে বললেন, "এই যে, আমার জন্যও বসবার ব্যবস্থা হয়েছে। অবশ্য খাব না, তবে তদারক করবো, তোমাদের যথোচিত সেবা হচ্ছে কি না।" তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোর পূর্বপুরুষেরা লাঠালাঠি করেছে। আশা করি গণ্ডুষের মন্ত্রটা ভুলিস নি।"

আমরা তো যথারীতি আহার শুরু করলাম। কিন্তু আমার মুখে হাত উঠছিল না। কেবল ভাবছিলাম গোঁসাইজির কাণ্ডটা। দেখলাম যে বজরা রীতিমতো মাল রোঝাই করছে। কিন্তু ডিঙিতে আর কতটুকু ধরবে। এমন সময় আবার প্রতিমা দেবীর ডাক পড়লো।

গুরুদেব তাঁকে বললেন, তোমার বাড়িতে আজ দুজন ব্রাহ্মণ সন্তান ভোজন করছে, তার ফলে ব্রাহ্মঘরে বিবাহে যে পাপ স্পর্শেছে তার থেকে তুমি মুক্তি পেলে।

প্রতিমা দেবী একটু হেসে গোঁসাইজিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার পরিতৃপ্তি হয়েছে?

গোঁসাইজি বললেন, গুরুগৃহে ভোজনে অতৃপ্তির অবকাশ তো নেই।

প্রতিমা দেবী চলে যেতে উদ্যত হলে গুরুদেব বললেন, আর ঐ ব্রাহ্মণ বটুটিকে তো জিজ্ঞাসা করলে না ?

তিনি বললেন, ওকে তো ওর বাল্যকাল থেকে দেখছি। নূতন করে আর জিজ্ঞাসা করবো কি !

এমন সময়ে গোঁসাইজি বাম হাতখানি প্রতিমা দেবীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। প্রতিমা দেবী ভাবছেন, এর উদ্দেশ্য কি !

গুরুদেব মৃদু হেসে বললেন, বৌমা, ব্রাহ্মঘরে বিয়ে করে ভুলে গিয়েছ যে দক্ষিণা না দিলে ভোজনের পুণ্যফল থেকে বঞ্চিত হতে হয়। যাও, দক্ষিণার ব্যবস্থা করো গিয়ে।

এই কথা শুনে প্রতিমা দেবী ভিতরে গেলেন। আর কিছুক্ষণ পরে দুখানা রূপোর রেকাবীতে একটি করে টাকা নিয়ে এসে আমাদের সম্মুখে ধরলেন। গোঁসাইজি অনায়াসে টাকাটি তুলে নিলেন। আমার হাত সরছিল না। কারণ এর আগে বা এর পরে কখনো ভোজন-দক্ষিণা পাই নি। তারপরে আচমনাদি করে গুরুদেব ও প্রতিমা দেবীকে প্রণামান্তে আমরা বিদায় নিলাম।

এই ছিল তখনকার শান্তিনিকেতনের এক চেহারা। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনিকগণ দূরবর্তী পর ছিল না। সমস্ত শান্তিনিকেতন আশ্রমটি একটি বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবাররূপে গড়ে উঠুক এই ছিল তাঁর আদর্শ ও ইচ্ছা। এমন না হলে অনিমন্ত্রিত ও উপযাচকরূপে বিনা নোটিশে ভোজনের জন্য উপস্থিত হতে পারতাম কি ? আমি একাকী হলে এরকম দুঃসাহসিক কাজ করতে পারতাম না। ভরসা ছিল গোঁসাইজির উপরে। তাঁকে শান্তিনিকেতনের সকলেই স্নেহ ও শ্রদ্ধা করতো। কেবল তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য নয়, তাঁর বিমল চরিত্রের জন্যও বটে। গোঁসাইজির প্ররোচনাতে গুরুদেব ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের কথা লিখে গিয়েছেন ছেলেবেলা গ্রন্থে। অতঃপর গোঁসাইজির জীবনের অন্তিমপর্ব সংক্ষেপে বলব। তিনি প্রায় ১০ বৎসরকাল শান্তিনিকেতনের হাসপাতালে শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলেন। রোগটা কি বলতে পারবো না। নিশ্চয় ডাক্তারী শাস্ত্রে গালভরা কোনো নাম আছে। কিন্তু এইবার বুঝতে পারা গেল যে, গোঁসাইজি শান্তিনিকেতনে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কি রকম স্নেহ প্রীতি ও সম্মানের পাত্র। বিপত্নীক গোঁসাইজির পুত্রটি অকালে

মারা গেল। সেই ঘটনাকে গুরুদেব মন্দিরে উপদেশ দানের উপলক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর থাকবার মধ্যে দুটি কন্যা ছিল। দুজনেই নাবালিকা। শান্তিনিকেতন হাসপাতালে দীর্ঘকাল চিকিৎসার সমস্ত খরচ শান্তিনিকেতন যুগিয়েছিল। কিন্তু তিনি সেই যে শয্যাগ্রহণ করলেন আর সুস্থ হতে পারলেন না। শরীর ক্রমে দুর্বলতর হচ্ছিল। কিন্তু স্মৃতিশক্তি রীতিমতো সজাগ ছিল। তাঁর বন্ধুবান্ধবরা বাড়ি থেকে রান্না করে নিয়ে গিয়ে তাঁকে দিয়ে আসতো। তবে গোঁসাইজির মনে একটা আক্ষেপ ছিল যে, আশ্রম তাঁর রোগ ও সেবার সমস্ত খরচ বহন করছে। কিন্তু তিনি সুস্থ হয়ে উঠে যে এই দানের প্রতিদান করতে পারবেন তেমন ভরসা দিনে দিনে কমে আসছিল তাঁর মনে। অবশেষে একদিন সকলকে চোখের জল ফেলিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। মৃত্যুর পরে তাঁর বালিশের তলায় একখণ্ড কাগজ পাওয়া গেল। তাতে গোঁসাইজির সুপরিচিত হস্তাক্ষরে লিখিত—শান্তিনিকেতনে বসবাসের জন্য যে বাড়িটি তিনি তৈরী করেছিলেন সেটা দান করে গিয়েছেন শান্তিনিকেতন আশ্রমকে।

এইরূপে সর্বস্ব দিয়ে তিনি রিক্তহস্তে বিদায় নিলেন। পিতার সুকৃতির ফলে যথাকালে তাঁর কন্যা দুটির যোগ্যঘরে বিবাহ হয়ে গেল।

॥ ১৮ ॥

গুরুশিষ্য

"পুরানো সেই দিনের কথা" যাঁরা পড়বেন তাঁদের ধারণা হওয়া অসম্ভব নয় যে, লেখক বিশেষ ভাবে রবীন্দ্রনাথের স্নেহের পাত্র ছিলেন। এইরকম ধারণা আমি সৃষ্টি করতে চেষ্টা করিনি। যদি কারও এরকম ধারণা হয়ে থাকে, তবে তার জন্যে আমি দায়ী নই। তৎকালের শান্তিনিকেতনে কারও কারও মনে হয়তো এইরকম ধারণা ঘটেছিল। এবং তাঁদের ধারণা হয়তো প্রতিপালিত হয়েছিল আমারও মনে। একটি ঘটনা বলি, হয়তো ঘটনাটি আগেও কোথাও বলে থাকবো। একদিন প্রাককুটিরের উত্তরদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমি যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন। একটি গাছের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, জানিস একসময়ে এই গাছটির চারা আমি সযত্নে বুনেছিলাম, ভেবেছিলাম এটি অশোক গাছ। তারপরে বড় হলে দেখলাম, না অশোক নয়, নিতান্তই গাবগাছ। তারপরে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, তোকেও অশোক গাছ বলে লাগিয়েছি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—অশোক নয় ; নিতান্তই গাবগাছ। এই পর্যন্ত বলে তিনি চলতে লাগলেন, এবং আমি তাঁর পিছু পিছু চলতে থাকলাম।

যদি কখনও আমার মনে অহমিকা হয়ে থাকে, তা ভূমিসাৎ করার পক্ষে এক-আধটা মন্তব্য যথেষ্ট, কিংবা যথেষ্টর বেশী।

তবে অস্বীকার করার উপায় নেই, যে কোন কারণেই হোক আমার প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল, তবে সে যে আমার বিশেষ গুণের জন্যে তা মনে না হতেও পারে।

সুধাকান্তদার উল্লেখ আগে করেছি। আমাদের গৃহশিক্ষক ছিলেন তিনি।

একবার রায়পুর গ্রাম ভ্রমণ করে এসে আমি ছোট একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সেটি যথাসময়ে সাহিত্যসভায় পঠিত হয়েছিলো, তখন আমার বয়স ঠিক দশ বৎসর। কি কারণে জানি না প্রবন্ধটি সকলের ভালো লেগে গেলো। প্রবন্ধে এমন কি গুণ ছিল তখনও বুঝিনি। এখন এতকাল পরে বুঝবার প্রশ্ন ওঠেই না। হয়তো বালকের প্রথম

লেখা বলে ভালো লেগে গিয়েছিলো। সুধাকান্তদা এই বিষয়টি গুরুদেবের কাছে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বললেন, আমি লক্ষ্য করেছি, ওর লেখার শক্তি আছে। কিন্তু দোহাই তোদের এমন অতিরিক্ত প্রশংসা করে ওর মাথাটি খাসনে। অল্প বয়েসে প্রশংসার জোয়ার এলে নৌকাখানা হয় তলিয়ে যায়, নয় আঘাটায় গিয়ে ঠেকে।

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা মনে পড়ছে, তখন কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের তরুণ ভক্তরা শান্তিনিকেতনে যেতেন। তাঁদের মধ্যে একজন পরবর্তী জীবনে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তিনি তরুণ কবি নরেন্দ্র দেব। তাঁরা হয়তো কৌতূহলের বশে রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করে থাকবেন, এখানকার ছাত্রদের মধ্যে কেউ সাহিত্যিক আছেন কিনা, রবীন্দ্রনাথ হয়তো বলে থাকবেন, যাও দেখো গিয়ে বীথিকাঘরের পূব-দক্ষিণ কোণে একজন ছাত্র থাকে, তাকে দেখতে পারো। তাঁদের মধ্যে ঠিক কি কথা হয়েছিল জানি না। তবে হয়তো এইরকম কিছু বলে থাকবেন।

দেখলাম কয়েকজন কলকাতার যুবক এসে আমাকে নানাবিধ প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমিও যথারীতি উল্টোপাল্টা উত্তর দিতে লাগলাম। গুরুদেব জানতেন, বীথিকাঘরের ঐ কোণটির উপর আমার একচেটিয়া অধিকার।

একেবারে ছেলেবেলায় তাঁকে গিয়ে প্রণাম করতাম, তিনি একটু কানটা টেনে দিতেন। তারপরে বয়স যখন কিছু বেশী হলো, প্রণাম করলে তখন আর কানে হাত দিতেন না। কানের পাশের একগোছা চুল টেনে দিতেন। কেন এই পরিবর্তন জানি না। হয়তো ভাবতেন, ও এখন একটু বড় হয়েছে। কানে হাত দিলে ওর আত্মাভিমানে লাগবে। আরেকটি ঘটনা বললে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তৎকালীন শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের সঙ্গে সম্বন্ধটা বুঝতে পারা যাবে। একদিন সকালবেলা মন্দিরে উপাসনা করে তিনি বেরিয়ে আসছিলেন, তাঁর গায়ের রংয়ের সঙ্গে গরদের ধুতি-চাদরের রং, নাকের সোনার চশমার রং, তার উপরে এসে পড়েছে ভোরবেলাকার সূর্যকিরণের রং—সবসুদ্ধ মিলে সে এক দৈবী ব্যাপার। আমরা আমলকী গাছতলায় দেখছি, আমার পাশে আমার সহপাঠীর এক শিশুপুত্র দাঁড়িয়েছিল, সে বাপের জামার আস্তিন টেনে অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলো, বাবা—এ কি

মানুষ ? তার মুখে আমাদের অনেকেরই কথা প্রকাশিত হল।

বালক কবি হায়্নের মনের কথা, বৃদ্ধ কবি "গ্যেটের" দর্শনে তাঁর যা মনে হয়েছিল, মনে হয়েছিল, তিনি মানুষ নন, দেবরাজ জুপিটার। কিন্তু কোথায় গেল তাঁর পায়ের কাছে বাহন ঈগল পাখাটা! তখন বালকের দৃষ্টি গ্যেটের মুখের দিকের থেকে পায়ের দিকে সন্ধানরত। এ কাহিনী অনেক পরে বেশী বয়সে পড়েছি। কিন্তু সেদিন ভোরবেলায় বৃদ্ধ কবিকে দেখে 'দৈবী' ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। এ থেকে বুঝতে পারা যাবে, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের মধ্যে অলৌকিকতার পটভূমি তৈরী হয়েই ছিল। কাজেই কোনও ছাত্র-বিশেষের পক্ষে মনে করা সম্ভব ছিল না যে তিনি তারই বিশেষ ধন।

শান্তিনিকেতনের ছাত্রসংখ্যা যখন একশোর উপরে, বোধ করি দেড়শোর কাছাকাছি, তখনও তিনি সকলের নাম জানতেন, মুখ চিনতেন, সকলেই তাঁর স্নেহের অংশের ভাগী ছিল। কাজেই আমি যে বিশেষভাবে তাঁর স্নেহের দাবীদার হবো, এমন মনে করবার কারণ নেই। আবার যদি কোনো পুরাতন ছাত্র তার ছেলেকে বা ভাইকে নিয়ে এসে ভর্তি করে দিতো, সে সংবাদ তিনি রাখতেন। পুরাতন ছাত্রটিকে ডেকে নিয়ে এসে, তার ছেলে বা পুত্রের সমস্ত খবর খুঁটিয়ে জেনে নিতেন। এই-ভাবে ছাত্রদের পরিবারের সঙ্গে, ঘর-বাড়ির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হতো। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পরে এই অবস্থার যে কি রকম পরিবর্তন ঘটেছিল, তা একটি ঘটনা থেকে জানা যাবে। রবীন্দ্রনাথের গত হওয়ার দশ-বারো বছর পরে, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ভর্তি করে দিলাম। কেউ কোনও বিশেষ খবর নিলো না। আমি একটু বিস্মিত হলাম। বুঝলাম গুরুতর পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। বছর দুই পরে আমার ছেলেটিকে ওখান থেকে নিয়ে আসতে বাধ্য হলাম।

তারপর একদিন কথাপ্রসঙ্গে সর্বময় কর্তার কাছে আমার ছেলেটির কথা উঠলো। তিনি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ছেলে ছিল নাকি ? আমি নিরুত্তর হয়ে মনে মনে ভাবলাম, হায়, সে রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই।

নূতন ছাত্র ভর্তি হচ্ছে, পুরাতনরা পাঠ সাঙ্গ হবার আগেই কোনও কারণে চলে যাচ্ছে। এই যাতায়াতের মধ্যে কোনো ছাত্র যদি স্থায়ী চিহ্নের মত থেকে যায়, তবে সে চোখে না পড়ে পারে না। এই ভাবেই

আর কোনও কারণেই না হোক, অবিচল স্থায়িত্বের জন্য রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ে গেলাম। এই চোখে পড়বার আরো কারণ ছিল। আগেই বলেছি ওখানে মাঝে মাঝে সাহিত্য-সভা হতো। রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকলে তিনি এসে বসতেন। তিনি এসে বসলে রচনা-পাঠাথীদের সংখ্যা কমে যেতো। কিন্তু আমি অকুতোভয়ে গদ্য পদ্য যা লিখতাম, পড়তাম।

তিনি দেখতেন, বাঃ, এ দেখছি আমাকে মোটেই ভয় করে না। তাঁর চোখে পড়বার এটাও একটা কারণ। তারপরে একটা ঘটনা ঘটলো, যাতে করে আমার সম্বন্ধে তাঁর দায়িত্ববোধ আরো বেড়ে গেল। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করলে, তিনি আমাকে বললেন, 'তুই এখানেই থেকে যা, কলেজে গিয়ে আর ভর্তি হোস না। কলেজে এমন কি শেখাবে, যা আমরা এখানে শেখাতে পারি নে।' আমি বিনা দ্বিধায় রাজি হয়ে গেলাম। আমি তো রাজি হলাম। তাঁর দায়িত্ব যে অনেক বেড়ে গেল, সে কথা তখন বুঝিনি। আমার পড়াশোনার অনেকটা ভার তিনি নিজে হাতে নিলেন আর লাগিয়ে দিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতি প্রবীণ অধ্যাপকদের। তরুণ অধ্যাপকরা দেখলেন, এই ছাত্রটির উপর গুরুদেবের বিশেষ নজর আছে। কাজেই তাঁরা বুঝলেন, এর পড়াশোনার আনুকূল্য করলে, তাঁদের প্রতিও গুরুদেবের নজর পড়বে। তখন কেউ বা আরম্ভ করলেন ফরাসী, কেউ বা আরম্ভ করলেন ইটালিয়ান ভাষা, কেউ বা আরম্ভ করলেন ইংরাজী কোনও দুরূহ গ্রন্থ। তখন একটি ছাত্রকে নিয়ে পাঁচজনের মধ্যে টানা-টানি শুরু হয়ে গেল। কোনও রকম আয়োজনের প্রয়োজন ছিল না। ছাত্রটিকে টেনে নিয়ে কোনও একটা গাছের তলায় বসে পড়লেই হল। এদিকে ছাত্রটির তো প্রাণান্ত। যখন কলেজে না গিয়ে শান্তি-নিকেতনে থাকবার প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলাম, তখন কে জানতো যে, এমন ভাবে চতুরঙ্গ বাহিনীর চাপে, মর্দিত, ক্লিষ্ট, পিষ্ট হতে হবে। তার উপরে আবার ছিল সাহিত্যসভাদি। আর নানারকম ছোটখাটো অভিনয়ের আয়োজন। সবার উপরে ছিল, দুপুরবেলায় আহারান্তে রবীন্দ্রনাথের কাছে ইংরাজী পাঠ গ্রহণ। যে বিবরণ গ্রন্থান্তরে লিখেছি। আর যে সব ছাত্রদের গানের গলা ছিল, তারা সহজেই রবীন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতো।

ম্যাট্রিকুলেশন পাস করবার বছর দুই এইরূপে নিরালম্ব ভাবে আমার কাটলো। তার পরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল বিশ্বভারতী। তখন ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বয়স্ক ছাত্ররা আসতে লাগলো। আর আমিও তখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছি। কাজেই আমার নামটাও বিশ্বভারতীর খাতায় উঠলো। এই সময়ে এমন একটি ব্যাপার ঘটলো, যার ছাপ আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীতে রয়ে গিয়েছে।

বোলপুর শহরের চারিদিকে অনেক বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে, যেমন সুরুল, ইলমবাজার, মৌখিরা প্রভৃতি। রায়পুরের নাম তো আগেই করেছি। একদিন আমরা বিশ্বভারতীর কয়েকজন ছাত্র বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে উপস্থিত হলাম সুপুর গ্রামটাতে। সেদিন ছিল রথ-যাত্রার টান। গিয়ে দেখি উঁচু একটা খড়ের ঘরের মধ্যে ভারি একটা রথ দণ্ডায়মান, আর সবাই মিলে তার দড়ি ধরে টানছে। রথ নড়ে না। শেষে আমরাও হাত লাগালাম, তবু রথ অনড়। গাঁয়ের লোকে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। এ কি, রথ চলে না কেন? এতে তো গাঁয়ের অমঙ্গল সূচিত হচ্ছে। এমন সময়ে সকলে দেখলো ধানের কলের কাজ শেষ করে সাঁওতাল নরনারী আসছে। তখন আমার মনে হঠাৎ চমক খেলে গেল যে এদের দিয়ে রথের দড়ি টানালে কেমন হয়?

আমরা নিজেদের মধ্যে কানাকানি করলাম। সন্দেহ হল গাঁয়ের লোকের পছন্দ হবে কিনা! তারা তো পরিত্রাণের পথ দেখে তখনি রাজী হয়ে গেল। সাঁওতালদের কাছে প্রস্তাবটা করবামাত্র তারা তখনি রাজী হল। আর হাসতে হাসতে রথের দড়ি ধরে টান শুরু করলো। রথ ঘড়ঘড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পথ ধরে ছুটলো।

গাঁয়ের লোকের মুখে হাসি ফুটলো। এবং সকলে স্বস্তি অনুভব করলো। কয়েকদিন পরে একটা নাটক লিখলাম. যার নাম দিয়েছিলাম রথ-যাত্রা। সেটি বিশ্বভারতীর বয়স্ক ছাত্রদের সভায় পড়লাম। আশ্রমের যেখানে যা ঘটতো সব কথাই রবীন্দ্রনাথের কানে গিয়ে পৌঁছুতো। এ কথাটাও পৌঁছলো। পরের দিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই নাকি একটা নাটক লিখেছিস, সবাই প্রশংসা করছিল, আমাকে দেখাস।" আগেই বলেছি, এসব বিষয়ে আমি অকুতোভয় ছিলাম। নাটকের খাতাখানা নিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে দিলাম। বললেন, "কয়দিন পরে আসিস।" ক'দিন পরে দেখা হতেই

খাতাখানা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "এক কাজ কর—এটার একটা কপি করে রামানন্দবাবুর নামে পাঠিয়ে দে, প্রবাসীতে ছাপবেন।" এমন সুবর্ণ সুযোগ আসা সত্ত্বেও আমি নিশ্চল নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন—"যা বলছি তাই কর। জিনিসটা খুব ভাল হয়েছে।" বললাম—"সেই জন্যই তো পাঠাবো না।" অধিকতর বিস্মিত হয়ে তিনি বললেন—"কেন রে?" বললাম, "রামানন্দবাবু যদি লেখেন, বিশী, আরেকটি ঐ রকম নাটক লিখে তুমি পাঠাও, তবে কি আপনি লিখে দেবেন?"···বললেন—"আমি পরের লেখা আর কত লিখবো।" "আমিই বা পরের লেখা কেন ছাপতে যাবো? ওর মধ্যে আমার নিজস্ব কিছু নেই।" তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন (বোধহয় একটা দীর্ঘনিশ্বাসও পড়েছিলো), "নাঃ, তোকে দিয়ে কিছু হবে না। যা।" পরে আমার নাটকটির সংশোধিত রূপটি "রথ-যাত্রা" নামে প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্গে একটি ছত্র তিনি ব্যাখ্যাস্বরূপ লিখলেন। এবং ঐ ব্যাখ্যার ফলে আমাকে চিরকালের জন্য বিপাকে ফেলে গেলেন। তিনি লিখেছিলেন যে এই নাটকের ভাবটি আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান প্রমথনাথ বিশীর রচনা থেকে গৃহীত। কথাগুলো ঠিক এরকম না হতে পারে, তবে তাঁর গ্রন্থাবলীতে যথাযথ ভাবে মুদ্রিত আছে। এখন ধীরেসুস্থে বিপাকটা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ছাত্ররা মূল বই পড়ুক বা না পড়ুক তার পাদটীকা পড়তে কখনো ভুলে যায় না। এটা তাদের পরীক্ষা পাসের অঙ্গ। তাদের ধারণা, পরীক্ষা পাসের সব তুক্ ঐ পাদটীকাতে আছে। তারা পাদটীকা পড়ে বুঝলো যে, আসল গ্রন্থকার তাদের সম্মুখে উপবিষ্ট। কাজেই তারা সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করতো, ঐ নাটকের কতটা অংশ আপনার রচিত? আমি যদি বলতাম, ওর কিছুই আমার রচনা নয়, তবে সেটাকে তারা বিনয় বলে অবিশ্বাস করতো। যতদিন ছাত্রদের পড়িয়েছি, এরকম উত্তর-প্রত্যুত্তর আমাদের মধ্যে চলতো। আবার কোথাও সভা করতে গিয়েছি, সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হওয়া মাত্র শ্রোতাদের মধ্য থেকে ঐ একই প্রশ্ন বহন করে চিরকুট আসতে আরম্ভ করতো। "না" বললে বিনয় মনে করতো, "হ্যাঁ" বললে নিতান্ত মিথ্যা হতো। এটাই বিপাকের মূল।

সেই তরুণ বয়স থেকেই আমার ইচ্ছা ছিল সাহিত্যিক হবো।

কিন্তু গোড়াতেই এমন জগদ্দল পাথর গলায় বেঁধে জলে নামবো কোন্ সাহসে। তবে আমার গোড়ায় ভুল হয়ে গিয়েছিল, সেটা আমার বৈষয়িক বুদ্ধির অভাববশতঃ। আমার উচিত ছিল, তাঁর হাতের লেখা খাতাখানা চেয়ে রাখা। আজ তা অমূল্য সম্পদ হতে পারতো। এই বৈষয়িক বুদ্ধির অভাববশতঃই আর একটা অমূল্য সম্পদ হারিয়েছি। তিন বৎসর শান্তিনিকেতন পত্রের সম্পাদক ছিলাম আমি। এই পত্রে রবীন্দ্রনাথের যত লেখা থাকতো সবই যেতো আমার হাত দিয়ে। আমার বিষয়বুদ্ধি প্রখর হলে সেই লেখাগুলি কপি করে প্রেসে দিতাম। আর এই তিন বছরের তাঁর এই মূল লেখাগুলি একত্রে বাঁধাই করে রেখে দিলে, আজ একটা রাজার ঐশ্বর্য হতো।

আরও একটা হস্তচ্যুত ঐশ্বর্যের কথা মনে পড়ছে। "রবীন্দ্র কাব্য-প্রবাহ" নামে আমার একখানি বই আছে। সেখানাকে আমার প্রথম আমলের বই বলেই ধরা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসে গিয়েছিল ১৯৩৫ সালে। ছাপা হয়ে বেরোল ১৯৩৯ সালে। বের হওয়া মাত্র আমার অভ্যাসমত রবীন্দ্রনাথকে এক কপি বই পাঠিয়ে দিতাম। বইখানার মধ্যে "রবীন্দ্রকাব্যে দোষ" নামে যে একটি পরিচ্ছেদ ছিল, তা খেয়াল হয়নি। আর খেয়াল হলেই যে পাঠানো বন্ধ করতাম, তা মনে হয় না। মনে হতো খুব একটা বাহাদুরি হলো। নির্বুদ্ধিতা আর কাকে বলে? সে আমলে রবীন্দ্রকাব্যে দোষ যে থাকতে পারে, এ ধারণা কারো ছিল না। সকলেই প্রশংসাবাদের আতিশয্য করতো। রবীন্দ্রনাথ বইখানা সম্বন্ধে একখানা পত্র লিখে-ছিলেন, সেটা বহু পরবর্তীকালে মুদ্রিত হয়েছে। যে সময়ে ঐ পত্রখানা ছাপা হলে আমার কিছু উপকার হতে পারতো, তখন ছাপবার কথা মনে পড়েনি, আবার আরেক দফা নির্বুদ্ধিতা। তবে ঐ রবীন্দ্রকাব্যে দোষ বলতে দুটি দোষ, আমার চোখে পড়েছিল। অতিকথন ও সামান্যকথন। অনেক কাল পরে, রবীন্দ্রনাথ তখন গত হয়েছেন, তখন বুঝলাম যে কি আঘাত তিনি পেয়েছিলেন, ঐ দুটি তথাকথিত দোষের উল্লেখে। ওস্তাদের মার এলো শেষ রাত্রে। পরবর্তীকালে জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার নামে উপন্যাসখানা তাঁর নামে পাঠিয়েছিলাম। সে বইখানা আবিষ্কৃত হল উত্তরায়ণে তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে। আমার কোনও বন্ধু আমাকে এই শর্তে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, পড়া শেষ হলে

যেন তাঁকে পাঠিয়ে দিই। বইখানা খুলে দেখি যে অতিপরিচিত হস্তাক্ষরে মার্জিনে লিখিত আছে "এ কি অতিকথন নয়?" "অতিকথন আর কাহাকে বলে!" "অতিকথনের চূড়ান্ত।" এই রকম সব মন্তব্য। বুঝলাম পাঁচ বছর আগের লিখিত আমার মন্তব্যের এগুলি প্রতিমন্তব্য। আমার উচিত ছিল, ঐ বইখানা কাছে রেখে দিয়ে তার বদলে আরেক-খানা নূতন কপি পাঠিয়ে দেওয়া। আবার ভুল হয়ে গেল। আবার করলাম আরেক দফা নির্বুদ্ধিতা। প্রমাণ করে দিলাম নির্বোধ একাধিকবার বেলতলায় গিয়ে থাকে।

আবার আর একদফা নির্বুদ্ধিতা। এই রকম নির্বুদ্ধিতা ধাপে ধাপে আমার পথ চলার চিহ্নে দেখতে পাওয়া যাবে।

কোনও একটা কথা বার বার শুনলে যতই তা অসম্ভব হোক্ সত্য বলে মনে হয়। নানা কারণে—অভিনয়, যাত্রাপালা, সাহিত্যসভা প্রভৃতি—বিশেষ ভাবে রথযাত্রা নাটকটায় রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপের ফলে লোকের ধারণা হল যে আমি তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্র। এবং ক্রমে আমারও মনে সেই রকম ধারণার অনুরূপ দেখা দিতে লাগলো। কখনো কখনো নিজেকে আমি প্রশ্ন করতাম, এসব কথা কি সত্য? আমার এমন কি গুণ আছে, যাতে আর সকলকে ছাপিয়ে তাঁর স্নেহের সিংহভাগ দাবী করতে পারি! হঠাৎ একদিন আমার ভ্রমান্ত ঘটলো। ওথেলো যেমন দর্পণে আপনার বিম্বিত গায়ের রং দেখে সবিস্ময়ে বলে উঠেছিল, "It is the cause, It is the cause," আমারও অন্তরাত্মা বিস্মিত চিৎকার করে উঠলো। অবশ্য এক্ষেত্রে দর্পণটা নিতান্তই রূপক। আমার চেহারা সম্বন্ধে কোন কালেই অভিমান বা অহমিকা ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত স্নেহের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আমার চেহারাকে নূতন করে দেখলাম। গাল দুটো ফুলো ফুলো, নাসারন্ধ্র আয়ত, গায়ের রং অতি মুগ্ধ সহধর্মিণীও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ছাড়া বলতে পারবে না। সবসুদ্ধ মিলে কেমন একটা বোকাটে বোকাটে ভাব (বকাটে নয়)। তখন বুঝলাম জননীদের যে কারণে অবোধ শিশুর প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ হয়, খুব সম্ভব সেই কারণেই আমার মত অবোধ বালকের উপরে রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত স্নেহ। এই ভাবটি মনে হওয়া মাত্র আমার উদ্গত-অঙ্কুর অভিমানের শিরে মোহমুদ্গর নিক্ষিপ্ত হল। তারপর থেকে, এই বিষয়ে আমি মুক্তমোহ।

যাক, এখন অন্য প্রসঙ্গ তোলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের স্নেহ সর্বব্যাপী ছিল। এবং যথাসম্ভব সেই স্নেহকে তিনি সমান ভাবে বণ্টন করে দিতে চেষ্টা করতেন। এই চেষ্টার কয়েকটি বিশেষ ধরন ছিল। আশ্রমের ছেলেদের যাদের গানের গলা ভাল, তারা স্বভাবতই বেশী স্নেহ দাবী করতে পারে। অনাদি, বুনি, সমরেশ প্রভৃতির নাম নাম করা যেতে পারে। আহারান্তে দুপুরবেলা বয়স্ক ছাত্রদের ইংরাজী পড়াতেন। তাদের মধ্যে আমাদেরও স্থান ছিল। সন্ধ্যাবেলা পুরোদস্তুর আসর বসতো। কখনো বা নিজের কোনও কাব্য নিয়ে পাঠ ও বিচার চলতো। তখন বলাকা কাব্য পাঠ চলছে।

একদিনের কথা মনে পড়ে, একটি ছত্রের যা ব্যাখ্যা করলেন, তা আমার মনঃপুত হলো না। যদিচ আমি একপাশে ভক্ত গরুড়টির মতো বসে থাকতাম, কিন্তু সমস্ত মনোযোগ নিক্ষিপ্ত হতো রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যার উপরে। একটি ছত্রের ব্যাখ্যা করলেন, সেই ছত্রটি হচ্ছে, "নিস্তরঙ্গ নদীর জলে উঠলো ভেসে তারার ছায়াতরী।" এতদিন পরেও সেই ছত্রটা মনে রয়ে গেছে। আমি বাধা দিয়ে অন্যরকম ব্যাখ্যা করলাম, বললাম, এমনটি হয় না? তিনি একটু থেমে গিয়ে বললেন—রোসো, রোসো। মাঝে মাঝে 'রোসো, রোসো' বলা তাঁর একটা স্বভাব ছিল। তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে, আর সকলের উদ্দেশে বললেন, যদিচ ও ঘাপটি মেরে বসে থাকে, কিন্তু ওকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথের ভালমন্দ লাগার তেজী-মন্দী খুব স্পষ্ট ছিল। কারো বুঝতে অসুবিধা হতো না। তখনই বেশ বুঝতে পারলাম শ্রোতাদের মনে একটা তেজীভাব দেখা দিল, সবাই আমার সম্বন্ধে মন্দী ভাবটাতেই অভ্যস্ত ছিল। এরপর থেকে আমার সম্বন্ধে শ্রোতাদের মতান্তর ঘটলো। রবীন্দ্রনাথের কথা আর বিশেষভাবে বলবো কি? আমার সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনও সংশয় বা ভরসা ছিল না। এরই সমর্থনে আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করছি। জোড়াসাঁকোর যে বাড়িটিকে লালবাড়ি বলা হয়ে থাকে, তারই পূর্ব-দক্ষিণ কোণের কক্ষটিতে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি, তখন আরো কয়েক-জন লোক উপস্থিত ছিল, হঠাৎ তিনি পদ্মা উপন্যাসখানির প্রসঙ্গ তুললেন, কি কারণে জানি না। বইখানা তাঁর খুব ভাল লেগে গিয়েছিল, এ বোধ করি অবোধ শিশুর প্রতি মাতার স্নেহের আরেকটি

উদাহরণ। তিনি একটু থেমে বললেন, আর কিছুদিন পরে তোকে নিয়ে আমরা গৌরব করতে পারবো। আমার প্রগল্‌ভ রসনা তখনই বলে ফেললো—"এখনই করতে পারেন, আখেরে ঠকবেন না।" হায়রে সংসারের গতি! প্রশংসাবাক্যের সাক্ষী মেলা ভার। আর সাক্ষী থাকলেও তারা সময়মত হাজির হয় না। নিন্দার সাক্ষীর কখনোই অভাব ঘটে না।

সেদিনকার শান্তিনিকেতনে সবচেয়ে পরিশ্রমী ব্যক্তি ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ভাল করে ভোর না হতেই হাত মুখ ধুয়ে তিনি উপাসনায় বসতেন। উপাসনার পরে শুরু হতো তাঁর লেখাপড়ার কাজ। তাঁর একটি অভ্যাস ছিল, লেখবার সময় গলাখাঁকারি দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিতেন। সেই উদাত্ত গলাখাঁকারি শুনে শান্তিনিকেতনের অধিকাংশ পল্লীর ঘুম ভাঙতো বলা অন্যায় হয় না। একদফা লেখা শেষ হলে তিনি বেরিয়ে পড়তেন ছাত্রদের পড়াশোনা দেখতে এবং নিয়মিত ক্লাসটি পড়াতে। সে ক্লাসের বর্ণনা দিতে গেলে অনেকটা জায়গা লাগবে, সংক্ষেপে বলবো। পড়াবার বিষয় ইংরিজি কাব্য। তখনকার নিয়ম অনুসারে চতুর্থ শ্রেণী বলতে হবে। ইংরিজি কাব্য বলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারেকাছে যেতো না। হয়তো বইখানা হাতে করেই এসেছেন। শেলি ও কীটসের কবিতা তাঁর খুব প্রিয় ছিল। তারই মধ্যে যে কোনও দুটো পড়াতে শুরু করলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে এসব কবিতা অনার্স শ্রেণীর নিচে পড়ানো হয় না। এখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের এসব পড়ানো, তথা বোঝানো, অসম্ভব বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে অভ্যস্ত। কবিতাগুলির রস বিতরণে ভাষাজ্ঞানের বিশেষ দরকার হয় না। ক্লাসের নিয়মিত ছাত্রগণ ছাড়া অনেক প্রবীণ ব্যক্তি এসে বসতেন। তার মধ্যে প্রবীণতম রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কথা মনে আছে। ঘণ্টাখানেক পরে রবীন্দ্রনাথ উঠে পড়তেন, ক্লাস ভেঙে যেতো। আবার ফিরে গিয়ে শুরু হতো তাঁর আরেকদফা লেখার কাজ। এইভাবে থাকে থাকে তাঁর নানারকম কাজের পালা চলতো। এর উপরে আবার বিদ্যালয়ের পরিচালনার কাজও দেখতে হতো। এই গেল তাঁর সকালবেলার রুটিন। দুপুরবেলার আহারান্তে কখনো তাঁকে শুয়ে থাকতে দেখিনি। এবারে বয়স্ক ছাত্ররা এসে

জুটতো, পড়ানো হতো নানা বিদেশী কাব্য। ব্রাউনিং-এর কাব্য দুরূহ বলে পরিজ্ঞাত, কিন্তু দেখেছি Luria নাটকখানি এক হাতে ধরে বাংলায় ব্যাখ্যা করে যেতেন। ব্রাউনিং-এর দুরূহতা রবি-কর-স্পর্শে তরল হয়ে আসতো। এই সব সময়েই ছাত্রসংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না। যার সুযোগ হতো এসে বসতো। তখন ব্রাউনিং বুঝবার বয়স আমার নয়। দেখতাম, রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে কিছু একটা তরল পানীয় পান করতেন। আমার ধারণা হল ওতে ব্রাউনিং বুঝবার সাহায্য করে। রবীন্দ্রনাথ আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে তাঁর সেবককে চোখের ইঙ্গিতে আরেক গ্লাস সেই পানীয় এনে দিতে বললেন। পান করে দেখলাম ব্রাউনিংকে জব্দ করবার ওষুধ বটে, ঘোরতর তিক্ত, নিমপাতা-সিদ্ধ জল।

এই সময় ইবসেনের 'লেডি ফ্রম দি সি' নাটকখানা পড়েছিলেন বলে মনে আছে। আমি এক সময়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম টলস্টয়ের কিছু পড়েছেন কি না, বলেছিলেন টলস্টয়ের না, টুরগেনিভের অনেক উপন্যাস পড়েছেন। ইংরিজি কাব্যের মধ্যে ম্যাথু আরনল্ডের অনেক কবিতা তাঁর প্রিয় ছিল। বায়রনের কবিতার বিশেষ পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ সম্বন্ধেও সেই কথা। এইভাবে দুপুর-বেলার পালা শেষ হলে চা-পানের ডাক পড়তো। অন্যান্য পড়ুয়ারা চলে যেতেন। আমি গড়িমসি করে গড়িয়ে গড়িয়ে চায়ের আসরের কাছে জুটতাম। তারপর আবার শুরু হতো সান্ধ্য-আসর। এবারে বিনোদনটাই প্রধান। নূতন গান করবার ভার পড়তো দিনুবাবুর উপরে। নূতন কবিতা পাঠ করতেন তিনি নিজে। একদিন Leaves of Grass-এর একটা কবিতার পাশে লিখিত দেখা গেল, "তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ"। তখন আসরের সভ্যদের মধ্যে গবেষণা চলছে যে কার হাতের লেখা। অনেকেরই মত কবি সতীশচন্দ্র রায়ের। কিন্তু আসল মন্তব্যকারী নিকটেই বসে পলকে প্রলয় গুনছিল। শান্তিনিকেতনের আবহাওয়ার একটা গুণ ছিল, অনেক অকালপক্ব বালক সেখানে যেতো। আর যাদের পাকবার বয়স হয়নি তারাও মাটির গুণে পেকে উঠতো। একদিন এক অতিথি ঘুরে ঘুরে সব দেখছিলেন, তাঁর চোখে পড়লো—একটি বালক "রুশো অ্যাণ্ড রোমান্টিসিজম" নামে একখানি বই একমনে পড়ছে। তিনি বুঝলেন,

ছেলেটির এ বই পড়বার বয়স হয়নি। তিনি সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, খোকা, বইখানা বুঝতে পারছো? খোকাটি উত্তর করলো —অন্তত না বুঝবার আনন্দ পাচ্ছি। এই গল্পটি তখন মুখে মুখে চালু হয়ে গিয়েছিলো।

আশ্রমের কাজ ছাড়াও অন্য অনেক কাজ তাঁর ঘাড়ে ছিল। বিরাট জমিদারী পরিদর্শন করে বেড়ানোতে অনেকটা সময় যেতো। তার উপরে কলকাতায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালন করতে হতো। তারপরে যখন বিদেশ যাত্রার পালা শুরু হল তখন নিয়মিত কাজের চাপ থেকে মুক্তি পেতেন বটে, তবে বিদেশভ্রমণ নিতান্ত শৌখিন ব্যাপার হতো না। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা করে বেড়ানো কম শ্রমসাধ্য ব্যাপার নয়। বিশ্বভারতী নামে নিত্যক্ষুধার্ত যে গরুড়শিশুটিকে লালন করবার ভার তাঁর উপর পড়েছিল তার জন্য খাদ্য যোগাবার দায়িত্ব ছিল তাঁর। এ হেন পরিশ্রম নিতান্ত বিরক্তিকর হতে বাধ্য, তবু না করে উপায় ছিল না। আশ্রমে ফিরে আসলে হাঁপ ছাড়তেন বটে, কিন্তু সেখানকার নানারকম খুচরো দায়িত্ব তাঁর জন্য অপেক্ষা করে থাকতো। তাঁর ছিল মীন রাশি। মীন রাশির সবই ভালো কিন্তু দায়িত্বের চাপ কখনো ফুরোয় না। অন্য লোক হলে দেশে-বিদেশে ছড়ানো এই সব দায়িত্বের চাপে মুষড়ে পড়তো। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে অফুরন্ত রসের উৎস ছিল, তাই বাঁচিয়ে দিয়েছিল তাঁকে। যতদিন তাঁর পা দুটো শক্ত ও সচল ছিল, ছাত্রদের ঘরে, অধ্যাপকদের বাড়িতে ঘুরে বেড়াতেন, কিন্তু অবশেষে পা যখন জবাব দিল তখন প্রথমে ঠেলাগাড়িতে যাতায়াত করতে হতো। অবশেষে একটা মোটরগাড়ি জুটে গেল। তখন আশ্রমের এমন সাধ্য ছিল না যে, মোটরগাড়ি কেনা যায়; গাড়িটা কোনো ধনীর দানের সামগ্রী হবে।

আশ্রমের অর্থের দায় যোগাবার উদ্দেশ্যে তাঁকে দেশের নানা শহরে গানের ও নাটকের দল নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হতো। এই রকম অবস্থায় যখন তিনি দিল্লীর দারুণ গরমে গিয়েছেন তখন সেখানে ঘটনাক্রমে ছিলেন গান্ধীজী। গান্ধীজী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, আপনার এই পরিণত বয়স, তখন বোধ করি ১৯৩৬ সাল, আর আপনি অভিনয় করতে এসেছেন কিসের দায়ে? রবীন্দ্রনাথ

জানালেন বিশ্বভারতীর ঋণ শোধ করবার আশায়। গান্ধীজী ঋণের পরিমাণ জেনে নিয়ে ষাট হাজার টাকা তাঁকে সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিলেন। সে দফা তিনি ঋণমুক্ত হলেন বটে, কিন্তু বছর ঘুরতেই আবার ঋণের পরিমাণ জমে উঠলো। মীন রাশির জাতকের হাতে যতই অর্থ আসুক, অর্থের উদ্বেগের কখনো বিরাম হয় না।

রবীন্দ্রনাথের এই বিপুল পরিশ্রম করবার ক্ষমতা যখন মনে পড়ে, আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে তাঁর অন্তহীন উদ্বেগ, তখন বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। এই পরিশ্রম ও উদ্বেগের একেবারে অবসান ঘটলো তাঁর জীবনের অবসানের সঙ্গে।

সেকালের শান্তিনিকেতন খড়োঘরের পল্লী ছিল। যাতায়াতের পথ পাকা ছিল না। যাতায়াতের একমাত্র উপায় ছিল, হয় পদব্রজে, নয় গোযান। আহারাদির ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব সবল ছিল, স্নানের জলের জন্য ছিল কতগুলি ইঁদারা। দারুণ গ্রীষ্মের তাপে সেগুলি শুকিয়ে গেলে নিকটবর্তী বাঁধ নামে জলাশয় জল যোগাতো। আর অধিকাংশ আবাসিক নগ্নদেহ ও নগ্নপদ, অভাব অভিযোগের যে অন্ত ছিল না তার বর্ণনা ও বিবরণ গ্রন্থমধ্যে দিয়েছি। আর চাকুরির স্থায়িত্ব ছিল পদ্মপত্র জলের মতো। তবু যে কারো মনে বিশেষ অসন্তোষ ছিল, মনে হয় না। অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎকে অগ্রাহ্য করে লোকে যে বাস করতো তার কারণ কি? তার কারণ আর কিছুই না। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা ছিল, এটি একটি বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার হবে। যদি তা না হয়ে থাকে, তবে সে দোষ রবীন্দ্রনাথের নয়। দেশের সামাজিক অবস্থার। আরও একটি কারণ ছিল, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের প্রভাব। বর্তমানের প্রাসাদোপম উত্তরায়ণ পরিকল্পনার মধ্যেও ছিল না। যে ভূখণ্ডে এখন উত্তরায়ণ প্রতিষ্ঠিত, তারই এক কোণে ছিল বর্তমান কোণার্ক গৃহটি। সে গৃহটিও খড়ের ও মাটির। সেখানেই ছিল রবীন্দ্রনাথের বাসস্থান। সন্ধ্যাবেলায় সেখানে গানের অভিনয়ের কাব্যপাঠের যে আসর বসতো, তাতে নবরত্নের সমাবেশ হতো। সেখানে গিয়ে সন্ধ্যার পরে বসলে সারাদিনের অভাব অভিযোগ ও গ্লানি ধৌত ও শান্ত হয়ে যেতো, পুরাণে বলে যে এরকম একটি নবরত্নের সভা ছিল বিক্রমাদিত্যের। ইতিহাসে বলে, আকবর বাদশারও গুণীজন সভা ছিল। শান্তিনিকেতনের নবরত্ন সভার বিবরণ

লিখিত হয়নি, কোনও দিন হবে এমন আশা দেখি না। নবরত্নদের নাম এই গ্রন্থমধ্যে নানা পরিচ্ছেদে আছে। আর তার কেন্দ্রাধিপতি ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। যিনি একদেহে কালিদাস ও বিক্রমাদিত্য। এই "পুরানো সেই দিনের কথা"য় তারই বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছি। একে ইতিহাস বলা চলে না। যদি কোন পর্যায়ে একে ফেলতে হয়, তবে বলা উচিত পুরানো শান্তিনিকেতনের পুরাণ কথা।

॥ ১৯ ॥

বিদায়-সন্ধ্যা

অবশেষে বিদায় সন্ধ্যা আসন্ন হয়ে এলো।

সেদিন ভোরবেলা জেগে উঠে ঘরের বাইরে এলো প্রজ্ঞিত, তার মনে পড়লো বীথিকা গৃহের ওই কোণটিতে আশ্রমবাসের তার প্রথম রাত্রি কেটেছিল, তখনি আবার মনে পড়লো আজ আশ্রমবাসের শেষ রাত্রি। যার আদি আছে তার অন্তও আছে, ঘটনার এই নিত্য স্বভাব মনে পড়ে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো। শয্যাত্যাগ করে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এলো। এই গৃহটির উত্তর-পূর্ব কোণে একটি কচি মহুয়া গাছ ছিল, সেই গাছটির সঙ্গে তার দীর্ঘকালের পরিচয়। কাছে এসে চেয়ে দেখলো তার কোমল বল্কলে সেই নাম দুটি তেমনি লিখিত আছে। তবে প্রথম দিন যেদিন লিখেছিল, সে অনেক দিনের কথা, এখন অক্ষরগুলোর দাগ কতকটা বেঁকেচুরে গিয়েছে, তার মনে হল এমনিই হয়ে থাকে। প্রথম দিনের সেই অনাবিল মসৃণতা আজ কিছু ক্ষুণ্ণ। তখনই মনে হল লেখার দাগগুলি ক্ষুণ্ণ হলেও তাদের স্বভাব প্রথম দিনের মতই অক্ষুণ্ণ আছে।

কি দেখছেন ?

পিছনের দিকে চেয়ে চমকে উঠলো—এ কি, অতসী যে!

মনে হচ্ছে যেন নূতন দেখলেন।

তুমি তো চিরকালই নূতন।

তবে তার ভরসার মধ্যে এই যে আর বেশী দিন নূতন থাকবো না। আজকে বিদায়ের দিন।

তুমি কি ভাবো আমার সেকথা মনে ছিল না ?

অবশ্যই ছিল, তুয়ে একটু ভেদ আছে।

দেখো অতসী, তোমার তার্কিক স্বভাব, আজ এই শেষ দিনটার উপরে তর্কের আঁচড় কামড় দিয়ো না।

অতসী বলল, ঐ যে লেখাটির দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছেন, তার উপরেও তো কালের আঁচড়-কামড় পড়েছে, প্রথম দিনের অনাবিল মসৃণতা তো নাই।

যাক সে তর্ক। তার থেকে এসো ঐ রক্তকরবী গাছ থেকে একটি

ফুলের গুচ্ছ পেড়ে নিয়ে তোমার খোঁপায় গুঁজে দি।

আপনার কি ধারণা ঐ ফুলগুলো চিরকাল অম্লান থাকবে?

চিরকালের কথা ভাবিনি, আজকের দিনটা অম্লান থাকলেই যথেষ্ট মনে করবো। আজ সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত থাকলেই যথেষ্ট মনে হবে। আজ সন্ধ্যাবেলায় ভকিল সাহেবের বাড়িতে নিমন্ত্রণ আছে, তুমি এই ফুলের গুচ্ছটি খোঁপায় গুঁজে সেখানে যাবে। বলো যাবে?

যদি বলি, না যাবো না।

আজ এই শেষ দিনটিতে অযথা আর রাগিও না।

আশ্রমের বাগানে হেন ফুল নাই, আপনার কথায় যা শিরোধার্য করিনি। আজ এই ফুলের গুচ্ছটি খোঁপায় পরে গেলে লোকে কি বলবে!

এতদিন যা বলেছে তার বেশী নয়, বলবে অতসীটা প্রজিতকে ভালবাসে।

ছিঃ ছিঃ!

অতসী মনে রেখো, পুরুষের ভালবাসা ধিক্কারের বস্তু নয়। এর জন্যে সংসারে অনেক হানাহানি কাটাকাটি হয়ে গিয়েছে।

অতসী বলে উঠলো—বাপ্‌রে! তার চেয়ে ফুল গোঁজাই ভালো।

যতক্ষণ তাদের মধ্যে ঐ বিতণ্ডা চলছিল, পায়ে পায়ে তারা এগোচ্ছিল রক্তকরবীর গাছটির দিকে। প্রজিত একটি জ্বলন্ত গুচ্ছ পেড়ে নিয়ে তার খোঁপায় দিল গুঁজে।

বললো—কি, মনে থাকবে তো?

অতসী নত হয়ে প্রজিতকে প্রণাম করলো।

প্রজিত বলল, এটা তো নূতন দেখছি!

অনেক কিছুই আপনার চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। ঐ করবীর গুচ্ছ আপনার পা স্পর্শ করে আবদার করেছে, মনে রাখবার দাবী একতরফা না হতেও পারে।

প্রণত অতসীকে তুলে ধরবার অজুহাতে তার হাত ধরে তুলে দাঁড় করালো প্রজিত, বলল, তোমার হাতের মতো মনটি যদি নরম হতো।

প্রজিতের এই কথায়, অতসীর খোঁপার ফুলের সঙ্গে তার গালের রং-এর রেষারেষি হল।

সন্ধ্যাবেলায় ভকিল সাহেব বাড়িতে বিদায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ভকিল দম্পতি দেহলী বাড়ি থেকে উঠে এসেছেন। তাঁদের নূতন নিবাস একটি বড় খড়ের বাংলো—ছাতিমতলা থেকে একশো রশি ব্যবধানে

মুখোমুখি।

কালে কালে কত না জনে এ বাড়িতে বাস করেছেন। প্রথম বাসিন্দা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তারপর সুইডিশ পণ্ডিত স্টেনকোনো। তারপর এলেন অধ্যাপক কলিন্স। আরো অনেকে হবেন, মনে নেই। কলিন্সের স্মৃতি মনে থাকবার বিশেষ কারণ আছে। তিনি থাকতেন একটা নেয়ারের খাটের উপর। একটা কুকুর কোনও সুযোগে সেই নেয়ারের খাটের তলে ঢুকে মাথার গুঁতো মেরে অধ্যাপকের নিদ্রার বিঘ্ন ঘটাতো। অবশেষে সাহেব একদিন একখানা লাঠি নিয়ে শুলো। বিঘ্নকারক কুকুরকে উচিত শিক্ষা দেবেন। যথাসময় কুকুরের মাথার গুঁতো লাগলো সাহেবের পেটে। সশস্ত্র সাহেব প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, তড়াক করে নেমে খাটের তলে তাকালেন, কিন্তু কুকুর কোথায়, কোথাও নাই, সাহেব লণ্ঠন হাতে করে সন্ধান করলেন, না, কোথাও নেই। বিস্মিত সাহেব বলতে লাগলেন—I say where is the dog?

কুকুরের না থাকবার বিশেষ কারণ ছিল, সেদিন কুকুর নয়, ভূমিকম্পে নাড়া দিয়েছে। সাহেবের মুখে তখনো—I say where is the dog?

পরদিন আশ্রমে ঘটনাটা প্রচারিত হল। তারপর বহুদিন পর্যন্ত I say where is the dog লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। যাক্, এখন সেই বাড়িতে থাকেন ভকিল দম্পতি আর সন্ধ্যাবেলায় নিমন্ত্রিত হয়ে এসে আমরা অয়েকজন আছি। উপলক্ষ্যটা বিষাদের তাই সমারোহ ছিল না। ছিল অতসী, প্রজিত, প্রবীর ও আমি।

অতসী আজ শেষদিনে প্রজিতের কথা লঙ্ঘন করতে সাহস করেনি। তার খোঁপায় ছিল সেই রক্তকরবীর প্রকাণ্ড গুচ্ছটি।

এ কি, অতসী যে আজ গন্ধমাদন পর্বত মাথায় নিয়ে এসেছো!

আজ বিদায়ের দিনে প্রবীরের এই অসময়োচিত উক্তি মোটেই ভালো লাগলো না। বললাম, সকলের গন্ধমাদন বহন করবার শক্তি থাকে না।

আরে সেই জন্যই তো বললাম।

এই অসমীচীন উক্তি কারো ভালো লাগছিল না, তাই কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ভকিল বললেন—অতসী, তুমি কি কাল ভোরেই রওনা হচ্ছ?

হাঁ মিঃ ভকিল। মাথার বোঝাটা যত শীঘ্র নামানো যায়।

কিন্তু এদিকে যে একজনের বুকে শক্তিশেল বিদ্ধ হয়ে রইলো, তার কি ব্যবস্থা করে গেলে ?

এখানে একটু অন্তরালের কথা লেখা দরকার। প্রবীর ছিল অতসীর ব্যর্থ-প্রণয়ী, তাই খোঁচা দেবার সুযোগ ছাড়তো না।

কথার মোড় ঘুরলো না দেখে মিসেস ভকিল বললেন—অতসী, অনেকদিন তোমার গান শুনিনি। আজ একটা গান শুনিয়ে দাও।

প্রবীরের ব্যবহারে অতসী বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, তাই আপত্তি না করে আরম্ভ করলো।

"স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে, জাগার বেলা হল—
যাবার আগে শেষ কথাটি বোলো।
ফিরিয়া চেয়ে এমন কিছু দিয়ো
বেদনা হবে পরম রমণীয়—
আমার মনে রহিবে নিরবধি
বিদায়খনে খনেক-তরে যদি
সজল আঁখি তোল।
নিমেষহারা এ শুকতারা এমনি ঊষাকালে
উঠিবে দূরে বিরহাকাশভালে।
রজনীশেষে এই-যে শেষ কাঁদা
বীণার তারে পড়িল তাহা বাঁধা,
হারানো মণি স্বপনে গাঁথা রবে—
হে বিরহিণী আপন হাতে তবে
বিদায়দ্বার খোল॥"

অতসীর সুরের সূক্ষ্ম মলমল সমস্ত গৃহের তুচ্ছতার উপরে জাদুর পর্দা টেনে দিল। অনেকক্ষণ কেউ কথা বলতে পারলো না। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে দিয়ে মিসেস্ ভকিল খাওয়ার যোগাড় করলেন। লোক বেশী ছিল না, আয়োজন ছিল অল্প। কথাবার্তাতেও ভাঁটা পড়লো। অল্পক্ষণের মধ্যেই উপাহার শেষ হলো। তখন হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রজিত হঠাৎ চমকে উঠলো, দশটা বাজে আর নয়, কালকে শেষরাতে তোমাকে রওনা হতে হবে। সকলের মৌন সম্মতির লক্ষণ বলে গৃহীত হল।

বিদায়কালীন সম্ভাষণ জানিয়ে সবাই বেরিয়ে পড়লো। পাছে প্রবীরটা ওদের সঙ্গ নিয়ে রসভঙ্গ করে আমি তাই তাকে সঙ্গে নিয়ে আলাদা বললাম, আমার সঙ্গে এসো, কিছু গোপনীয় কথা আছে।

কিছুক্ষণ দুজনে নীরবে চলবার পরে প্রথম মৌনভঙ্গ করলো অতসী। বললো, দেখলেন প্রবীরটা কি অসভ্য!

তার কারণ কি জান? তুমি কোনও ছুতো পেলেই ওকে ঠোকর দিতে ছাড়ো না।

তার কারণ আপনারা কেউ আমাকে সাহায্য করেন না। আমি বরাবর দেখে আসছি ঐ লোকটা বড় অসভ্যতা করে।

আচ্ছা বেশ মেনে নিলাম, ও অসভ্য। এখন আমাকে কি করতে হবে বল। ওর সঙ্গে নিশ্চয় লড়াই করতে হবে না। আবার দুজন নীরবে চললো।

এবারে অতসী বললো—একটা কথা বলবো, রাগ করবেন না।

তোমার কথায় রাগ করতে হলে সারাজীবন রাগ করতেই হয়। তবু শুনি কি বিশেষ কথা। কি হল, চুপ করে থাকলে যে?

যা বলবো তার মধ্যেই একটা খুঁৎ ধরবেন। অতএব থাক।

অতএব বলেই ফেল। রাত এগারোটা বাজলো, কাল ভোরবেলায় রওনা হবে। গাড়ি যখন ছুটছে চল্লিশ মাইল বেগে, তখন মনে পড়বে, ইস—এই কথাটা বলা হয়নি!

আর আমি ভুল সংশোধনের জন্য গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়বো, আমি এমন নির্বোধ নই।

নাঃ, তুমি তার থেকেও বেশী নির্বোধ। গাড়ির চেন টানলেই গাড়ি থেমে যায়, লাফিয়ে পড়ার দরকার হয় না।

বিনা কারণে চেন টানলে জরিমানা দিতে হয়।

অতএব গোড়ার কথাটা যা বলতে চেয়েছিলে বলে ফেল। তাতে জরিমানা দিতে হবে না।

বলবো বলেই তো মনস্থির করেছি কিন্তু ভয় হচ্ছে পাছে রাগ করেন।

বলেই দেখো।

আচ্ছা আপনি এত ঘন ঘন আমাকে অতসী বলে ডাকেন কেন?

কেন বলবো? আজকের এই রাতটুকু মাত্র তোমাকে ডাকবার সুযোগ আছে। কাল থেকে তো তোমাকে ডাকতে পারবো না।

অতসী একটু ঠোকর দিয়ে বলল—কেন, মনে মনে!

কিন্তু উত্তরটা তো মনে মনে শুনতে পাবো না। আর তাছাড়া কি জানো? জোরে ডাকতে যে আনন্দ, মনে মনে ডাকাতে সে আনন্দ নাই।

কিন্তু আপনি জানেন না যে আপনার মুখে ঘন ঘন অতসী ডাকে আশ্রমের লোকেরা ঠাট্টা করে!

তারা যদি ঠাট্টা করে আনন্দ পায়, তবে তাদের বঞ্চিত করবো কেন?

মনে রাখবেন নামটা আমার।

এবারে ভুল করলে। নাম ধরে যে ডাকে নামটা তার।

তার মানে আপনি যথেচ্ছ ডেকে চলবেন!

আর যথেচ্ছ ডাকার সময় নেই। এই যে তোমাদের বোর্ডিং-এর কাছে এসে পড়েছি।

হঠাৎ যেন চট্‌কা ভাঙলো অতসীর। বলল—তাই তো।

যেন একটা নতুন সত্য সে আবিষ্কার করলো। তাদের বোর্ডিং যে এত কাছে যেন জানতো না।

তখন দুজনেই নীরব হল। বোর্ডিং-এর দোতলায় দু-একটি লণ্ঠন চলাচল করছে দেখল। আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। তখন হঠাৎ প্রজিত অতসীর হাতখানা চেপে ধরলো।

ছাড়ুন ছাড়ুন, আপনার হাতটা বড় শক্ত।

তোমার মনের চেয়ে নয়। এই বলে প্রজিত সোজা নিজের ঘরের দিকে রওনা হয়ে গেল।

অতসী বোর্ডিংএর দিকে চলে গেলে প্রজিতের বীথিকা ঘরে যেতে আর মন সরলো না। কারণ এই ঘরের সঙ্গে অতসীর অসংখ্য স্মৃতি জড়িত। একবারের কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়লো, সেদিনটা ছিল ভাইফোঁটার উৎসব। প্রজিত সেবারে বাড়ি না গিয়ে ওখানেই ছিল। মেয়েরা ঘরে ঘরে ফোঁটা দিয়ে ফিরছে, এমন সময় অতসী এসে ঢুকলো। পাছে আর কেউ আগে ফোঁটা দিয়ে দেয়, সেই জন্য সে তাড়াতাড়ি করে ঢুকে প্রজিতের কপালে একটা চন্দনের ফোঁটা দিল।

প্রজিত বললো, এ কি করলে? আর কেউ যদি দিতে চায়!

চাইলেই হল, যে আগে দেয় তারই দাবী।

আরেক দিনের কথা মনে পড়লো, অতসীকে নিয়ে। তখন বড়দিনের ছুটিতে সকলে নানা দলে ভাগ হয়ে বেড়াতে গেছে। মাঠে এক জায়গায় অতসীদের দলের সঙ্গে প্রজিতের দেখা হয়ে গেল। তখন অতসীদের চা-পানের পালা চলছে।

অতসী তাকে এক পেয়ালা চা এনে এগিয়ে দিল। প্রজিত তার হাত থেকে পেয়ালাটি নিয়ে চা পান করলো।

তখনও অতসী দূরের মানুষ ছিল। তবু সেদিনকার কথা ভুলতে পারেনি। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে জানালার যে কাছটিতে তার জায়গা ছিল সেখানে এসে দাঁড়ালো, এখানেই কথা দিয়ে প্রতিদিন সাক্ষাৎ হতো অতসীর সঙ্গে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে টেনে নিয়ে শালগাছের তলা দিয়ে চললো, যেখানে ঘণ্টাতলায় বেদী বাঁধানো। দুটো স্তম্ভের সঙ্গে ঝোলানো একটি ঘণ্টা। ওদিকে শালগাছের সারির মধ্যে হাওয়ায় হাহাকাব উঠছে আর ঝরকে ঝরকে ঝরে পড়ছে শালের ফুল। আর অদূরে আম্রকুঞ্জের ব্যূহের মধ্যে ডাকাডাকি চলছে কোকিলে কোকিলে। সে স্থির করলো—এইখানে আশ্রমের শেষ রজনী যাপন করবে। ভাবলো অতসীরও নিশ্চয় এইভাবে জাগরীর পালা চলছে। এই রকম কত কি ভাবতে ভাবতে ঘণ্টার স্তম্ভটিতে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল ঠিক নেই। হঠাৎ শুনতে পেলো ঘুমের মধ্যে যেন কার করুণ কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে—

"পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কিরে হায়
ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা, সে কি ভোলা যায়।"

প্রজিত সচেতন হয়ে উঠলো, আধো জাগরণে, আধো তন্দ্রায় কানে এসে ঢুকলো—

"আয় আর-একটি বার আয়রে সখা, প্রাণের মাঝে আয়
মোরা সুখের দুখের কথা কব, প্রাণ জুড়াবে তায়।"

অতসীর কণ্ঠ যে সন্দেহ নাই। তার শতবার শোনা। কিন্তু কথা কখনো এমন করুণ-মধুর আগে মনে হয়নি।

সে সন্তর্পণে কান পেতে রইলো, একটি শব্দ, একটি মূর্ছনা যাতে বাদ না পড়ে।

"মোরা ভোরের বেলা ফুল তুলেছি, তুলেছি দোলায়,—
বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি বকুলের তলায়।
মাঝে হ'ল ছাড়াছাড়ি, গেলেম কে কোথায়
আবার দেখা যদি হল, সখা, প্রাণের মাঝে আয়।"

প্রজিত দেখলো তার গাল দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

পরিশিষ্ট

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত

শান্তিনিকেতন

১

শান্তিনিকেতন না যদি দেখিলে
নয়ন তবে কী কারণ ?
দেখিবার যত যা আছে নিখিলে
সবার শির-আভরণ ॥

২

ডাঙ্গার রাজা গো ভুবন-ডাঙ্গা
ধরে যারে শিখরে নিজ ।
ভারত-জননীর চরণে রাঙা
মজিয়া রহে যেথা দ্বিজ ॥

৩

যেথায় বিধু রবি না জানি অস্ত,
জাগি থাকি জাগান লোক
নৃপাল, রাজকাজে সঁপিয়া হস্ত
সব দিকে রাখেন চোখ ॥

৪

একা-নবরতন ক্ষিতিমোহন
ভকতি-রসের রসিক ।
কবীর-কাম-ধেনু করি দোহন
তোষেন তৃষিত পথিক ॥

৫

জগদানন্দ বিলান জ্ঞান
গিলান পুঁথি ঘর-জোড়া ।
কাঁঠালগুলান কিলিয়ে পাকান,
গাধা পিটি করেন ঘোড়া ॥

৬

রবি-রথের কী-যে সারথি, রথী !
যেমন বীর, তেম্নি ধীর।
কোনো কাজেই তাঁর নাহি বিরতি,
ভারতীর কিবা লক্ষ্মীর ॥

৭

দিনু দাদাজীর কী কব কাহিনী
বীণাপাণির সে যে শিষ্য।
উথলি উঠে যবে রাগরাগিণী,
পুথলি বনি যায় বিশ্ব ॥

৮

করয়ে যেমতি দ্বিপযূথপতি
গহনবনে ঘোরাফেরা,
সভায় দ্বিপ নৃপ রাজে তেমনি
বন্ধুবান্ধবে ঘেরা ॥

৯

কোথা গো ডুব মেরে রয়েছ তলে
হরিচরণ, কোন গরতে ?
বুঝেছি, শবদ-অবধি-জলে
মুঠাচ্ছ খুব অরথে ॥

১০

সন্তোষে নেহারিলে জুড়ায় আঁখি
শিশু-সমান নিরদোষ।
কটু-ই বা কী মধুর-ই বা কী
সবতাতেই তাঁর তোষ ॥

১১

কালীমোহনের অশেষ গুণ,
যে তারে জানে, সেই জানে
দীনদুখে হৃদয়ে জ্বলে আগুন !
অবিচার সহে না প্রাণে ॥

১২

সুধাকান্তটি পোকার কীট।
কীটানন্দ গো তিনি।
লোকে বলে আছয়ে বায়ুর ছিট্—
আমি কিন্তু তারে চিনি॥

১৩

মহারাষ্ট্রীয় গুণী যুবক,
'ভীমরাও' ধরেন নাম।
সংগীতের তিনি অধ্যাপক,
সবলমতি শুভকাম॥
বিশাবদ নহেন গানে কেবল—
জ্ঞানেও দ্যান ডুবসাঁতার,
বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জলি
নখদবপণে তাঁহাব॥

১৪

অনিলকে এখনো পাওনি টের—
বাজারে বাজাব না ঢাক।
ডান-হাত বাঁ-হাত দ্বিজরাজের
এই অবধি থাক॥

১৫

প্রমদারঞ্জন থাকেন আড়ালে
ইংরাজিতে সুনিপুণ,
পড়ান ছাত্র সকালে-বিকালে
কারো নহেন তিনি ন্যূন॥

১৬

প্রভাতের মুখ সদা প্রফুল্ল
পুঁথিশালার অধ্যক্ষ।
আগলান নানা পুঁথি অমূল্য—
পোঁতা ধন যেমতি যক্ষ॥

১৭

নগেন্দ্র আইচ্ শান্তশিষ্ট,
শিক্ষাদানে মজবুত।
দেহটার তরে—হায় অদৃষ্ট
মন করে খুঁৎ খুঁৎ॥

১৮

উপেন সঁপেন বিদ্যা অন্ন
কচি ছেলেদের মুখে।
ছাপাখানার হয়ে পতি অনন্য
বিহরেন মনের সুখে॥

১৯

ধী-মু গোরাচাঁদ বয়স কাঁচা,
সুরেন কর তেজেশ,
সবাই একএকেকটি রতন সাঁচা,
বাখানিয়া কে করে শেষ॥

২০

দ্বিজের লেখনী আর তো চলে না
বড্ড সে গো পরাধীনা,
চষিলে শুখা-ভূমি ধান্য ফলে না
দেবতার বরিষণ বিনা॥

———